কলা অনুষদ পত্রিকা

খণ্ড : ১২ ॥ সংখ্যা : ১৭ ॥ জুলাই ২০২১ – জুন ২০২২

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির
ডিন
কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলা অনুষদ পত্রিকা

প্রকাশক
ডিন
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২৩

অক্ষরবিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
বিসিএস প্রিন্টিং
রাফিন প্লাজা (৩য় তলা), নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১০-৮৮০৭২৮
ই-মেইল: bcsprinting123@gmail.com

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য লেখকের নিজস্ব গবেষণার ফল। এর দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের, সম্পাদনা পরিষদ কিংবা প্রকাশকের নয়।

মূল্য
১০০ টাকা
US$ 5.00

ISSN : 1994-8905

কলা অনুষদ পত্রিকা

সম্পাদনা-পরিষদ

[৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত]

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক ড. নেভিন ফরিদা
চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপক জেরিন আলম
চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির
চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান, উর্দু বিভাগ

মিসেস নমিতা মন্ডল
চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ

অধ্যাপক ড. ময়না তালুকদার
চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ

অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ড. নীরু বড়ুয়া
চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ
চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম
চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. মোশাররফ হোসাইন
চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জনাব মো. আশিকুর রহমান (লিয়ন)
চেয়ারম্যান, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ড. দেবপ্রসাদ দাঁ
চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ

অধ্যাপক ড. ফাজরীন হুদা
চেয়ারম্যান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
চেয়ারম্যান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

মিজ মনিরা পারভীন
চেয়ারম্যান, নৃত্যকলা বিভাগ

সূচি

বাংলা ভাষী অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ১
সালমা নাসরীন

মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজ ১৭
সুমন কান্তি বড়ুয়া

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ধারা:
কেস স্টাডি রাজশাহী জেলা ৩১
মো. আবদুর রহিম

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা ৫১
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

পঞ্চসূত্রে *বিদেহ* : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৭৩
আহমেদুল কবির

তারানা গীতিশৈলীর বিবর্তন ৮৭
আকলিমা ইসলাম কুহেলী

আনন্দের ঝরনাধারায়: উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ ৯৫
চন্দনা রাণী বিশ্বাস

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসে লোকজ উপাদানের রূপায়ণ ১০৭
তাশরিক-ই-হাবিব

বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতি ও বিনম্রতা বিশ্লেষণ ১১৯
খন্দকার খায়রুন্নাহার

বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা অর্জনের প্রারম্ভিক পর্বের বাক্য গঠনের রূপ বিশ্লেষণ ১২৯
মিথুন ব্যানার্জী

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা: একটি কালানুক্রমিক পর্যালোচনা ১৪৯
আজিজুর রহমান

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে নিসর্গচিত্রের রূপায়ণ ১৬১
কালিদাস ভক্ত

ফাতেমার সুরতনামা: পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয় ১৭৩
শহিদুল হাসান

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা ১৮৩
প্রমথ মিস্ত্রী

বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর শিক্ষা বিশ্লেষণ ও তার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ ২০১
মুহা: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

হেনরি বার্গসনের হাসির দর্শন: জীবন এবং নাট্যের সংযোগ স্থাপনের অভিব্যক্তি নিরীক্ষণ ২১৫
মো. আশিকুর রহমান লিয়ন

রবীন্দ্রগল্পে বাংলাদেশের চার প্রকৃতিকন্যা : স্বরূপ ও রূপান্তর ২২৭
মো. রাফাত আলম মিশু

বাঙালি দার্শনিক শেখ মুজিবুর রহমান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ২৪১
বেল্লাল আহমেদ ভূঞা

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের অন্যতম সু-শাসন নীতি 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম': একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ২৫৩
শামীমা নাছরিন

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং রাজনৈতিক জনমত গঠনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা ২৬৭
এ. এস. এম. মোহসীন

বাংলা ভাষী অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সালমা নাসরীন*

Abstract : Social reciprocity deficit is a core feature of autism spectrum disorders (ASD). In this study, the nature of social communication competence has been examined in Bangla-speaking children with ASD. The research took a qualitative approach to reach the goal. Study data were collected from two groups – one for children with high functioning (n=8) and the other for low functioning (n=14). A video-recorded social story is shown in front of them on a laptop screen and followed by an open-ended questionnaire consisting of 11 questions. Participants' interviews were recorded and analysed based on their social communication skills. Analysis of the nature of social communication competence showed that both groups of children had deficiencies in social communication competence. The findings thus reiterate the lacking of social communication skills among Bangla-speaking children with ASD.

১. ভূমিকা

অটিস্টিক শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আচরণিক, ভাষিক ও সামাজিক সংজ্ঞাপনসহ বহুমাত্রিক সমস্যা প্রদর্শন করে এবং প্রতিটি শিশুর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ মৃদু থেকে তীব্ররূপে প্রকাশ পায়। সে কারণে অটিজমের মাত্রার মৃদু বা তীব্রতা অনুযায়ী অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD) পবিভাষাটি ব্যবহার করা হয় (DSM-V, 2013)। অটিজম স্পেকট্রাম একটি মাত্র অবস্থা নয়, এটি কতগুলো ভিন্ন অবস্থার সমষ্টি। সে কারণে এই অবস্থাগুলোকে একত্রে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার বলা হয়। 'স্পেকট্রাম' শব্দের অর্থ বর্ণালী বা বর্ণের সমষ্টি। অর্থাৎ অটিজম স্পেকট্রাম বলতে বোঝানো হয়ে থাকে বিভিন্ন বর্ণের বা বিভিন্ন রকমের অটিজম (সুনীতি, ২০১২)। এএসডি শিশুদের মধ্যে নিম্ন-দক্ষ (low functioning) অটিস্টিক শিশুরা ভাষার সব কয়টি স্তরে যথেষ্ট ঘাটতি প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, যারা উচ্চ-দক্ষ (high functioning) অটিস্টিক শিশু, তাদের ভাষাবোধ (linguistic competence) ও তার প্রকাশের রূপটি নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও তা সামাজিক সংজ্ঞাপনের জন্য পরিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ এএসডি শিশুদের প্রকাশিত ভাষিক রূপকে একটি সরল ব্যাকরণিক রূপ বলা যেতে পারে, যে রূপটির সাহায্যে তারা অভিভাবক ও অন্যদের সঙ্গে সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। যদিও এই সরল ব্যাকরণিক রূপটির দ্বারা সফল সামাজিক সংজ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। কেননা সফলভাবে সামাজিক সংজ্ঞাপন করার জন্য যেসব সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, যথা : সামাজিক বাচন (social speech), সামাজিক দক্ষতা (social skill), সামাজিকবোধ (social cognition)

* অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইত্যাদি, সেসব সামর্থ্য অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। অন্যদিকে, নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের উল্লিখিত সামাজিক সামর্থ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ এবং এই সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সামাজিক আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায় (Carter and et al., 2005)। সারা বিশ্বের অটিজম বিশেষজ্ঞদের গবেষণাকর্মে এ রকম চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। লিও কনার (১৯৪৩) থেকে আজ অবধি যাঁরা অটিজম নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন তাঁরা সকলেই অভিন্ন মত প্রকাশ করেন যে, যেসব এএসডি শিশুর অটিজমের মাত্রা মৃদু অর্থাৎ যাদের আচরণিক, ভাষিক ও প্রজ্ঞানমূলক সামর্থ্য ভালো তাদেরও সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার প্রকৃতি যথেষ্ট শক্তিশালী না। এরই আলোকে এই প্রবন্ধে বাংলাভাষী এএসডি শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. অটিজম ও সামাজিক সংজ্ঞাপন

অটিজম স্নায়ুবৈকল্যজনিত একটি জটিল অবস্থার নাম। যেসব শিশু অটিজমে আক্রান্ত তাদের জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরে এই জটিল অবস্থাটি মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর ফলে আচরণিক, ভাষিক এবং সামাজিক সংজ্ঞাপনসহ বহুমাত্রিক সমস্যা তারা প্রদর্শন করে। একজন টিপিক্যাল শিশুর (টিপিক্যাল শিশু বলতে বোঝানো হচ্ছে তাদেরকে যারা জন্মগতভাবে একটি সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে, অটিস্টিক শিশুরা যেহেতু স্নায়ুগত গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে কারণে তাদেরকে অ্যাটিপিক্যাল বলা হচ্ছে, কিন্তু অস্বাভাবিক বোঝানো হচ্ছে না) ভাষা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়টি সূচিত হয় কিছু সংখ্যক অবাচনিক সামাজিক সংকেত (social cues)-এর মাধ্যমে। এক বছর বয়সের পূর্বেই মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য ঐ শিশুটিকে অবাচনিক সামাজিক সংকেতগুলো শিখিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো আত্মীয় বিদায় নেয়ার সময় তাঁরা শিশুটির হাত ধরে বলেন টা-টা, বাই (waving) বলো। অথবা দূরের কিছু জিনিশ দেখানোর জন্য শিশুটির হাতের আঙ্গুল উঁচু (pointing) করে দেখানো হয়। এভাবে হাততালি, সালাম, নমস্কার বা আরো কিছু সামাজিক সংকেত এই ধরনের প্রক্রিয়ায় শেখানো হয়। অর্থাৎ ১২ মাস বা তার পূর্বেই একজন শিশুর ভাষা অর্জনের প্রাথমিক ধাপের কৌশলগুলো সামাজিক সংকেতের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়। একজন টিপিক্যাল শিশু ভাষা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রানুসারে ভাষার ব্যবহারেও দক্ষ হয়ে ওঠে। সামাজিক সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শুধু ভাষা অর্জনের দক্ষতা বা ব্যাকরণিক নিয়মাবলি জানাই যথেষ্ট নয়, তাকে আয়ত্ত করতে হয় সে যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সেই পরিবেশ অনুযায়ী কথা বলার নিয়মের বহুমাত্রা, অর্থাৎ সংজ্ঞাপক দক্ষতা (communicative competence)। উদাহরণস্বরূপ, সম্পর্ক অনুসারে আমরা কারো সঙ্গে কথা বলার সময় বিনীত হই, আবার কারো সঙ্গে অবজ্ঞার ভাব নিয়ে কথা বলি, আবার কারো সঙ্গে আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে কথা বলি। কখনও সরব থাকি, কখনও নীরব থাকি। আসলে এটি নির্ভর করে বক্তাশ্রোতার সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী প্রয়োগের উপর (হুমায়ুন, ১৯৯৯)। অর্থাৎ সমাজ থেকে শিশু শুধু ভাষাই অর্জন করে না, ভাষার যথার্থ ব্যবহারও শেখে। সে শেখে কার সঙ্গে কখন, কোথায়, কীভাবে, কী উদ্দেশে ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এভাবে ভাষা অর্জনের মধ্য দিয়েই শিশুর সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দক্ষতা (sociolinguistic competence) গড়ে ওঠে (মৃণাল, ১৯৯৯)।

৩. তাত্ত্বিক পটভূমি

সারাবিশ্বের অটিজম গবেষকগণ এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ অটিজমের সঙ্গে সামাজিক সংজ্ঞাপনের ঘাটতিকে সম্পর্কিত করেছেন (Ruble, 2001; Waterhouse, 1994; Volkmar & Klin, 1993; Wing & Gould 1979)। একজন শিশু যদি তিন বছরের আগে সামাজিক ভাষা ব্যবহারে সক্ষমতা দেখাতে না পারে, অর্থাৎ যোগাযোগ সঙ্গীর ব্যবহৃত ভাষা অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে অটিজম নির্ণয়ের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে (DSM-IV,1994)। এখানে সামাজিক ভাষা বলতে দৃষ্টি সংযোগ (eye contact), যৌথ মনোযোগ, (joint attention), স্থির দৃষ্টি (Gaze), আবেগ (emotion), মনোগত তত্ত্ব (theory of mind), মৌখিক অভিব্যক্তি (physiognomy), বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, ইঙ্গিত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে (Carter et al., 2005)। টিপিক্যাল শিশুদের ক্ষেত্রে তিন বছরের মধ্যে লক্ষ করা যায়, তাঁদের মা-বাবা তাদেরকে মৌখিক ভাষার মাধ্যমে কোনো কথা না বললেও তাঁদের দৃষ্টি সংযোগ ও মৌখিক অভিব্যক্তি দেখে শিশুরা বুঝতে সক্ষম হয়, মা-বাবা খুশি হয়েছেন নাকি বিরক্ত হয়েছেন (সুনীতি, ২০১২)। তিনটি বিষয়ে এএসডি শিশুদের মারাত্মক ঘাটতি দেখা যায়। যথা : ক. পারস্পরিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Reciprocal social interaction) খ. পারস্পরিক বাচনিক ও অবাচনিক সংজ্ঞাপন (Reciprocal verbal and nonverbal communication) এবং গ. কল্পনা ও ব্যবহার (Imagination and behavior) (Wing, 1981)।

সামাজিক সংজ্ঞাপনের জন্য একজন মানুষকে ভাষার ব্যাকরণিক নিয়মাবলির সঙ্গে সামাজিক দক্ষতাও আয়ত্ত করতে হয়। সামাজিক দক্ষতা বলতে পারস্পরিকতা (reciprocity), সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় উদ্যোগী হওয়া (initiating interactions), দৃষ্টি বিনিময় (eye contact), আনন্দ ভাগাভাগি করা (sharing enjoyment), অন্যের দুঃখে একাত্ম হওয়া (empathy), অন্যের আগ্রহ অনুমান করা (inferring interests) ইত্যাদি বিষয় বোঝানো হয় (Turkington & Anan, 2007)। সামাজিক দক্ষতা সম্পর্কে সি ও তাঁর সহকর্মীরা (Tse and et al. , 2007) বলেন, নির্দিষ্ট প্রতিবেশে নিজের এবং অন্যের উপলব্ধি অনুধাবন করতে পারা। কথা বলার সময় অন্যের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলা এবং তার ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি (gesture), স্থিরভঙ্গি (posture) এবং মৌখিক নানা অভিব্যক্তির অর্থ অনুমান করতে পারা। যখন কেউ জিজ্ঞেস করে কেমন আছো, তখন অত্যন্ত শিষ্টাচারের সাথে তার উত্তর দেয়া। কারো সাথে নতুনভাবে পরিচিত হতে হলে তার নিজের নাম, সংস্কৃতি অনুসারে অভিবাদনের মাধ্যমে তা ঠিকভাবে পালন করা। কথোপকথনের প্রারম্ভে শ্রোতা এবং প্রতিবেশ অনুযায়ী একটি বিষয় ঠিক করে নেয়া এবং কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার সময় শ্রোতা কী বলছে তার উত্তর কী হওয়া প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবে তা তৈরি করে নেয়া। কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে শ্রোতা কী বলছে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং বিদায় গ্রহণের সময় কিছু সামাজিক নিয়ম পালন করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে শারম্যান ও স্টোন (Charman, & Stone, 2006) বলেন, উচ্চ-দক্ষ শিশুরা টিপিক্যাল শিশুর মতো ব্যাকরণিক নিয়মানুযায়ী ভাষা শিখতে পারে, তাদের শব্দভাণ্ডারও ভালো। কিন্তু কথোপকথনের শুরু কীভাবে করতে হয়, কীভাবে কথা ঘুরিয়ে নিতে হয়, কীভাবে বন্ধুদের খেলায় আমন্ত্রণ জানাতে হয় ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ত করতে তারা অপরাগ হয় (Turkington & Anan, 2007)। সামাজিক সংজ্ঞাপনের স্বরূপ বিশ্লেষণে উল্লিখিত ফলকে অনুসিদ্ধান্ত

(hypothesis) হিসাবে বিবেচনা করে তা বাংলাভাষী এএসডি শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এই প্রবন্ধে বাংলাভাষী এএসডি শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার ঘাটতির স্বরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বাংলাভাষী এএসডি শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণাত্মক পদ্ধতি (qualitative method)-এ এককালীন শ্রেণি-প্রতিনিধিত্বমূলক (cross-sectional) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়েছে। যেহেতু এতে বাংলাভাষী এএসডি শিশুদের সামাজিক দক্ষতার স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে, সেহেতু সংখ্যাগত পদ্ধতির (quantitative method) অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল দিয়ে তার মূল্যায়ন করা যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়নি, বরং এখানে সামাজিক সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই গবেষণার ক্ষেত্রে গুণাত্মক পদ্ধতিই অধিকতর যৌক্তিক বলে মনে করা হয়। সাধারণত গুণাত্মক গবেষণা সুনির্দিষ্ট গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে। বর্তমানে গবেষণার জন্যও এরূপ একটি গবেষণা-প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা-প্রশ্নটি নিম্নরূপ :

গবেষণা-প্রশ্ন : বাংলাভাষী এএসডি শিশুর সামাজিক সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া অর্জনের স্বরূপ কীরূপ?

উল্লিখিত গবেষণা-প্রশ্নটি বিবেচনায় রেখে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

৪.১ উদ্দেশ্য : কোনো সামাজিক ঘটনা প্রত্যক্ষণ-পরবর্তী সে ঘটনা আয়ত্তীকরণ ও বর্ণনায় অটিস্টিক শিশুদের ভাষিক ও জ্ঞানগত রূপটি কী তা পরিমাপ করা।

৪.২ অংশগ্রহণকারী

মনোচিকিৎসকদের দ্বারা শনাক্তকৃত মোট ১৪ জন এএসডি শিশুকে এই পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিনিধিত্বশীল এসব শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়, যথা : ১. Inclusion criteria ২. Exclusion criteria। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী শিশুদের সেসব বৈশিষ্ট্যই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত উপাত্ত অন্বেষণ করা এবং ফল বের করা সহজ হয়। অর্থাৎ যারা বাচনিক (verbal) ও অবাচনিক (nonverbal) যোগাযোগে অপেক্ষাকৃত দক্ষ, যাদের বয়স ১৫-১৮, নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষেধনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে — এমন বৈশিষ্ট্যে (inclusion criteria)-র অধিকারী শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেসব বৈশিষ্ট্য বর্জন (exclusion criteria) করা হয়েছে, যথা : যারা বাচনিক (verbal) ও অবাচনিক (nonverbal) যোগাযোগে অদক্ষ, নিয়মিতভাবে স্কুলে আসে না এবং প্রতিষেধনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে নেই এবং যাদের বয়স দশ বছরের কম ইত্যাদি। এদের মধ্যে ৬ জন নিম্ন-দক্ষ (low functioning) শিশু এবং ৮ জন উচ্চ-দক্ষ (high functioning) শিশু। উচ্চ-দক্ষ এএসডি শিশু তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা ভাষিক যোগাযোগসহ সামাজিক যোগাযোগ করতে সক্ষম। উচ্চ-দক্ষ এএসডি শিশুদের বুদ্ধাঙ্কের পরিমাণ প্রায় স্বাভাবিক, স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি থাকে। অন্যদিকে, যারা বিভিন্ন জ্ঞানমূলক কর্মকাণ্ড, সামাজিক যোগাযোগ, ভাষিক দক্ষতায় উচ্চ-দক্ষদের তুলনায় অধিকতর কম দক্ষতা

প্রদর্শন করে তাদেরকে নিম্ন-দক্ষ বলা হয় (Turkington & Anan, 2007)। এই দুই বর্গেই যেহেতু অটিজম আক্রান্ত মেয়ের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় কম অর্থাৎ ১ : ৪, সে কারণে এই পরীক্ষণে মোট ১৪ জন অংশগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা ৪ জন। ঢাকায় অবস্থিত অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামক স্কুলটিকে স্থান (site) হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণার ফল বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিকভাবে শিশুদের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার অংশ হিসেবে তাদের প্রকৃত নামের প্রথম বর্ণ দিয়ে তৈরি ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.৩ গবেষণা নমুনায়ন

এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) ও কোটা নমুনায়ন (quota sampling) কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে সময় এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কোটা নমুনায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন— অটিজমের মাত্রা, বয়স, জ্ঞানমূলক সামর্থ্য, ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এই গবেষণাকর্মে উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর অভিভাবক ও স্কুল প্রধানের কাছে গবেষকের স্বাক্ষরসহ সম্মতিপত্র (consent letter) প্রদান করা হয়। এতে গবেষকের নৈতিক অবস্থান, গোপনীয়তার প্রক্রিয়া এবং গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে দিক নির্দেশনা ছিল, তা তাদেরকে অবহিত করা হয়। অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিশ্চিত করা হয় যে, এসব শিশুর কাছ থেকে যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে তা কেবল গবেষক তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন, অন্য কোথাও ব্যবহার করবেন না। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত উপাত্ত ও নাম গোপন রাখার বিষয়টি অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজটি অধিকতর সহজ হয়।

৪.৪ সাক্ষাৎকার

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রতিটি শিশুর আলাদা সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। একসঙ্গে দুইজন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে বাছাই করা হয়নি। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর কাছে প্রশ্ন করার প্রক্রিয়াটি একই রকম রাখা হয় এবং উত্তরগুলো যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ ও ভিডিও করা হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎকার গ্রহণে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার জন্য একটা অভিন্ন নিয়ম মেনে চলা হয়।

বর্তমান গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণকারীরা সবাই যেহেতু এএসডি শিশু, তাই তাদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। প্রাপ্ত উপাত্ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তখন তাদের কাছ থেকে অনেক সময়ই পরিপূর্ণ উত্তর পাওয়া যায়নি। আবার কোনো বিষয় সম্পর্কে তারা নিজস্ব মতামত দিতে পারে কিনা সেটিও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও তারা তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রশ্নকর্তা ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে যেন একটি দ্বিপাক্ষিক আন্তরিক সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্য তৈরি হয়, সেটির প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, যারা নিম্ন-দক্ষ শিশু তাদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করার পর শুধু প্রত্যাশিত উত্তর প্রাপ্তির জন্য যা করা প্রয়োজন তা-ই

করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকক্ষেত্রেই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু সহায়ক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে উত্তর পেতে হয়েছে।

একটি পরিচিত নীরব কক্ষে বিপরীতপাশে বসে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান শনাক্তকরণ পরীক্ষার পূর্বে অনুশীলন পরীক্ষা করা হয়। দুটি পর্বের মধ্যে ১মটি অনুশীলনমূলক পরীক্ষা ছিল এবং পরেরটি প্রধান পরীক্ষা ছিল। অনুশীলন পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছিল তাদেরকে নির্বাচন করা হয়নি। নির্বাচিত শিশুদের প্রত্যেককে এই পরীক্ষণটি করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেয়া হয়।

৪.৫ উদ্দীপক

পরীক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণ এই পরীক্ষণে একটি ভিডিও চিত্র শিশুদের সামনে প্রদর্শন করা হয়। ভিডিও চিত্রে একটি সামাজিক ঘটনা প্রদর্শন করা হয়। ঘটনাটি এমন করে সাজানো হয়েছে, যা এসব শিশু প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকে। অন্যদিকে, ঘটনার মধ্যে এমন বিষয় যুক্ত করা হয়নি, যার সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। অংশগ্রহণকারীদের অটিজমের মাত্রা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানমূলক সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণপূর্বক সামাজিক এই ঘটনাটি সাজানো হয়েছে। ভিডিওচিত্রে ধারণকৃত ঘটনাটির বর্ণনা নিম্নরূপ :

ভিডিওচিত্রে প্রদর্শনকৃত দুটি ছেলের একটি ছেলে বড়, অন্য ছেলেটি ছোট। সম্পর্কে তারা খালাতো ভাই হয়। একদিন বড় ভাইয়ের বাসায় ছোট ভাই বেড়াতে আসে। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে এসে প্রথমে কলিং বেল চাপ দেয়। তখন বড় ভাই দরজা খুলে দেয়। দরজা খোলার পর ছোট ভাই বড় ভাইকে 'সালাম দেয়', 'কোলাকুলি করে', 'হাত মেলায়' ও 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করে। তারপর বড় ভাই ছোট ভাইকে বসার ঘরে বসতে বলে। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে জানতে চায়, আজ তার স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হয়েছিল কিনা। ছোট ভাই জবাব দেয় 'হ্যাঁ', আজ তার স্কুলে ক্লাসপার্টি ছিল। সেখানে অনেক মজা হয়েছে। এমন সময় বড় ভাইয়ের কাছে একটি ফোন আসে। বড় ভাইকে যে ফোন করেছিল সে পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছিল এবং সেটি বড় ছেলেকে ফোনে জানায়। বড় ছেলে এর উত্তরে বলে 'তুমি ফার্স্ট হয়েছ। কনগ্রেচোলেশন্স। আমি খুব খুশি হয়েছি'। কথা বলার ঠিক ওই মুহূর্তে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কাছে কিছু জানতে চাইলে তখন বড় ভাই ছোট ভাইকে মুখে আঙুল দিয়ে 'চুপ' থাকতে বলে। ফোনে কথা শেষ হলে বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে 'আম্মু তোমার জন্য একটি গিফট রেখেছে। তুমি বস, আমি নিয়ে আসছি'। এই বলে সে গিফটি আনতে যায়। বড় ভাই এসে ছোট ভাইয়ের হাতে গিফটি তুলে দেয়। গিফটি পেয়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে যে, সে অনেক খুশি হয়েছে। তখন বড় ভাই ছোট ভাইকে রাতে খাওয়ার কথা বললে ছোট ভাই বলে আজ তার হোম ওয়ার্ক আছে। এছাড়া বাসায় না গেলে মা তাকে বকবে। তখন সে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। বিদায়ের সময় বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে 'আবার এসো', 'দেখা হবে', 'আল্লাহ হাফেজ' 'বাই বাই' ইত্যাদি।

গবেষক কর্তৃক চিত্রায়িত ভিডিওতে উল্লিখিত গল্পটি একটি সামাজিক ঘটনা যা বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪.৬ উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

ঘটনাবহুল ভিডিওচিত্রটি অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশুকে আলাদা আলাদা করে দেখানো হয় এবং চিত্রটি দেখার পর তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. দুজন ছেলে মধ্যে সম্পর্ক কী?
খ. ছোট ছেলে এসে প্রথম কী বললো?
গ. ফোনে বড় ছেলে কী বললো?
ঘ. ফোন করার সময় ছোট ছেলেটি কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলে বড় ছেলেটি কী চিহ্ন দেখালো?
ঙ. ছোট ছেলের ক্লাসে কী হয়েছিল?
চ. বড় ছেলেটি ছোট ছেলেটির জন্য কী নিয়ে আসলো?
ছ. ছোট ছেলেটি কী কারণে খুশি হলো?
জ. রাতে খাওয়ার কথা বললে ছোট ছেলেটি কী বলেছিল?
ঝ. ছোট ছেলেটি কি রাতে বড় ছেলের বাসায় থেকে গিয়েছিল?
ঞ. বিদায়ের সময় তারা কী বললো?
ট. এই ভিডিওটির বিষয়বস্তু কী?

৫. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর প্রাপ্ত বিভিন্ন উত্তর পরিশিষ্টে সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একজন টিপিক্যাল শিশুর ভাষা অর্জন ও সামাজিক ভাষা অর্জনের জন্য যেসব সামর্থ্য প্রয়োজন, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা সমানভাবে বিকশিত হতে থাকে। সে কারণেই সে ভাষা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক সংজ্ঞাপনে দক্ষ হয়ে ওঠে। এছাড়া একজন টিপিক্যাল শিশু তার চারপাশের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং ঘটনা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা পরবর্তীকালে তাকে যে কোনো নতুন পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে। এএসডি শিশুরাও টিপিক্যাল শিশুর মতো বিভিন্ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিশুরা তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে অনুধাবন করতে পারে কিনা সেটি এই পরীক্ষণে জানতে চাওয়া হয়। বাঙালি সমাজে যেসব অবাচনিক চিহ্ন বিভিন্ন যোগাযোগ প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়, সেই ধরনের একটি যোগাযোগ প্রতিবেশ সৃষ্টি করে তা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের সামনে প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শিত ঘটনাটির বিষয়বস্তু, সামাজিক সংজ্ঞাপনের আখ্যানমূলক বর্ণনা, আবাচনিক চিহ্ন এবং ঘটনার যে পারম্পর্য সেটি তারা বলতে পারে কিনা তা যাচাই করা হয়। তবে গল্পে ব্যবহৃত অবাচনিক চিহ্নগুলো তারা বলতে পারে কিনা সেগুলো যাচাই করা ছিল এই পরীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

পরিশিষ্টে প্রযুক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, উক্ত পরীক্ষণে ভিডিওটি দেখানোর পর ১৪ জন অংশগ্রহণকারী শিশুদের উক্ত ভিডিও থেকে ১১ টি প্রশ্নের মাধ্যমে মোট ১৫৪টি সামাজিক ঘটনা নির্দেশক বিষয়াবলি জানতে চাওয়া হয়। এই ১৫৪টি প্রশ্নের মধ্যে তারা ৪৭টির ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে, শতকরা হিসেবে যা দাঁড়ায় প্রায় ৩১%। আর ৫৩টির ঠিক উত্তর দিতে পারেনি, শতকরা হিসাবে যা দাঁড়ায় প্রায় ৩৫%। নিচের ১ নং চিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো :

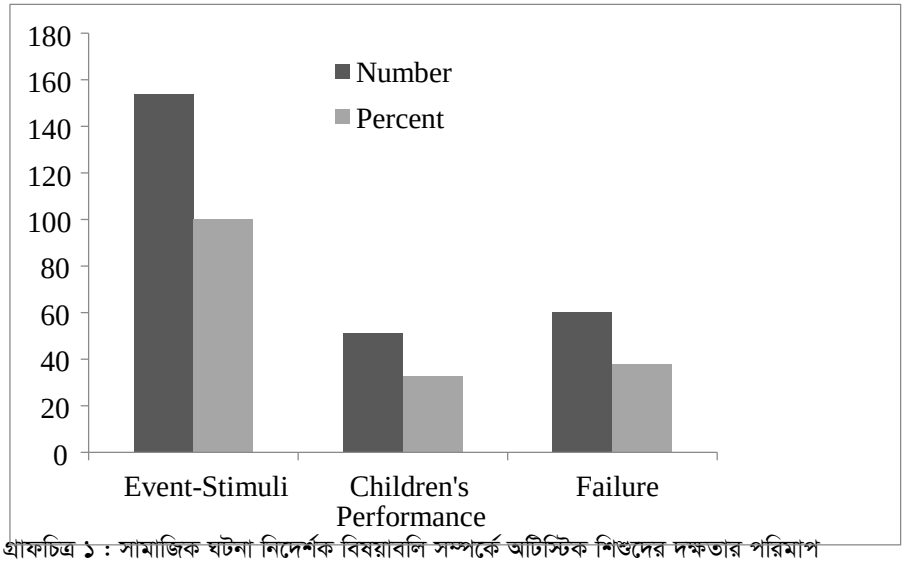

গ্রাফচিত্র ১ : সামাজিক ঘটনা নির্দেশক বিষয়াবলি সম্পর্কে অটিস্টিক শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

উল্লেখ্য, এই পরীক্ষণে উচ্চ-দক্ষ শিশুদের তুলনায় নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি দেখিয়েছে, যা নিচের ২ নং চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

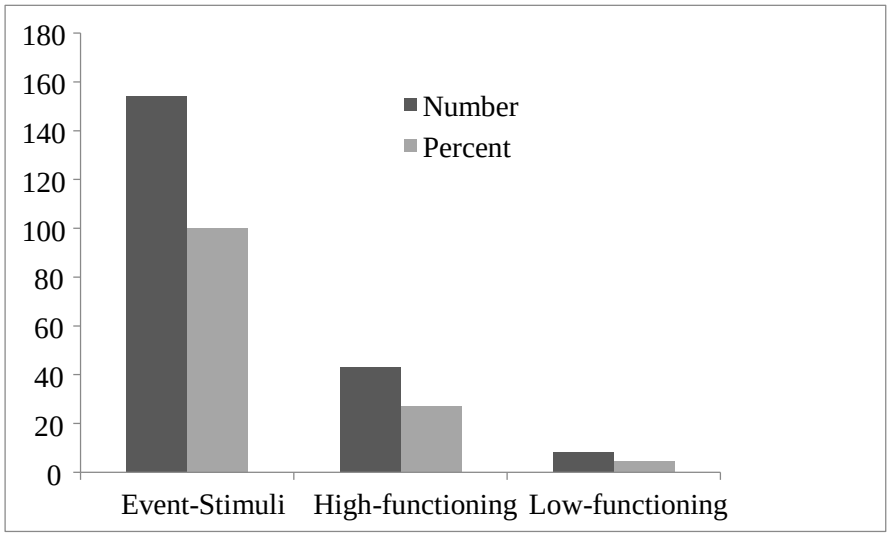

গ্রাফচিত্র ২ : সামাজিক ঘটনা নির্দেশক বিষয়াবলি সম্পর্কে উচ্চ-দক্ষ ও নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

উল্লিখিত সারণিততে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ-দক্ষ শিশুরা ১৫৪টি প্রশ্নের মধ্য থেকে ৪০টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছে শতকরা হিসেবে যা দাঁড়ায় প্রায় ২৬%। অন্যদিকে, নিম্ন-দক্ষ শিশুরা ১৫৪ টি প্রশ্নের মধ্য থেকে ৭টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছে শতকরা হিসেবে যা দাঁড়ায় মাত্র ৫% এর কাছাকাছি। অংশগ্রহণকারী শিশুরা এই পরীক্ষণে যে দক্ষতা দেখিয়েছে এবং তাদের প্রদর্শিত দক্ষতার যে প্রকৃতি সেটি বিচার করে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। যে

ভিডিওচিত্রটি তাদের সামনে প্রদর্শন করা হয়, সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। দুটি ছেলের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্কের বিষয় ছিল। সম্পর্কটি অনেকটা পারিবারিক ছিল। তাই বলা যায়, যদিও তারা একই পরিবারে বাস করছে না, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে। দুটি ছেলের সম্পর্ক কী ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ২ জন শিশু ব্যতীত অংশগ্রহণকারী সবাই বলেছে 'ভাই'। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে ৭ জন অংশগ্রহণকারী অপারগ হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জনই নিম্ন-দক্ষ শিশু। একজন বলেছে জড়িয়ে ধরেছে। সালাম দেয়ার পর বড় ছেলে ছোট ছেলের সঙ্গে কোলাকুলি করে। সাক্ষাতের প্রারম্ভে তিনটি বিষয় ছিল, যথা : 'সালাম দেয়া', 'কোলাকুলি করা', 'কেমন আছো'? জিজ্ঞেস করা। এ তিনটি প্রশ্নের মধ্যে 'সালাম দেয়ার' প্রসঙ্গটি মুখ্য ছিল। তাই তাদের কাছ থেকে এ প্রশ্নটি জানতে চাওয়া হয়। জড়িয়ে ধরার বিষয়টি অর্থাৎ কোলাকুলি শব্দটি হয়তো ঐ মুহূর্তে তার মনে ছিল না। তাই একজন আইকনিক সাইন হিসাবে তা প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দুইজন উচ্চ-দক্ষ অংশগ্রহণকারী ঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। বড় ছেলে ফোনে যার সাথে কথা বলেছে সেখানে কয়েকটি সংলাপ ছিল। কয়েকটি সংলাপের মধ্যে একটি শব্দ (কনগ্রেচুলেশনস)-কে প্রধান হিসাবে তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় এবং সেটিই দুইজন ঠিকভাবে বলতে সক্ষম হয়েছে। বাকি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি।

এই পরীক্ষণে দুটি চিহ্নের ব্যবহার ছিল। অর্থাৎ এই ভিডিওচিত্রে একটি চরিত্র (বড় ভাই) ছোট ভাইকে কথা বলার সময় মুখে আঙ্গুল দিয়ে ('চুপ করো') দেখিয়েছে এবং বিদায়ের সময় 'বাই' চিহ্ন দেখানো হয়েছে। চিহ্ন দুটি কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তারপর যখন অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, এখানে কী কী চিহ্ন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ শিশু তা বলতে অপারগ হয়েছে। তবে চিহ্নের কথা বলতে না পারলেও প্রসঙ্গের কারণে চিহ্ন দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা তারা বলতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিশু একটি চিহ্ন বলতে পেরেছে। অর্থাৎ মোবাইল ফোনে বড় ছেলে কথা বলার সময় ছোট ছেলেকে মুখে আঙুল দিয়ে 'চুপ' থাকার কথা বলেছিল। সেটি উচ্চ- দক্ষ শিশু 'মহ' বলতে সক্ষম হয়েছে। অন্য অংশগ্রহণকারীরা তা বলতে পারেনি।

এছাড়া ভিডিওচিত্রটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, বড় ছেলেটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ক্লাসে আজ কী হয়েছিল?'। ছোট ছেলেটি জানিয়েছে, স্কুলে 'ক্লাস পার্টি' হয়েছিল। ক্লাসপার্টির বিষয়টি ৫ জন উচ্চ-দক্ষ অংশগ্রহণকারী বলতে পেরেছে। নিম্ন-দক্ষদের মধ্যে কেউই তা বলতে পারেনি। অংশগ্রহণকারীদের ক্লাসপার্টির বিষয়টি বলতে পারার কারণ হলো, তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। এই পরীক্ষণে সেসব অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করা হয়েছে, যারা পারিবারিক পরিবেশের বাইরে স্কুলে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। অংশগ্রহণকারী শিশুরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে সেখানে ক্লাসপার্টিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। যেহেতু তারা ক্লাসপার্টিতে অংশগ্রহণ করে, সে কারণে ৫ জন শিশু ক্লাসপার্টির বিষয়টি বলতে সক্ষম হয়েছে। ভিডিও চিত্রে একটি উপহারের প্রসঙ্গ ছিল। অর্থাৎ ছোট ছেলের জন্য বড় ছেলের মা একটি উপহার রেখেছিল। সেটি বড় ছেলে ছোট ছেলেকে দিল। এই উপহারের বিষয়টি ৭ জন শিশু বলতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন এটিকে উপহারের পরিবর্তে 'গিফট্' বলেছে। অন্য ২ জন সরাসরি প্রদত্ত উপহারটির নাম অর্থাৎ 'বই' বলেছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, উপহার বিষয়টি বলতে গিয়ে বড় ছেলেটি বাংলা শব্দ 'উপহার' এর পরিবর্তে ইংরেজি 'গিফট্' শব্দটি ব্যবহার করেছে। কারণ 'উপহার' শব্দটি বললে এসব শিশু হয়তো বুঝতে

পারত না, যা তাদের উত্তর থেকে জানা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু অংগ্রহণকারীরা আর্থসামাজিক মর্যাদার দিক থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, সে কারণে তারা বাংলা শব্দের পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছে, তারই প্রতিফলন এই পরীক্ষার ফলাফলে লক্ষ করা গেছে। মূলত পারিবারিকভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলে তারা উপহারের প্রসঙ্গটি বলতে পেরেছে। 'কী কারণে ছোট ছেলেটি খুশি হলো?' এই প্রশ্নের উত্তর ১ জন নিম্ন-দক্ষ অংশগ্রহণকারীসহ ৫ জন বলতে পেরেছে। তারা বলেছে, উপহার পাওয়ার পর খুশি হয়। অন্য অংশগ্রহণকারীরা তা বলতে পারেনি। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে রাতে খাওয়ার কথা বললে ছোট ছেলেটির কয়েকটি বাক্য অর্থাৎ রাত হয়ে গিয়েছে, দেরি হলে মা বকা দেবে, আমার হোম ওয়ার্ক আছে। এই সবকটি বাক্য অংশগ্রহণকারীদের কেউই বলতে পারেনি। কেউ বলেছে 'থ্যাংক ইউ', কেউ বলেছে 'রাত হয়ে গেছে', কেউ বলেছে 'মা বকা দিবে' ইত্যাদি। যদিও থ্যাংক ইউ-র বিষয়টি ছিল না। এক্ষেত্রে সাধারণত কেউ যখন খাবারের আমন্ত্রণ জানায় তখন আমরা থ্যাংক ইউ বলে উপেক্ষা করে থাকি। এটি তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছে। বড় ছেলের বাসায় ছোট ছেলেটি থেকে গিয়েছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দুইজন দিতে পেরেছে। এই ঘটনার বিষয়বস্তু কী এই প্রশ্নের উত্তর কোনো অংশগ্রহণকারী দিতে পারেনি। ১ জন উচ্চ-দক্ষ অংশগ্রহণকারী বলেছে অনেক মজা হয়েছে।

এছাড়া ভিডিওচিত্রে দুটি চরিত্রের মধ্যে সৌজন্য-প্রকাশক কয়েকটি শব্দ ও অবাচনিক চিহ্নের ব্যবহার ছিল, যেমন: 'কোলাকুলি করা', 'কনগ্রেচুলেশনস' 'হেন্ডশেক করা', 'সালাম দেয়া', 'ধন্যবাদ দেয়া', 'আবার এসো', 'আল্লাহ হাফেজ' 'দেখা হবে', 'বাই বাই' ইত্যাদি। এ বিষয়ে উচ্চ-দক্ষ ৮ জন অংশগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে ৬ জনই তা বলতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, নিম্ন-দক্ষ অংশগ্রহণকারী শিশুদের ১ জন সালাম দেয়ার কথা বলেছে। কারো সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর যে সম্ভাষণ রীতি সেটি উচ্চ-দক্ষ শিশুরা বলতে পারার কারণটি হচ্ছে, যেহেতু বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবেশে এই বিষয়টি তারা তাদের বাবা-মা,ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে করতে দেখেছে এবং তারা নিজেরাও সেটি করে থাকে। ভিডিওচিত্রে বিদায় নেয়ার বেলায়,'বাই বাই' বলার সময় হাত দিয়ে একটি চিহ্ন দেখানো হয়েছিল। 'পশ' এটিকে ঠিকভাবে নির্দেশ করতে পেরেছে। এছাড়া বলা হয়েছিল 'আবার এসো', 'দেখা হবে', 'আল্লাহ হাফেজ' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী 'আর' বিদায় নেয়ার সময় উল্লিখিত ৪টি বিষয়ের একটিও না বলে সে বলেছে– 'চলে যেতে বলেছে'। 'আবার এসো' 'আল্লাহ হাফেজ', 'দেখা হবে' ২ জন বলতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু বাকিরা পারেনি। ১ জন 'বাই' বলতে পেরেছে। ১ জন নিম্ন-দক্ষ শিশু টা-টা বলেছে। যদিও বিদায়ের সময় এই শব্দটি বলা হয়নি। তারা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে, বিদায়ের সময় সাধারণত 'খোদা হাফেজ বা 'আল্লাহ হাফেজ' বলা হয়। একজন শিশু বলেছে 'আসি'। কিন্তু ভিডিওচিত্রে বিদায়ের সময় 'আসি' কথাটি বলা হয়নি। যেহেতু বাঙালি সামাজিক সংজ্ঞাপনে বিদায় গ্রহণ (leave taking)-এর সময় 'আসি' শব্দটি বলে থাকে। সে কারণে তারা 'বিদায়' প্রসঙ্গের ওপর নির্ভর করে তা বলেছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী শিশুরা সামাজিক সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুসারে ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ঘটনার প্রারম্ভ, প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গের পারম্পর্য, বাস্তবতা, অতিবাস্তবতা, প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত, সমাপ্তি ইত্যাদি বিষয় থাকে। এই বিষয়গুলো অনুধাবনের জন্য উন্নত মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। যদিও উল্লেখিত ভিডিওচিত্রে প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত, অতিবাস্তবতা ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শন করা

হয়নি। কিন্তু এখানে আলাপের শুরু, প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গের পারম্পর্য, বাস্তবতা এবং সমাপ্তি বা বিদায় গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় ছিল। অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে কয়েকজন পূর্বের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা অনুধাবনে সমর্থ হয়েছে এবং এটি তারা প্রয়োগ করতে পেরেছে। ভিডিওচিত্রের ঘটনা বিশ্লেষণে যেসব ঘটনা তাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সাথে মিলে গিয়েছে, সেগুলোর বর্ণনায় তারা অধিকতর সফল হয়েছে। এই বিষয়টি অভিজ্ঞতার প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। সবমিলিয়ে বলা যায়, এ পরীক্ষণেও উচ্চ-দক্ষ ও নিম্ন-দক্ষ সব অংশগ্রহণকারী শিশুরই সামাজিক সংজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ সফল না।

৬. ফল পর্যালোচনা

অটিস্টিক শিশুরা সামাজিক সংজ্ঞাপনে কেন দক্ষতা প্রদর্শন করতে অপারগ হয়, উক্ত পরীক্ষণ থেকে তার যে সাধারণ পাওয়া গেছে সেগুলো নিম্নরূপ :

এই পরীক্ষণে পারিবারিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্ন অংশগ্রহণকারী শিশুদের করা হয়, সেগুলোর অধিকাংশ তারা বলতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, এসব শিশুর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু বিষয়, যা তারা প্রতিনিয়ত দেখে এবং শুনে। কিন্তু তা থেকে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। এই ধরনের প্রশ্ন তারা বলতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, ভিডিওচিত্রিত গল্পে বড় ছেলের বাসায় ছোট ছেলেটির রাতে থাকার বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না, অর্থাৎ সরাসরি রাতে অবস্থান করার বিষয়টি এখানে অনুপস্থিত ছিল। এটি উপলব্ধি করার বিষয় ছিল। অব্যবহিত ঘটনার পর আমরা অনুমান করতে পারি যে, যেহেতু ছোট ছেলেটি বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'চলে গেছে'– অর্থাৎ ছোট ছেলেটি বাসায় রাতে অবস্থান করেনি। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিশুদের সমবয়সী বা তার চাইতে আরো কম বয়সী টিপিক্যাল শিশুরা বলতে সক্ষম হবে যে, ছোট ছেলেটি বড় ছেলের বাসায় রাতে অবস্থান করেনি। এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, অব্যবহিত ঘটনাগুলো টিপিক্যাল শিশুরা অভিজ্ঞতা থেকে যেভাবে ধারণা লাভ করে, অটিস্টিক শিশুরা সেভাবে তা করতে অপারগ হয়। অর্থাৎ একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি ঘটনা যৌক্তিকভাবে বিচার করার বিষয়টি টিপিক্যাল শিশুরা তাদের চারপাশের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে, কিন্তু অটিস্টিক শিশুরা নিজেদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না বলে দুজন বাদে অন্য অংশগ্রহণকারী শিশুরা রাতে থাকার বিষয়টি বলতে অপারগ হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী শিশু একটি যৌক্তিক ঘটনার পরিণতি হিসেবে পরবর্তী কী ধরনের বিষয় ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে, সেটি তারা বুঝতে অসমর্থ হয়। তাই ছোট ছেলেটির রাতে থাকার বিষয়টি তারা বলতে পারেনি। লাভের ক্ষেত্রে এটিকে বড় ধরনের প্রাপ্তি বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে কয়েকজন সামাজিক সংজ্ঞাপন বিষয়ক যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে, সেখান থেকে তাদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অংশগ্রহণকারী 'মহ', 'নস', 'হন' উচ্চ-দক্ষ শিশু এবং তাদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা যথেষ্ট ভালো। ফলে তারা অধিকাংশ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছে। কারণ তাদের বর্ণনামূলক সামর্থ্য (narrative ability) বেশ ভালো। অর্থাৎ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার পর তারা সেই ঘটনাটি বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছে। যখন বলা হয়, 'এই অটিস্টিক শিশুটির আখ্যানমূলক সামর্থ্য ভালো'—এর অর্থ হলো তারা ঘটনাটি দেখার পর তা মনে রাখতে পেরেছে, তাদের

ক্রিয়াশীল স্মৃতিকোষ (working memory)-এ তা জমা ছিল। এক্ষেত্রে নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুরা কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে অপারগ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, কোনো ঘটনা তাদের স্মৃতিকোষে বেশিক্ষণ জমা থাকে না। অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াশীল স্মৃতিকোষ দুর্বল। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, পরিবার বা সমাজ থেকে উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারা পরবর্তীকালে কোনো ঘটনার সাথে সেই অভিজ্ঞতাকে মিলাতে পেরেছে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, যৌক্তিকভাবে একটি ঘটনার পর যখন আরেকটি ঘটনা ঘটে, সেটি অনুধাবন করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। সে কারণে তারা অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ করা যায় যে, উচ্চ-দক্ষ শিশুদের বর্ণনামূলক সামর্থ্য ভালো থাকা সত্ত্বেও যখন গবেষক তাদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব তথ্য দিতে সমর্থ হয়নি। যখন তারা কোনো তথ্য দিতে অসমর্থ হচ্ছিল তখন তাদেরকে কিছুটা সহযোগিতা করে তা আদায় করে নিতে হয়েছে। যারা নিম্ন-দক্ষ শিশু তাদের বর্ণনামূলক সামর্থ্য একেবারেই ভালো নয়। এই গবেষণাকর্মে সেসব নিম্ন-দক্ষ শিশুকে নির্বাচন করা হয়েছে যারা বাচনিক, নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় এবং নানা সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে। যেহেতু তারা স্কুলে যায়, সেহেতু বিভিন্ন ঘটনাসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তারা অভিজ্ঞতা লাভ করতে অপারগ হয়। সে কারণে অংশগ্রহণকারী নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুরা এই পরীক্ষণে প্রদর্শিত ঘটনার বর্ণনা করতে অপারগ হয়েছে।

তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ভিডিওচিত্রের আখ্যানধর্মিতা বিশ্লেষণে উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু নিম্ন-দক্ষদের তুলনায় অধিক সফল। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী 'মহ' সবচেয়ে বেশি সফল। সে ১১টি প্রশ্নের মধ্যে ৯টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া 'পশ' ৮টি, 'মহ' ও 'নস' ৫টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। কারণ কোনো ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যার জন্য যে যৌক্তিক শৃঙ্খলা, পারম্পর্য ও ভাষিক যোগ্যতা এবং আখ্যান-সামর্থ্য (narrative-ability) প্রয়োজন তা উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের তুলানমূলকভাবে বেশি লক্ষ করা গেছে। এই পরীক্ষণে দেখা গেছে যে, ৬ জন নিম্ন-দক্ষ শিশুর মধ্যে ৪ জন একটি প্রশ্নের উত্তর এবং ১ জন ৩টি প্রশ্নের উত্তর ব্যতীত অন্য কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনি। 'সন' এই পরীক্ষণের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। নিম্ন-দক্ষ অংশগ্রহণকারী শিশুদের সবাই ঘটনার বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণভাবে অপারগ হয়েছে। পাশাপাশি, নিম্ন-দক্ষ 'আল'-এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, সে ইংরেজিতে যত দক্ষ, বাংলায় তত দক্ষ নয়। একই সঙ্গে 'আল' অটিস্টিক স্যাভান্ট (autistic savant) হওয়া সত্ত্বেও তার বর্ণনামূলক সামর্থ্যের চূড়ান্ত ঘাটতি রয়েছে । কারণ সে নিম্ন-দক্ষ শিশু। অংশগ্রহণকারী 'ধর' উচ্চ-দক্ষ শিশু হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনায় ব্যর্থ হয়েছে। তার এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বল যেতে পারে যখন তাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ডাকা হয়, তখন স্কুল শিক্ষক জানায় সে স্কুলের সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেহেতু সে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত ছিল, সে কারণে সে এই পরীক্ষণে মনোনিবেশ করতে পারেনি। ফলে টিপিক্যাল শিশুরা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে মিলিয়ে যতটা প্রকাশ করতে পারে এবং স্মৃতিকোষকে যতটা ব্যবহার করতে পারে, অটিস্টিক শিশুরা তা পারে না। অর্থাৎ অটিস্টিক শিশু টিপিক্যাল শিশুর মতো তাদের স্মৃতিকোষকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে দুটি বা তার অধিক কাজ একসঙ্গে করতে অপারগ হয়, যা 'ধর'-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। তবে এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের এই আপাত সফলতা টিপিক্যাল শিশুদের সমপর্যায়ের নয় বলে অনুমান করা যায়। যদিও এই গবেষণাকর্মে টিপিক্যাল শিশুদের কাছ থেকে উল্লিখিত সামাজিক ঘটনা সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত নেয়া হয়নি, তবুও অনুমান করে বলা যায়,

টিপিক্যাল শিশুরা এই পরীক্ষণের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হতো। কারণ টিপিক্যাল শিশুরা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন সামজিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়, অ্যাটিপিক্যাল বা অটিস্টিক শিশুদের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে না। তাই বলা যায়, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের ভাষিক সামর্থ্য নিম্ন-দক্ষদের তুলনায় বেশি হলেও তা টিপিক্যাল শিশুদের মতো নয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি কারণ বর্তমান, যথা : **১.** মস্তিষ্কের লিম্বিক প্রক্রিয়া (limbic system)-র অভ্যন্তরে অ্যামিগডালা নামক অঞ্চলটি সামাজিক ও আবেগীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অটিস্টিক শিশুদের অ্যামিগডালার ত্রুটির কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক ও আবেগীয় আচরণের যথাযথ বিকাশ ঘটে না ((Turkington & Anan, 2007)। **২.** অটিস্টিক শিশু নিজেরাই নিজেদের কল্পিত জগতে বসবাস করে বলে ঘরের বাইরে যেতে চায় না। **৩.** সামাজিক নেতিবাচকতা – অর্থাৎ এসব শিশু বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অপারগ হওয়ার কারণে অনেক মা-বাবা তাদের অটিস্টিক সন্তানকে ঘরের বাইরে পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা এবং অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত সামাজিক ঘটনা বর্ণনা বিষয়ক আখ্যান-সামর্থ্য (narrative ability) পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় না।

সামাজিক সংজ্ঞাপনের জন্য প্রসঙ্গ খবুই গুরুত্বপূর্ণ। এএসডি শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ করে থাকে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তারা ঐ প্রসঙ্গের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে সমাজের এক একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করতে অসমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, টিপিক্যাল শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে সব জায়গায় সামাজিক সংজ্ঞাপনের একটি অংশ হয়ে ওঠে। ফলে যে কোনো সামাজিক সংজ্ঞাপনে তারা এক একটি চরিত্র হিসাবে অংশ নেয় এবং এই বিষয়গুলোতে দক্ষতা লাভ করে। অন্যদিকে, অটিস্টিক শিশুদের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। তারা মনে করেন, যেহেতু পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ করতে তাদের সন্তান ঠিকভাবে সক্ষম নয়, সে কারণে এসব শিশুকে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা হয়। সামাজিক বিধিনিষেধ (social taboo)-এর কারণে অনেক মা-বাবা মনে করেন,'তাদের সন্তান অটিস্টিক'– এ কথা সমাজে জানাজানি হলে তারা অসম্মানিত হবেন। যদিও বর্তমানে সামাজিক সচেতনতার কারণে সামাজিক বিধিনিষেধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তারপরেও কোনো কোনো মা-বাবা বা অভিভাবক তাঁদের সন্তানকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতে আগ্রহবোধ করেন না। পাশাপাশি, একজন অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে তার আপন জগতে বন্দি রাখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, সে কারণে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক যোগাযোগ করার দক্ষতা অর্জন করতে অপারগ হয়।

তাই সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে, এই ভিডিওচিত্রের মধ্যে যে সামাজিক সংজ্ঞাপনের বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে, সেটির বর্ণনার ক্ষেত্রে এএসডি শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি দেখিয়েছে। সার্বিকভাবে প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণকারী বাংলাভাষী এএসডি শিশুদের মূল্যায়ন করে জানা গেল, পারিবারিক বা সামাজিক ঘটনা বলার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ভালো না। এমনকি যারা উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু তাদের ভাষিক দক্ষতা ভালো হওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তাদেরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের যেহেতু স্নায়ুতান্ত্রিক অসম্পূর্ণতা থাকে, সেজন্য তারা ভাষাবোধের ক্ষেত্রে এক ধরনের সরল ব্যাকরণ কাঠামো নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সামাজিক সংজ্ঞাপনের জন্য যে উন্নত ভাষিক সামর্থ্য, উচ্চতর মানসিক ধারণা ও সামাজিকবোধ বিকশিত হওয়া প্রয়োজন তা এএসডি শিশুর ক্ষেত্রে হয় না। সে কারণে এসএসডি শিশুরা প্রাত্যহিক জীবনের নানামাত্রিক সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি দেখিয়ে থাকে।

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আলোচনায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের সাহায্যে বাংলা ভাষী এএসডি শিশুদের সামাজিক সংজ্ঞাপনের স্বরূপ কেমন তার একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণায় সামাজিক ঘটনাময়তার ফল, কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী উচ্চ-দক্ষ শিশুরা মোটামুটি সফল হলেও নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অসফল। তাই বলা যেতে পারে, বিশ্বের অন্যান্য এএসডি শিশুর মতো বাংলা ভাষী এএসডি শিশুদেরও সামাজিক সংজ্ঞাপনের দক্ষতা প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ভবিষ্যতে দীর্ঘকালীন গবেষণার (longitudinal research) উপাত্ত নিয়ে বৃহৎ পরিসরে বাংলাভাষী টিপিক্যাল ও এ্যাটিপিক্যাল শিশুদের মধ্যে একটি তুলনামূলক গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

মৃণাল নাথ (১৯৯৯) *ভাষা ও সমাজ*। কলিকাতা : নয়া উদ্যোগ

সুনীতি চক্রবর্তী (২০১২)। *অটিজম আমাদের অসাধারণ শিশুরা*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed, DSM-IV.). Washington, DC: American Psychiatric Association

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders,* (DSM-V.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Charman, T. & Stone, W. (2006). *Social and Communication Development in Autism Spectrum Disorders. Early Identification, Diagnosis and Intervention.* New York London: The Guilford Press.

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, *2*, 217–250.

Ruble, L.A. (2001). Analysis of Social Interactions as Goal-Directed Behaviors in Children With Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, vol. 31(5), 471-482

Tse, J., Strulovitch, J., Tagalakis, V., Meng, L., & Fombonne, E. (2007). Social skills training for adolescents with Asperger's syndrome and high functioning autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders,* 37, 1960-1968. doi: 10.1007/s108403-006-0343-3.

Turkington, C. & Anan, R. (2007). *The Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.* New York: Facts On File, Inc.

Ullman, M. T. (2004). Contributions of memory circuits to language: The declarative/procedural model. *Cognition*, *92*(1), 231-270.

Volkmar, F.R. & Klin, A. (1993). Social development in autism: Historical and clinical perspectives. In S.Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg & D. J. Cohen (eds.), *Understanding other minds: Perspectives from autism*, 41-55. Oxford: OUP

Volkmar, F. R., Paul. R., Klin, A. & Cohen, D. (eds.) (2005). *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, pp-312-334*. New Jersey: Wiley John Wiley & Sons. INC.

Waterhouse, L. (1994). Severity of impairment in autism. In S.Broman & J. Grafman (eds.), *Atypical cognitive deficits in Developmental disorders: Implications for brain function*, 159-179. New Jersey: Erlbaum

Wing, L. & Gould, J. (1979). Severe impairment of social interaction and associated abnormality in children: Epidemiology and classification. *Journal of Autism and Childhood Schizophrenia*, vol. 9, 11-29

Wing, L. (1981). Asperger's syndrome: a clinical account. *Psychological medicine*, *11*(1), 115-130.

পরিশিষ্ট

(ভিডিওচিত্র সংযোজিত) সারণি : ভিডিওচিত্রে প্রদর্শিত সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে অটিস্টিক শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

ভিডিও সম্পর্কিত প্রশ্ন→ অংশগ্রহণ কারী↓	দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কী?	ছোট ছেলে প্রথম এসে কী বললো?	বড় ছেলেটি ফোনে কী বললো?	ফোন করার সময় বড় ছেলে কী চিহ্ন দেখালো?	ছোট ছেলের ক্লাসে কী হয়েছিল?	বড় ছেলেটি ছোট ছেলেটির জন্য কী নিয়ে আসলো	ছোট ছেলেটি কী কারণে খুশি হলো	রাতে খাওয়ার কথা বললে ছোট ছেলেটি কী বললো	ছোট ছেলেটি কী বড় ছেলের বাসায় রাতে থেকে গিয়েছিল	বিদায়ের সময় তারা কী বললো	ভিডিওটির বিষয়বস্তু কী
মর (উদ)	√ ভাই হয়	√ জড়িয়ে ধরলো	x	x	√	√	√	x থ্যাংক ইউ বলেছিল	x	√ আবার দেখা হবে	x অনেক মজা হয়েছে
নস (উদ)	√ ভাই (সাহায্য করতে হয়েছে)	√ সালাম দিয়েছে	√ Congratulation বলেছে	x	x	√	√	x থ্যাংক ইউ দিয়েছে	x	x আসি	x
হন (উদ)	x সম্পর্ক বিষয়টি বুঝতে পারেনি	√ সালাম দিল ও বসলো	x	x	√	√	x	√	x	√ আল্লাহ হাফেজ আবার দেখা হবে	x
শভ (উদ)	√ ভাই	x	x	x	x	√	x	√	x	x	x
মহ (উদ)	√ ভাই	√ সালাম দিল	√ Congratulation বলেছে	x	√ ক্লাস পার্টি	√ বই	√	√ রাত হয়ে গেছে	√ না	√ আল্লাহ হাফেজ	x
পশ (উদ)	√	√	x	x	√ ক্লাস পার্টি	√ বই	√	√ মা বকবে	√	√ বাই	x
ধর (উদ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
আর (উদ)	√ ভাই	x গল্প বললো	x	x	√	√	x	x		√ চলে যেতে বলেছে	x
শব (নিদ)	√ বন্ধু	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
শম (নিদ)	√ বন্ধু সাহায্য করতে হয়েছে	√ সালাম দিল	x	x	x	x	√ বই দিয়েছে	x	x	x টা-টা দিল	x
অন (নিদ)	√ ভাই	x	x		x	x	x	x	x	x	x
আল (নিদ)	√ বন্ধু	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
হস (নিদ)	√ বন্ধু	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
সন (নিদ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজ

সুমন কান্তি বড়ুয়া*

Abstract : The Buddhist settlement in the territory of Bangladesh is beginning before the Christian era.The philosophy of Gautama Buddha is without class and discrimination and it is universal. From the common people to Kings, people of all walks of life, were involved in this religious faiths in Buddha's period. The religious culture has a glorious past in this country. The ancient Buddhist tradition of Bangladesh is a unique memorial of this religious history. The beautiful Buddhist monasteries building was built here under the patronage of different Kings. Where apart from religion, all subjects of knowledge and science was practiced. This religious patronage was related to the political evolution. As over the ages the gloriousness of Buddhism has been fertile in this soil, also it has been destroyed for many reasons. Thus, the Buddhism were spread here through the many ups and downs. In this development the stream has always flowed with the cordial goodwill of some personality or the other. Such as the emperor Ashoka in the Mauryan period, Dharmapala and Devapala Kings ect. in the period of Pala. The Buddhist society of Bangladesh is the resonance of that current. Although this independent sovereign Bangladesh was not built in a day. It was achieved at the cost of countless lives and sacrifices through the liberation war. Liberation war is the golden history of Bengali nation. It was a universal war of Bengali. The freedom focused Bengalis spontaneously participated in it, regardless of religion, caste, creed and community. The Buddhist Community of Bangladesh was also involved in it in the various ways. Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman was the focal point of their inspiration. His idealistic spirit imbued everyone. To build a free independent non-communal country for the soil and people of Bengal. At present the Buddhists are a minority community in Bangladesh. The Buddhist community has a many memories with the liberation war and the Bangabandu. Apart from participation in liberation force, much of how they played a public welfare role in post independence of Bangladesh is still undiscovered. How did the Buddhist community of Bangladesh see the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? What are their their assessment? This article is an attempt to explain with the appropriate elements of history that, how the Buddhist society of Bangladesh is related with those two issues.

এক

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ বসতির সূচনা হয় প্রাচীনকালে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সামাজিক পরিচয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাব। তিনি ছিলেন

* অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও লোকশিক্ষক। যদিও যুগ পরম্পরায় তাঁর পরিচিতির বিস্তৃতি ঘটেছে ধর্ম প্রচারক হিসেবে। ইতিহাস মতে তিনি রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম লুম্বিনীতে (বর্তমান নেপাল)। সাধনার মাধ্যমে তাঁর পরম সম্বোধির ব্যুৎপত্তি হয় উরুবিল্ব বা গয়ায়। এটি বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যে। সম্বোধি লাভোত্তর তিনি জগতে খ্যাত হন 'বুদ্ধ'নামে । 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ পরমাত্মিক জ্ঞানে উদ্বোধিত ব্যক্তি। যিনি চার আর্যসত্য সম্যকভাবে অবগত হয়েছেন। বুদ্ধ পঁতাল্লিশ বছরব্যাপি তাঁর অর্জিত জ্ঞান দর্শনের প্রচার করেন। দেশ হতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয় তাঁর দর্শন। সাধারণ মানুষ হতে রাজা–মহারাজাও অভিষিক্ত হয় তাঁর অমিয় দর্শনে। ক্রমে বাংলার এ ভূখণ্ডেও এ জ্ঞান দর্শনের ব্যাপ্তি ঘটে ।

বৌদ্ধধর্ম কখন এদেশে এসেছে তা ঠিকভাবে বলা কঠিন। এ বিষয়ে বৌদ্ধদের একটি পৌরাণিক মত বা মিথ আছে। সেটি প্রকাশ পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থে। এতে 'সুমাগধাবদান' উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে গৌতম বুদ্ধ ঋদ্ধি প্রভায় (আধ্যাত্মিক সাধনশক্তি) একবার পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। বুদ্ধের একনিষ্ঠ অনুসারী অনাথপিণ্ড'র কন্যা সুমাগদার আমন্ত্রণে। সুমাগদা পুণ্ড্রবর্ধনে আসেন বিবাহসূত্রে। এখানে সুমাগদার শ্বশুরবাড়ি ছিল। সে মতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাব । তবে, ঋদ্ধিবলে না হলেও নদী পথ ধরে আসাও অসম্ভব কিছু নয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পত্তন হয়েছিল (হেমচন্দ্র,১৯৭২:৩০৯)। শ্রীলংকার বৌদ্ধ ইতিহাস 'মহাবংস' গ্রন্থেও এটি উল্লেখিত। প্রাচীন ভারতে সম্রাট অশোক প্রায় একচল্লিশ (২৭৩-২৩২খ্রি. পূ.) বছর রাজত্ব করেন (পি,এন, ১৯৭৩:৬০)। তাঁর রাজত্বের নবম বছরে তিনি ঐতিহাসক যুদ্ধের মাধ্যমে কলিঙ্গ জয় করেন। উল্লেখ্য যে, এ জয়ে তাঁর রাজ্য সীমারেখা বিস্তৃত হলেও তিনি হারান মানসিক প্রশান্তি। যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ ও প্রাণির মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করে তোলে। এসময় তাঁর অস্থির চঞ্চল মনকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু (পি.এন. ১৯৭৩:৬০)। পরবর্তীকালে এ বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এই ধর্ম দর্শনের মর্মবাণী উপলব্ধি করেন, এবং জনকল্যাণে এগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিশ্বের নয় স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। যাঁদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এসময় ভিক্ষু সোন থের ও উত্তরা থের'র নেতৃত্বে একটি দল যায় মায়ানমার (উইলিয়াম, ১৯৮৬ : ৮৬)। নদী পথে মায়ানমার যাত্রাকালে উক্ত ধর্মদূত দল বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ নানাস্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সূত্রপাত হয়। সম্রাট অশোকের সমকালে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়।

এ সময় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বহুল বিস্তৃতি লাভ করে বাংলায়। কিন্তু রাজনৈতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। এর প্রভাব ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় মৌর্য যুগ পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের বিস্তৃতির পথ এই উপমহাদেশে অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সময় এ অঞ্চলের শাসনকার্যে ক্রমান্বয়ে আসে সুঙ্গ, কন্ব, গুপ্ত, খড়্গ, মল্লবংশ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে নানাবিধ কার্যক্রমের জন্য গুপ্ত যুগ ও গৌড় যুগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। ধর্মান্তরিত হয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ। বিশেষ করে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধরা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক অঞ্চল বৌদ্ধ শূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শশাঙ্ক নিজেও ধরে রাখতে

পারেননি তাঁর রাজ্যের কর্তৃত্ব। শশাঙ্কের রাজত্বকাল পরবর্তী সময়ে শুরু হয় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। বাংলার ইতিহাসে এটি 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত। এ সময় বাংলায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অভাবিত অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ তীব্র হয়ে ওঠে। এই অরাজকতার অবসান হয় পালবংশের প্রতিষ্ঠার পর (আনিসুজ্জামান,সম্পা. ১৯৮৭ :৫১)।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তিনি অষ্টম শতাব্দীর (৭৫০ –৭৭০) মধ্যভাগে বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। পাল বংশ প্রায় চারশত বছর বাংলায় রাজত্ব করে। পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার শুধু শান্তি ও সমৃদ্ধিই বর্ধিত হয়নি, সেই সাথে বিকশিত হয়েছে গণতান্ত্রিকতা ও রাজনৈতিক উদারতা— যা বাংলার জনগণ আগে কখনো দেখেনি। ইন্ডিয়ান গেজেটিয়ারে (The Gazetter Of India,volum two, 1973:60) বিষয়টি এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু পাল বংশ রাজত্বের শেষের দিকে তাঁদের শাসনতান্ত্রিক গৌরবকে ধরে রাখতে পারেনি। বিশেষ করে বাংলায় পাল বংশের কর্তৃত্ব শেষের দিকে হ্রাস পেয়েছিল। এ সময় বাংলায় ক্রমান্বয়ে চন্দ্র বংশ, সেন বংশ, দেববংশ রাজত্ব করে। এই ক্রমধারায় ত্রয়োদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে (Abdul Momin, 1967: 266)। এরপর মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয় এ অঞ্চলে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশি যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় আসে ইংরেজ কর্তৃত্ব। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়।

বাংলায় ইংরেজদের শাসন ছিল একটি উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ইংরেজরা নানা কালাকানুনও তৈরি করে। কিন্তু, এ ব্যবস্থা বাঙালিদের কাছে অনুচিত হিসেবে গৃহীত হয়। ব্রিটিশদের এই অনুপ্রবিষ্ট স্বেচ্ছাচার ক্রমে বাঙালিদের অতিষ্ঠ করে তোলে। বাঙালিরা পরাধীনতার এই শৃঙ্খল ভাঙতে শরুন বোধে জাগ্রত হয়। কালক্রমে বাঙালির স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ্য আন্দোলনে রূপ লাভ করে। এই আন্দোলনে ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি যুক্ত হয়। কিন্তু ইংরেজদের দমন নীতির কারণে প্রকাশ্যে আন্দোলন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুরু হয় ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব।

এই অভিযাত্রায় বাংলার বৌদ্ধ সমাজের স্বাধীনতাকামী সচেতন ব্যক্তিরা পিছিয়ে ছিলেন না। এসময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন বিপ্লবী রোহিনীরঞ্জন বড়ুয়া। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয় ফরিদপুর জেলে। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অর্ন্তগত আবুরখীল গ্রামে। মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া পটিয়া থানাধীন ধলঘাট বাড়ি। তিনি ছিলেন মাস্টার দা সূর্যসেনের সহযোগী। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠনোত্তর ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতধারায় আরো শাস্তি প্রাপ্ত হন লালমোহন বড়ুয়া, ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, তরণীসেন বড়ুয়া, প্রবীন বড়ুয়া, নীরেন্দ্র চৌধুরী, ও মহেশচন্দ্র বড়ুয়াসহ নাম না জানা অনেকে (শিমুল, ২০১২:১৮১)। উল্লেখ্য যে,শুধু গৃহীবৌদ্ধ নয়, অনেক সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুও এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের এই সম্পৃক্ততায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিলনা। শুধুমাত্র স্বাজাতিক ও স্বাদেশিক মূল্যবোধের নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা নিপীড়িত বাংলার জনগণের পক্ষ হয়ে নীরব বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের (১৯১৪-২০০২), সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মহাথের (১৯০৯-১৯৮৪), পণ্ডিত জিনরতন মহাথের (১৯০৯-১৯৮৪), সংঘনায়ক জ্যোতিপাল মহাথের (১৯০৯-১৯৮৪), সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের (১৯৩২-২০২০) প্রমুখ(শুদ্ধানন্দ, ২০০৪:৪৭)। বৌদ্ধদের এই নিরন্তর দেশপ্রেমের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার প্রাথমিক উৎস হলো সর্বজনীন মঙ্গলবোধ তথা অনুশীলিত সংস্কার, যার মধ্যে রয়েছে

সততা, নৈতিকতা ও মানবিকতা। এগুলো বৌদ্ধদের নৈমিত্তিক চর্চার বিষয়। ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যত্যয়ও ঘটে। তবে এ উদাহরণ নিতান্তই কম। বিশেষত বৌদ্ধরা সর্বজনীন মঙ্গলকামী নেতৃত্বের প্রতি থাকে সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। বৌদ্ধদের এই শিক্ষা অর্জিত হয় 'বজ্জীধর্ম' অনুসরণ হতে। বজ্জীধর্ম হলো বুদ্ধের সমকালীন বৈশালীর অধিবাসীদের আচরণ পদ্ধতি, যাঁদের সবকিছুর মূল মন্ত্র হলো সর্ব বিষয়ে একতাবদ্ধ থাকা (ত্রিপিটক, মহাপরিনির্বাণসূত্র)। বর্তমানকালের বৌদ্ধদের মধ্যেও এই চেতনার সঞ্চার রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ দেশের শোষিত বঞ্চিতদের পক্ষে যারা কথা বলেছে সর্বদা তাদের পক্ষেই ছিল। এঁদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বৌদ্ধ মনীষী মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও মংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল (শুদ্ধানন্দ, ২০০৪ : ৪৬)।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সর্বসময়েই বৌদ্ধরা নিবেদিত। এটি বৌদ্ধদের সামাজিক সংস্কৃতি। যে কারণে বৌদ্ধরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও সকল গণতান্ত্রিক কাজে সব সময়েই সক্রিয় ছিল। এছাড়া নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়া এটি বৌদ্ধদের একটি ধর্মীয় সংস্কার। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী পাকিস্তানি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এ দেশের বৌদ্ধসম্প্রদায়। তাই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অভিযাত্রার সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হিরণ্ময় ইতিহাস। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণের অমূল্য গৌরবের সম্পদ এটি। বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস ধারণ করে। তাই অকুতোভয় নির্ভীক চৈতন্যে এতে যুক্ত হয়েছে বাংলার বৌদ্ধসমাজ। মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল বিশেষভাবে। তাহলো বৌদ্ধদের প্রজন্ম পরম্পরায় চর্চিত মানবিক সংস্কার, দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্যবোধ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চ–এর ভাষণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই উজ্জীবনমূলক ভাষণে দেশের আপাময় জনসাধারণের সাথে বৌদ্ধরাও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই উদ্দীপনার শক্তিতে এদেশের বৌদ্ধরা যার যার অবস্থান থেকে সকলেই যুক্ত হয় এই মুক্তিসংগ্রামে। এবিষয়ে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের রচিত 'রক্তঝরার দিনগুলিতে' নামক পুস্তিকায় (হাসান হাফিজুর, ১৯৮২ : ৮৭৫)। এসময় সামর্থ্যবান প্রায় সকল বৌদ্ধ যুবক ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিক ভাবে অক্ষম অনেক ব্যক্তি যুক্ত হয় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বেসরকারি প্রচারণায় ও আন্তর্জাতিক জনসমর্থন যোগানোর কাজে। এবিষয়ে অলোকসামান্য অবদান রেখেছেন কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মনীষী, যা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হয় সর্বমহলে। এতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রয়াত সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের। তিনি মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ২২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে আখাউড়া হয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছেন। আগরতলায় বাংলাদেশ মিশনের তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব মাহবুব আলম চাষী, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, জনাব এইচ, টি ইমাম, ড. হোসেন আলী, ড. আকবর আলী খানসহ আরো অনেকে। এসময় তাঁর সাথে আরো তিনজন খ্যাতিমান বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। তাঁরা হলেন শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাথের ও শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু। জ্যোতিঃপাল মহাথের তিনজনের এই দল নিয়ে আগরতলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে প্রচারণা শুরু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ মিশন তাঁকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেন (প্রশান্ত, ২০০৩ : ১০৭)।

জ্যোতিঃপাল মহাথের ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে আগরতলা শরণার্থী শিবিরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। দেশি বিদেশি পঁয়ত্রিশজন সাংবাদিক এতে যোগদান করেন। একজন অরাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জ্যোতিঃপাল মহাথেরর বক্তব্যকে সাংবাদিকবৃন্দ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। তাঁরা জ্যোতিঃপাল মহাথেরর বক্তব্যকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণী হতে প্রচার করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক চলমান অত্যাচার, অবিচার, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, গণহত্যা ও লুঠতরাজের চিত্র বিশ্বের বহু দেশে পৌঁছে যায়। জ্যোতিঃপাল মহাথেরর বক্তব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন জনাব মাহবুব আলম চাষী।

এরপর জ্যোতিঃপাল মহাথের ত্রিপুরা রাজ্যের তদানীন্তন মূখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্যসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাক্ষাতের পর ভারতে আশ্রিত বাঙালিদের প্রতি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তথা ভারত সরকারের তৎপরতা বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আগরতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতি নন্দিনী সৎপতি-র সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরর (প্রশান্ত, ২০০৩:৮৯)। মন্ত্রী মহোদয়া আগরতলা এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করতে। মন্ত্রী বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র প্রকাশে জ্যোতিঃপাল মহাথেরর নির্ভিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। মন্ত্রী প্রয়োজনে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতেও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইতোমধ্যে জ্যোতিঃপাল মহাথের একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগ করে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরার। পরিকল্পনার বিষয়টি স্থানীয় বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারকে অবহিত করা হয়। মুজিবনগর সরকার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। অস্থায়ী সরকারের পক্ষে ড. হোসেন আলী ও ড. আকবর আলী খান জ্যোতিঃপাল মহাথেরর সাথে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। এই সামগ্রিক বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন সরকারের অন্যতম কর্মকর্তা জনাব এইচ, টি, ইমাম। এ সময় জ্যোতিঃপাল মহাথের'র সফরসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা হয় নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনাব এম, আর, সিদ্দিকীকে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই শুরু হলো অভিযাত্রা। জ্যোতিঃপাল মহাথের আগরতলা থেকে প্রথমে যাত্রা করলেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্দেশে। দমদম বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী, আব্দুল করিম চৌধুরী, তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও মাহাবুব আলম চাষী। তাঁদের দেখে জ্যোতিঃপাল মহাথের অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলেন। তাঁরা জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে নয়াদিল্লি থেকে কীভাবে বহিঃরাষ্ট্র গমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। পরের দিন সকাল ৯টায় কলকাতা থেকে জ্যোতিঃপাল মহাথের যাত্রা করলেন দিল্লীর উদ্দেশ্যে। দিল্লি পালাম বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও বাংলাদেশ মিশনের জনাব সেহাবউদ্দীন। দিল্লিতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো অশোক হোটেলে। হোটেলে এম, আর, সিদ্দিকীর সাথে রাতে কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হলো। ঠিক করা হলো দিল্লীতে কিছুদিন থেকে কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের সাথে মত বিনিময় করা। এর সূত্র ধরে প্রথমে দিল্লির খ্যাতিমান কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষুর সাথে যোগাযোগ করা হলো। তাঁদের সাথে আলাপ করে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলো। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় রাজ্য সভার ভাইস চেয়ারম্যান মি. বি. ডি. খোব্র গার্ডজী এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মি. বি. ডি.মৌরিয়, রেভারেন্ড এইচ, এইচ, কুসুম বকুলা, মি.সি. সি. গোছহই, মি.সি.পরসর, মি. ডি. ভাণ্ডবে,ও মি.শশিভূষণ প্রমুখ। তাঁদের কাছে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর বর্বরতম অত্যাচারের কথা তুলে ধরা হলো। ৮ অগাস্ট সাক্ষাতের সুযোগ হলো ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং এর সাথে (প্রশান্ত, ২০০৩:৯২)।

এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলার ক্রমিক প্রচেষ্টার বহুমাত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়। পরিচয় হয় ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে। এসময় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর পরিচিতিরও বিস্তৃতি ঘটে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই জনসমর্থনের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রচার হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সুযোগ হয় ভারতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করার। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিবেদিত প্রাণ এক সরকার প্রধান। ১৯৭১ এর ২১ জুলাই সকাল নয়টায় ছিল এই মহান নেত্রীর সাথে সাক্ষাতের মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রায় আধা ঘন্টা আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো সবিস্তারে বাংলাদেশের চলমান অরাজক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিলেন। সেসময় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সাথে ছিলেন ভারতের খ্যাতিমান বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীমৎ ধর্মবিরিয়ো মহাথের।

এবার জ্যোতিঃপাল মহাথেরো সিদ্ধান্ত নিলেন বৌদ্ধবিশ্বে ভ্রমণের কর্মসূচি বাস্তবায়নে। আসন্ন কর্মসূচির পক্ষে কাজ করতে দিল্লিতে দীর্ঘদিন থাকার কারণে তাঁর জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সাথে পূর্ব নির্ধারিত সফর সঙ্গী জনাব এম, আর, সিদ্দিকী যুক্ত হয়ে পড়েন অন্য কার্যক্রমে। হঠাৎ করে তাঁকে আমেরিকা সফরের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন করা হয়। এজন্য হাইকোর্টের এডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদকে যুক্ত করা হয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সাথে।

৭ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, প্রথমে তাঁরা যোগাযোগ করলেন শ্রীলংকার সাথে। জ্যোতিঃপাল মহাথের ও ফকির শাহাবুদ্দীন মহোদয় নয়দিল্লি হতে কলোম্বোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। এসময় কলোম্বোতে বাঙালিদের উপর পার্ক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের লক্ষ্যে শান্তিপ্রিয় ও মানবতাবাদী শ্রীলংকাবাসীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির নাম দেয় হয় `Ceylon Committe for Human Rights in East Bengal। এই কমিটির চেয়ারম্যান ও সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীলংকার দুজন স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন যথাক্রমে জাতিসংঘে শ্রীলংকার প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ সেনাপথ গুণবর্ধন এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মি. অমর দাশ ফার্নেন্ডা। এই সংস্থা বাংলাদেশের দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের জন্য পূর্ব হতেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। শ্রীলংকার সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থার নেতৃবৃন্দের সাথে একাধিক বেঠক করেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল। বাঙালিদের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তাঁরা উপস্থাপন করেন। যার মাধ্যমে শ্রীলংকার সরকার ও জনগণের মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিকতার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো হয়ে ওঠে। শ্রীলংকার পত্র–পত্রিকায় পার্কবাহিনী কর্তৃক বাঙালি নির্যাতনের বিষয়টি অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীলংকার সরকার বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীলংকার আকাশ সীমায় পাকিস্তানি বিমান উড়ার নিষেধাজ্ঞা। শ্রীলংকার সরকারের এই পদক্ষেপে পাকিস্তানকে মারাত্মকভাবে বিপাকে ফেলে।

শ্রীলংকায় অবস্থান কালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল উপরিউক্ত জনসংযোগ ছাড়াও শ্রীলংকা বৌদ্ধ কংগ্রেসের সভাপতি ভিক্ষু বিপুলসার থের, কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের মহানায়ক শ্রীমৎ সুমন সিদ্ধার্থ মহাথের, শ্রীলংকার গণপরিষদ ভবনে গিয়ে কয়েকজন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ন্যাক্কার জনক জঘন্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী বন্দর নায়েকের কাছে একটি আবেদন পৌঁছানো হয়। এতে সেদেশের পাঁচ জন মন্ত্রীর সুপারিশ ও গ্রহণ করা হয়েছিল।

শ্রীলংকায় পাঁচদিন অবস্থানের পর ১২ আগস্ট তারা রওয়ানা করেন থাইল্যান্ডের উদ্দেশে। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ওয়াল্ড ফেলোশিপ অব বুদ্ধিস্টস্ এর তদানীন্তন সভানেত্রী রাজকুমারী পুন পিসমাই দিস্কুল ও সেক্রেটারি জেনারেল মি. থাইয়েম সংঘবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করে পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নরহত্যা, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন, অসংস্য বৌদ্ধবিহার ও নিরীহ বয়োবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর অত্যাচার বিষয়ে তাদের অবহিত করেন। বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থার নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ প্রতিনিধির কথায় অত্যান্ত আবেগ আপ্লুত ও ব্যথিত হলেন। এই বিশ্ববৌদ্ধ সংস্থা হতে জাতিসংঘ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাঙালিদের বাঁচানোর জন্য অনুরোধপত্র পাঠালেন। সেই সাথে পাকিস্তান সরকারের কাছে পত্র দিয়ে ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আহবান জানালেন। এ সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল থ্যাইল্যান্ডের প্রধান বিচারপতি সন্ন ধর্মশক্তি ও থাইল্যান্ড সরকারের ধর্ম বিভাগের মহাপরিচালকের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এই বিষয়গুলো থাইল্যান্ডের পত্র-পত্রিকাসহ সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

১৬ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। জাপানে প্রখ্যাত মানবতাকর্মী ব্যক্তিত্ব জাপান বুদ্ধ এডোরেশন কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেন্ট বি. রি. নাকায়ামার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জাপানস্থ আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ও সাংবাদিকদের সাথে একাধিক বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। জাপানের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থনের বিষয়টি বেশ ফলাও করে প্রচারিত হয়। এদিকে ১৮-২০ অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। সে সম্মেলনে একত্রিশটি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ্রচার প্রতিনিধি দলে ভদন্ত জ্যেতিঃপাল মহাথেরোর নামও স্থান পায়। সে সম্মেলনে যোগদান করতে প্রতিনিধিদল চলে আসেন নয়াদিল্লীতে। সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. এ. আর মল্লিক।

উল্লেখ্য যে,ভদন্ত জ্যোতিঃপাল মহাথের ১২ এপ্রিল ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ধর্মীয় জীবন যাত্রায় তিনি চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তিনি সাংঘিক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা 'সংঘনায়ক' পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরনোত্তর 'একুশে পদক' ও 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকে মহিমান্বিত বরেছে।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিশ্বে ভদন্ত জ্যেতি;পাল মহাথেরোর প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পাশবিক অত্যাচারের কথা আন্তর্জাতিক মহলে জোড়ালো ভাবে প্রকাশিত হয়। এতে পাকিস্তান সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এরই সূত্র ধরে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে অবস্থানরত বৌদ্ধনেতাদের দিয়ে পাল্টা বিবৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাকিস্তান সরকার তদানীন্তন বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের কর্মকর্তার মাধ্যমে বিবৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাকিস্তান সরকার বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর দ্বারস্ত হয় (তিনি তখনও মহাসংঘনায়ক পদে আসীন হননি)। হঠাৎ একদিন টেপ রেকর্ডার নিয়ে তিনজন সরকারি কর্মকর্তা মহাথেরর বৌদ্ধ বিহারে উপস্থিত। তারা মহাথেরকে সরকারের লিখিত একটি বিবৃতি পাঠ করার অনুরোধ করেন। যেখানে লেখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধরা ভাল আছে। প্রত্যেকে শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করছে। এখানে কোনো সহিংসতা নেই ইত্যাদি, ইত্যাদি। তখন বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তাদের বলেন দেশের নানা অঞ্চল হতে আমার কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে সরজমিনে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখার জন্য। আমি

তাদের সাথে দেখা না করে বিবৃতি দিলে মানুষ তা গ্রহণ করবে না। তাই আগে তাদের দেখে আসা উচিত। কিন্তু আমাকে কোথাও যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বিশেষ করে চট্টগ্রামে তাঁর জন্মস্থানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন কয়েকটি এলাকা ঘুরে এসে বিবৃতি দিলে এটি আরো গ্রহণযোগ্য হবে। এভাবে বলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের সেদিন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার হাত থেকে প্রাথমিকভাবে রেহাই পেলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের মিলিটারি সরকার ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর বিবৃতি প্রদানে নেতিবাচক মনোভাবকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। সেদিনই বৌদ্ধ বিহারের টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সে সময় ঢাকার সবুজবাগস্থ বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন কোনো পরিবারে ব্যক্তিগত টেলিফোন ছিল না। এলাকাবাসী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে নানা জরুরি প্রয়োজনে বৌদ্ধ বিহারে এসেই জরুরি টেলিফোনের কাজটি সমাধা করতেন। তাই বৌদ্ধ বিহারের টেলিফোনের সাথে এলাকাবাসীর গভীর সম্পর্ক ছিল। টেলিফোন লাইন কাটাতে স্থানীয়দের কাছে খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরো গভীর হচ্ছে বলে সবার কাছে প্রতীয়মান হয়।

এমন পরিস্থিতিতে নতুন আর এক বিপর্যয় এলো ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের জীবনে। হঠাৎ একদিন গভর্নর হাউজের কর্মকর্তা গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন ঢাকাস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে। উদ্দেশ্য মহাথেরকে গর্ভনর হাউজে নেয়া; গর্ভনর টিক্কাখান তাঁর সাথে আলাপ করবেন। ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের গর্ভনর হাউজে যেতে সঙ্গে নিলেন তাঁর সংগঠনের কর্মী শ্রীজ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়াকে। গর্ভনর হাউজে পৌঁছে যা হলো তা ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তাঁর 'রক্তঝরা দিনগুলিতে' নামক পুস্তিকায় বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> ".....গিয়ে দেখি তৎকালীন চীফ অব স্টাফ হামিদ খান আর গর্ভনর টিক্কা খান এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছে। হামিদ খান আমাকে বললো, আপনাকে বিদেশে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে পরিভ্রমণে যেতে হবে। এখানে যে আপনারা শান্তিতে আছেন এবং যে সামান্য গণ্ডগোল বেঁধেছিল তা ঠিক হয়ে গেছে। এটাই বলতে হবে। আমি পাকিস্তানি বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো। বৌদ্ধদের নিরাপত্তা পাবার কথা শুনে আমি আশান্বিত হলাম; একই সাথে ভাবলাম দেশে চলমান প্রলয় যে, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে সেটাকে সম্পর্ণ উপেক্ষা করে কীভাবে একটা ডাহা মিথ্যা প্রচারণা চালাবার জন্য বিদেশে যাবো। একটা সম্প্রদায়কে রক্ষা করার নামে কী করে একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবো।"

– এই ভেবে তিনি কৌশলে তাদের প্রস্তারের বিরোধিতা না করে তাদের কাছে অনুরোধ করলেন তাঁকে আগে তাঁর এলাকার মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। তখন তাকে একটা সফর সূচি দাখিল করতে বলা হলো। এ সময় প্রশাসনের অনুমতি ব্যতিরেকে ঘর থেকে কারো বের হওয়ার সাধ্য ছিল না।

ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গভর্ণর হাউজ থেকে ফিরে এলেন। বৌদ্ধ বিহারে এসে ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন। কীভাবে দেশমাতৃকার মর্যাদা রক্ষা করে কর্ম পরিকল্পনা করা যায় তা ভাবতে লাগলেন। ইতোমধ্যে বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছে কয়েকশত হিন্দু–বৌদ্ধ নর-নারী। দুর্ভাগ্য সেই রাতে লুট করা হয় বৌদ্ধ বিহার। রাত প্রায় আড়াই টার সময় পাঁচ-ছয়জন লোক এসে জরুরি প্রয়োজনে টেলিফোন করবে বলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথোরোর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলে। তারপর তাঁর প্রার্থনা কক্ষ হতে জাপান হতে উপহারপ্রাপ্ত স্বর্ণের বুদ্ধমূর্তি ও আলমিরা হতে কিছু দামি জিনিসপত্র নিয়ে তারা চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি প্রশাসন তাগিদ দিচ্ছে তাঁকে বিদেশ সফরের জন্য। তখন তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে চট্টগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণ করার কর্মসূচি পেশ করেন।

বলাবাহুল্য, এসময় তাঁর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ কারণে সরকারি লোক সময়ে অসময়ে বৌদ্ধ বিহারে আসা চরম আতংকের বিষয় ছিল। তাই বিশুদ্ধানন্দ মহাথোরো সরকারকে একটি কর্মসূচি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখাই শ্রেয় মনে করলেন। এ সময় বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন অমর সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদ ও তাঁর পরিবার, আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী মনোরঞ্জন ধর, শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, রাজনীতিবিদ মি. দিলীপ বড়ুয়া ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী আর. এন. দত্তগুপ্তসহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ডিসেম্বরের প্রথম দিকে দেশের কয়েক এলাকায় স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়। এসময় সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদ পরিবার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার থেকে নিজ বাসায় চলে যান, এবং এর পর তিনি নিখোঁজ হন।

দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠ নিয়ে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর দেশের অভ্যান্তরে পরিদর্শন কর্মসূচি শুরু হলো। ঢাকা থেকে তিনি সাথে নিলেন তাঁর এক সুহৃদ জনাব মোঃ ইসহাক চৌধুরীকে। চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রামের সন্তান। তিনি সামরিক বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা। চট্টগ্রামে পৌঁছার পর আরো কয়েকজন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে যুক্ত হলেন। সেই সাথে যেখানে যাওয়া হয় সেই থানা প্রশাসনের প্রতিনিধি সাথে থাকেন। এ সময় প্রশাসনের সাথে কথা বলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তাঁর কর্মীদের একটি 'পরিচয়পত্র' প্রদানের অনুমতি নিলেন কর্তৃপক্ষ হতে। সে অনুসারে যেখানে তিনি যেতেন সেখানে এই পরিচয়পত্র যুবকদের দিতেন। শুধু চট্টগ্রামেই সত্তর হাজার পরিচয়পত্র তিনি দিয়েছিন। এই পরিচয়পত্রের মর্মার্থ হলো- পরিচয়পত্রধারী একজন বৌদ্ধ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী। এই পরিচয়পত্র নিয়ে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান অসংখ্য যুবক শাসকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশুদ্ধানন্দ মহাথের যেখানে গিয়েছেন সেখানেই তিনি এই পরিচয় পত্রপ্রদান করেছেন। এভাবে তিন মাস আট দিন তিনি দেশের ভিতর পরিভ্রমণ করেন। এর মধ্যে যে জেলাগুলোতে তিনি গিয়েছেন সেগুলো হলো— চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, যশোর, বরিশাল, বাগেরহাট, ভোলা, পটুয়াখালী ইত্যাদি। বিশুদ্ধানন্দ মাহথেরোর বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনের খবর শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে বেতারে প্রচার করা হতো। একজন ধর্মীয় গুরুকে দেশের শান্তি শৃংখলার চিত্র পরিদর্শনে সরকার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে এভাবে প্রচার হতো। এই ফাঁকে ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের 'পরিচয়পত্র' প্রদানের মাধমে অসংখ্য মানুষকে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হতে এবং নিজেদের জীবন রক্ষা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। বহু মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু, ইতোমধ্যে দেশের অনেক বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধগ্রাম পাকিস্তানি মিলিটারি আগুন দিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছে। গৃহহারা হয়েছে বৌদ্ধসমাজের হাজার হাজার বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। মৃত্যু বরণ করেছে অসংখ্য মানুষ। এ সম্পর্কে মাহ্বুব উল আলম তাঁর 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে– ''সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানেই ক্ষৌরকার (নাপিত) হলো হিন্দু। এই নাপিত না হলে মুসলমানেরও চলে না, এমনকি মিলিটারীরও চলে না। কিন্তু, হিন্দু এলাকায় হানা দিয়ে মিলিটারীরা যখন অগ্নিসংযোগ ও গুলি করে মেরেছে তখন নাপিতও রেহাই পায়নি। বেচারারা বলেছিল তারা হিন্দু বটে, তবে নাপিত। এ 'নাপিত' কথাটি মিলিটারীরা বুঝতে পারেনি। কিছু নাপিত মারা যাওয়ার পর অবশিষ্টরা জানতে পারে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে নাপিতকে 'হাজাম' বলে। তখন তারা নিজেদের পরিচয় দিতে থাকে 'হাজাম' বলে। মিলিটারীরাও এটি বুঝতে পেরে তাদের রেহাই দেয়। এরূপ অপঘাত সইতে হয়েছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেও। ধর্মে বৌদ্ধরা হিন্দুদের সাথে এক নয়। তবে চেহারায় ও চলা ফেরায় এক। যদিও মুখমণ্ডল ও চোখের আদলে এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা বাইরের লোকের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তাই 'বৌদ্ধ' বলা সত্বেও মিলিটারীরা বৌদ্ধদের হিন্দু ধরে নিয়ে হত্যা করে। পরে বাঁচবার তাগিদে

একটা নতুন কথা আবিষ্কৃত হয়ে যায়। 'চাইনীজ বুড্ডিস্ট' অর্থাৎ চীনা বৌদ্ধ। এটি শুনলে মিলিটারীরা বৌদ্ধদের অব্যহতি দিতে থাকে।" মূলত ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের প্রদত্ত পরিচয়পত্রটি এসময় বৌদ্ধ পরিচয়ের একটি প্রামাণিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত হতো। এই পরিচয়পত্রের মাধ্যমে অনেকেই রেহাই পেয়েছে।

একদিকে শাসক গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধানন্দ মাহথেরকে বিদেশ যাওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকে কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্বদেশের মাটি ও মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত স্বাধিকার বোধকে অমর্যাদা করতে রাজি হলেন না। তিনি কৌশলে যোগাযোগ করলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলামের সাথে। তাঁর পরামর্শে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের অসুস্থ হয়ে গেলেন। ভর্তি হলেন পি, জি, হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা সময়ে তিনি বিদেশের সাথে নানাভাবে যোগাযোগ করলেন। সে যোগাযোগের ভিত্তিতে The World Conference of Religion for Peace সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল Dr. Homer A. Jack তাঁকে দেখতে বাংলাদেশে আসলেন। হাসপাতালে তার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করলেন। বিশুদ্ধানন্দ মহাথের বিষয়টি নিজের ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন:

> 'আমার বন্ধু Dr. Jack একদিনের জন্য ঢাকায় আসেন। আমি তখন হাসপাতালে। সেখানে তাঁর সাথে পুরো তিন ঘণ্টা আলাপ হয়। দীর্ঘ পরিভ্রমণে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি এবং শুনেছি তা তাঁকে জানালাম। রাজাকার ও পাকসৈন্যের অত্যাচার, অনাচার লুটতরাজ হত্যাযজ্ঞ, নারীহরণ ও নির্যাতন— সবই তাঁকে সবিস্তারে বলেছি। আমার হাসপাতালে আশ্রয় নেয়ার কারণ এবং এই সাক্ষাতের তথ্য প্রকাশ হলে আমার জীবনের সংশয় আছে বলেও তাঁকে জানিয়েছি (বিশুদ্ধানন্দ, ১৯৭২:৭)।

Dr. Jack বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। তিনি আমেরিকা ফিরে যাওয়ার পথে নয়াদিল্লিতে গিয়ে এ বিষয়ে বাইশটি সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন করেন। পরে ওয়াশিংটন পৌঁছে তাঁর সংস্থাধীন পঞ্চান্নটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের চলমান গণহত্যা ও পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববাসীর জনসমর্থন সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। তাঁর এই কার্যক্রম নিয়ে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারির এক বিশেষ সংখ্যায় 'হিন্দুস্থান টাইম' পত্রিকায় সাংবাদিক এন. সি. মেনন How Dhaka Monk saved many lives শিরোনামে লিখেন –

> "The dancing flames highlighted the ochre robes as the monk passed between the two rows of houses in the burning village, Despite years of practiced self control, his face was red with rage… . Between May 13 and August 21 the Mahathera travelled over 7,500 miles in Chittagong and the Hill Tracts, Comilla, Khulna, Jessore, Tangail and Barishal trying to bring what little comfort he could to the multitudes that had suffered the army's repression. But the regours of the tour and the cumulative effects of the heart rending scenes he witnessed, were too much and he had to return to Dhaka and into hospital. (সূত্র: জিতেন্দ্র, ২০০৬:৫৩)

উল্লেখ্য যে,এই মহান মানবহিতৈষী বৌদ্ধ ভিক্ষু মনীষা ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মাহথেরোর জীবনাবসান ঘটে ২ মার্চ ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তিনি বৌদ্ধদের অবিসংবাদিত নেতা

হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধ সাংঘিক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদা 'মহসংঘনায়ক' পদে বরিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরনোত্তর 'একুশে পদক' প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানকে মহিমান্বিত করেছে।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নানাভাবে অবদান রেখে দেশমাতৃকার ঐতিহ্য ও গৌরবকে সুদৃঢ় করেছেন। অসংখ্য বৌদ্ধ যুবক মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে শহিদ হয়েছেন। সরকারি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত আছে তাঁদের নাম। বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুরা তাঁদের অবস্থান থেকে নৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এছাড়া সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া, সুব্রত বড়ুয়া, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া প্রমুখ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কলম সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন। এসময় বাংলাদেশের বেশিরভাগ বৌদ্ধ বিহার ছিল মুক্তিবাহিনীর অন্যতম আশ্রয়স্থল। কারণ বৌদ্ধ বিহারগুলো সাধারণত নীরব নির্জন স্থানে হয় বলে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব ছিল। পরবর্তীকালে এ তথ্য রাজাকার আলবদরদের মাধ্যমে প্রচার হয়ে গেলে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু লাঞ্ছিত হয়। এমনকি ভিক্ষু জিনানন্দকে জীবন দিতে হয়েছে পূর্ণ বিজয় সূচিত হওয়ার কিছুদিন আগে।

এভাবে সকল বৌদ্ধ যার যার অবস্থান থেকে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক ও অন্যান্য সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে এতে যুক্ত হয়েছিলেন।তখন সকলের অন্তরে শুধু একটিই শ্লোগান 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। যা বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে উজ্জীবিত করেছিল স্বাধীনতার সোনালি স্বপ্নে।

দুই

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজ আদি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারার লালিত। বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক ধারার অনুসারী বাংলাদেশের এই বৌদ্ধ সমাজ। এক কথায় যাকে বলা হয় 'থেরবাদী' বৌদ্ধ সম্প্রদায়। প্রজন্ম পরম্পরায় নানা চড়াই উৎরাইয়ের স্রোতধারায় গড়ে ওঠেছে বাংলাদেশের আজকের বৌদ্ধ সমাজ। এদেশের বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতি ও লোকাচারের সাথে যেমন এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি সম্পর্ক রয়েছে রাজনীতি ও নেতৃত্বের সাথে। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে রয়েছে এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সম্পর্ক। যা ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। এবং, সম্পৃক্ত শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায়। যেহেতু, বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জীবনের বহু স্মৃতিময় বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

মুক্তিযুদ্ধের সাথে যে নামটি অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে সেটি হলো বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পর পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় কোন দিকে যাবে এ নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে একপ্রকার সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর বিশুদ্ধানন্দ মহাথের 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশের বৌদ্ধদের আশ্বস্ত করলেন বৌদ্ধ ঐতিহ্যর গৌরবসমৃদ্ধ এই বাংলায় বৌদ্ধদের থাকতে। সেই সংস্থা ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ একটি সম্মেলনের মাধ্যমে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যে এটি ফলাও করে প্রচার লাভ করে যে, বাংলাদেশের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) বৌদ্ধরা এই মাটির সন্তান। সুতারং আপন গৌরব ও স্বমহিমায় তারা এ মাটিকে ধারণ করবে। এখানেই গড়ে ওঠবে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সমৃদ্ধময় বসতি। ব্রিটিশ বিরোধী কর্মযজ্ঞে বৌদ্ধরা সম্পৃক্ত হয়েছে এই মাটিকে ধারণ করেই।

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার গৌরবময় ইতিহাস থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান আমলে বৌদ্ধরা রাজনীতির সাথে তেমন যুক্ত ছিলেন না। তবে দেশ বিভাজনের আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের অনেকেই কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে সাংগঠনিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় মূলত মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর হাত ধরে। তিনি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নামক ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এছাড়া বৌদ্ধ যুবসমাজ রাজনীতিমুখী হয় ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে। স্বাদেশিক মূল্যবোধের উত্তাল স্রোতে। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বৌদ্ধ শিক্ষার্থী মিস্ প্রতিভা মুৎসুদ্দি, মি. ডি.পি বড়ুয়া, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া প্রমুখ দেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে আওয়ামী মুসলিমলীগের গঠনতন্ত্রে আসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। আওয়ামী লীগের দুয়ার সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে বাঙালির সর্বজনীন রাজনৈতিক দল। এসময় 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র নাম পরিবর্তন করা হয়। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের যোগদানের সুযোগ করে দেয়া হয়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টেবর সম্মেলনের মাধ্যমে নীতিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। নাম হয় 'আওয়ামী লীগ'। এতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আওয়ামী লীগে প্রবেশের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে সংযুক্ত হওয়ার যেমন সুযোগ হয়েছে, তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান সর্বসাধারণের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তখন রাজনীতি অনুরাগী বৌদ্ধদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম খুব প্রচার লাভ করে। নেতৃত্বশীল রাজনৈতিক দলের উদারপন্থি নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছেও বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেন।

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে তিনি উত্থাপন করেন ঐতিহাসিক "ছয় দফা" দাবি। এটি যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠান দাবি তাই রাজনীতি সচেতন বৌদ্ধরাও এই দাবির সাথে মনে প্রাণে একাত্ম হয়ে ওঠে (শুদ্ধানন্দ, ২০০৪:৮০)।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ গঠনে প্রদেশব্যাপী এক নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। মাচ মাসের ৮-১২ তারিখ পর্যন্ত এ নির্বাচন চলে। নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুসলিম লীগ ও যুক্ত ফ্রন্টের সাথে। যুক্তফ্রন্টের তিন নেতাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ যুক্তফ্রন্টে বৃহৎ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। এই নির্বাচনে ৩০৯ আসনের মধ্যে ৭২টি ছিল অমুসলিমদের জন্য। এর মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য ছিল ২টি আসন। একটি সমতলীয় বৌদ্ধদের জন্য, অন্যটি চট্টগ্রামের তিন পাবর্ত্য জেলার বৌদ্ধদের জন্য।

সমতলীয় বৌদ্ধদের একটি আসনের জন্য নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছিলেন প্রায় ছয় জন। তাঁরা হলেন- বেরতী মোহন বড়ুয়া, সংঘমিত্র মুৎসুদ্দি, ফণীভূষণ বড়ুয়া, অমিতাভ চৌধুরী, নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া ও সুধাংশু বিমল বড়ুয়া। এঁদের মধ্যে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর আর্শিবাদপুষ্ট ছিলেন। তাঁর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সেকারণে জনসমর্থনে তিনি এগিয়ে ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের অনুরাগীসদস্য হিসেবে সুধাংশ বিমল বড়ুয়াকে অনেকে ভোট দেয়। তিনি এ নিবার্চনে জয়ী হন। এভাবে শেখ মুজিবুর

রহমানের নাম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলে। সর্বজনীন ও সর্বস্তরের মানুষের নেতা হিসাবে বৌদ্ধদের অন্তরে তিনি স্থান করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভেদ রেখা টেনে নির্বাচন করার পক্ষে ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তাঁর মতে এরূপ বিভাজনে সংখ্যালঘুদের যেমন অমর্যাদা করা হয়, তেমনি বাঙালির সমন্বিত শক্তিকে খণ্ডিত করা হয়। তাই তিনি সংসদে বলেছিলেন –

> 'আমার এক বন্ধু বলেছেন যে, তারা মাইনরিটিদর সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কীভাবে সমানভাবে দেখবেন – Islamic Republic নাম Change করে দিয়ে? Islamic Republic না হয়ে–Pakistan Republic হোক, আমরা একথা নিয়ে fight করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সব সমান হবে– সত্য এবং সাম্যের ভিত্তিতে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। যেখানে মিথ্যা, ঘুষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অবিচার, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ চলছে – যেখানে মানুষ খেতে পায় না, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, থাকবার গৃহ পায় না সেখানে ইসলাম কি করে থাকে? আর যদি দেখতে পাই প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে খেতে পাচ্ছে, শিক্ষা পাচ্ছে, বে–ইনছাফ নাই, অনাচার নাই, অত্যাচার নাই, মিথ্যা নাই, তখন নাম না রাখলেও Islamic Republic হবে (East Pakistan Assembly Proceedings, 1956:180)।

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের সকল মানুষ সম মর্যাদা নিয়েই বসবাস করুক। তাই বঙ্গবন্ধু বৌদ্ধ তথা সংখ্যালঘুদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই খুব কাছের মানুষ ছিলেন, অন্তরের মানুষ ছিলেন, ভালবাসার মানুষ ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সমতার যে চৈতন্যের কথা বঙ্গবন্ধু বলতেন, বাস্তবে তিনি তা লালনও করতেন। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে তিনি অর্ন্তভুক্ত করেছিলেন চার মূলনীতি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সগৌরবে পাকিস্তানের কারান্তরীণ থেকে মুক্ত হলো। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সগৌরব বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। অত্যন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের জনগণ তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল। এই অভ্যর্থনায় অসংখ্যা বৌদ্ধ নর-নারী অংশ গ্রহণ করল। পরবর্তীকালে ৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও তাঁর সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ সময় তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অসহায় পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের কল্যাণে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন তা জাতির জনককে অবহিত করেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন জ্যোতিঃপাল মহাথের ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বন্যাদুর্গত এলাকার সাহায্যের জন্য থাইল্যান্ডের বৌদ্ধদের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুই হাজার ডলার তুলে দিলেন জাতির পিতার হাতে। এখানে অর্থ মূল্যটি গুরুত্বের বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো নেতার কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আন্তরিক তৎপরতা। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুও বৌদ্ধদের এই আন্তরিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে বঙ্গবন্ধু যখন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ উদ্বোধনের জন্য চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে রাঙামাটি যাচ্ছেন, তখন রাউজানে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকেও মঞ্চে আসন প্রদান করা হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু মহাথেরর কাছ থেকে বৌদ্ধদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এ সময় মহাথেরর সাথে ছিলেন ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, তিনি বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীয়র সদস্য, তাঁকে বঙ্গবন্ধু সবার সামনে বললেন – 'ইয়াং প্রফেসর! মহাথেরর সাথে থেকে দেশের কিছু কাজ করো'। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া দেশের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক লাভ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজের সম্পর্ক আদর্শগত এবং অত্যন্ত আন্তরিক। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের চেতনায় বৌদ্ধসমাজ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয়ী অনুসারী। বঙ্গবন্ধু অখণ্ড বাঙালিত্বে বিশ্বাস করতেন। তাই সংখ্যার দিক থেকে নয়, চেতনা ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়কে তিনি সমমর্যাদায় গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর এই মানবিক মূল্যবোধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে কর্ম ও কর্মফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ, মুক্তিযুদ্ধ হলো কর্ম এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন হলো সেই কর্মেরই ফল। এই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের মূখ্য সংঘটনকর্তা ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্যতম প্রতিভূ। এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও অখন্ড নাগরিক সত্তায় বিশ্বাসী। অতএব, ধর্ম বর্ণের ভিত্তিতে নয়, বাঙালি তথা বাংলাদেশের নাগরিক এই সর্বজনীন পরিচয়ে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই বৌদ্ধদের কাছে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছিল ব্রতস্বরূপ। সেই ব্রতাচারের জ্যোতির্ময় পথ প্রদর্শক ও অন্যতম অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু। এভাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মননশীল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদর্শগত কারণে ক্রমে সে সম্পর্ক হয় অবিচ্ছেদ্য ও অটুট। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতি সংযুক্ত করে বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর এ উদ্যোগকে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। জাতীয়তাবোধ ও সর্বজনীন মানবিকতাবোধের বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর এই অসাম্প্রদায়িক আদর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বঙ্গবন্ধুকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় মানবিক আদর্শের প্রতীক হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং বাংলাদেশ হলো তাদের পরম শ্রদ্ধার মাতৃভূমি। সুতরাং বলা যায়, 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজ' একই সূত্রে গাঁথা।

উল্লেখপঞ্জি

শরচ্চন্দ্র, [অনূদিত], ১৯৭৫) *বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা*, কলিকাতা: লিপিকা

শিমুল বড়ুয়া, (২০১২), *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস–ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

শুদ্ধানন্দ মহাথের, (২০০৪), *ব্যক্ত হউক জীবনের জয়*, ঢাকা: ধর্মরাজিক

শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির [অনূদিত], (১৯৪১) *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, চট্টগ্রাম: রাঙ্গুনিয়া

হাসান হাফিজুর রহমান [সম্পাদিত], (১৯৮২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড

প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া, (২০০৪), *জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃপাল*, জোবরা, চট্টগ্রাম

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, (২০০৬) *মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ: জীবন ও কর্ম*, ঢাকা: ময়নামতি প্রকাশন

আনিসুজ্জামান [প্রধান সম্পাদক], (১৯৮৭). *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

Hemchandra Raychaudhuri, (1972), *Political History Of Ancient India*, seventh edition, University of Calcutta.

P. N. Chopra,(ed)(1973), *The Gazetter Of India,volum two*, Ministry of Education And Social Welfare, Govt. Of India.

Wilhelm Geiger [Trans.], (1986), *The Mahavamsa*, New Delhi Asian Educational Services.

Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, Dhaka: The Asiatic Society of Pakistan.

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ধারা কেস স্টাডি রাজশাহী জেলা

মো. আবদুর রহিম[*] [**]

Abstract : Bangladesh is a country of villages. Agriculture is the main economic activity in this region. In the past, the living standard of the inhabitants of this region depended on the course of the rural economy. The economic contribution from the industrial sector was insignificant even before the partition of Bengal in 1947. Even though there were some traditional small and cottage industries, they were also based on agriculture. In their spare time, members of the farming family produced some industrial goods. In addition, other professionals such as blacksmiths, potters, weavers, and fishermen contributed to the economy. In the years following the partition, rural economies began to change, but it was not very visible as far as social change was concerned. Bangladesh's rural life underwent a major change after becoming an independent state in 1971. To be specific, the development of rural economies in the last two decades has attracted everyone's attention. Rural economies have undergone a dramatic change as a result of the use of modern technology in agrarian production systems, the expansion of farming and cottage industries, and the arrival of new entrepreneurs in poultry and dairy farms. This phenomenon has resulted in a significant change in people's living standards and cultural life. A growing number of urban amenities are being introduced into rural areas. Almost all regions of Bangladesh are experiencing this change in economic activity. This article analyzes the changes in the rural economy of Rajshahi, one of the oldest districts of Bangladesh. A simultaneous attempt will be made to assess the extent to which rural economies are changing and their impact on public life.

ভূমিকা

রাজশাহী প্রাচীন জনপদ বরেন্দ্রভূমির অংশ। এ অঞ্চলে কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এসকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। কিছু ধর্মীয় ও নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকলেও অধিকাংশের জীবন-জীবীকা কৃষিনির্ভর । আবার গ্রামভেদে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

---

[*] অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[**] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **সেন্টেনিয়াল রিসার্চ গ্রান্টের** আওতায় পরিচালিত ***'বাংলাদেশের বিবর্তিত গ্রামীণ জীবন: রাজশাহী জেলা প্রসঙ্গ'*** শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের রিপোর্ট থেকে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

তবে অধুনা মধ্যযুগীয় গতানুগতিক নিশ্চল অবস্থা থেকে বেরিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। অনেক পেশা বিলুপ্ত হয়েছে, অনেক পেশার আদিরূপের পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু পেশা বিলুপ্তপ্রায়। আধুনিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একদিকে মানুষের জীবনযাত্রাকে উন্নত করেছে, অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকমান, পারস্পরিক সম্প্রীতি, যৌথ জীবন ব্যবস্থা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিকতার অভিঘাতে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই বংশপরম্পরায় চলে আসা পূর্বপুরুষের পেশা পরিবর্তন হয়েছে (জাহিদ, ১৯৯৫, পৃ. ১২)। আলোচ্য প্রবন্ধে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে গ্রামীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জীবনমানকে উন্নত করেছে। আর অর্থনৈতিক পরিবর্তন বলতে গতানুগতিক ধারা থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্যময়তাকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন বিকল্প পন্থার উদ্ভাবন হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্রের সংযুক্তি গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিতে কী কী পরিবর্তন এনেছে তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। একই সাথে এসকল পরিবর্তনের নিয়ামকগুলি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাও থাকবে। বিশেষ করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, প্রথা, সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ করা এবং সমাজ জীবনে সেসবের প্রভাব বিশ্লেষণ করাও বক্ষমান নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা সম্পাদনে প্রধানত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ (empirical) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে অতীতকালের নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোনো সমাজকে বিশ্লেষণ করা যায়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব। গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গ্রামের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। গ্রামের প্রবীণ ও হাল আমলের বিভিন্ন বয়স ও পেশাভেদে বিভিন্ন নাগরিকদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । এসব তথ্যে গ্রাম সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা উঠে এসেছে। গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ- বাউল, পীর, ফকির, সন্ন্যাসী, ইমাম, মোয়াজ্জিম, পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর পেশার লোকেরাও বসবাস করেন। এসব মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধারা জানার জন্য তাঁদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সমীক্ষা করার জন্য রাজশাহী জেলাধীন ৬টি উপজেলার মোট ২৪টি গ্রামকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের জ্যেষ্ঠ গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি গ্রুপভিত্তিক উঠোন বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদান দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণা সম্পাদনে মিশ্র গষেণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যেখানে গবেষণার গুণগত (qualitative) এবং পরিমাণগত (quantitative) উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে রাজশাহী অঞ্চলের বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনমান এবং

অতীতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া গিয়েছে। আর গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ উদঘাটিত হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, সাক্ষাৎকার, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, জরিপ ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে প্রকাশিত বই, রেকর্ড, জীবনবৃত্তান্ত, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা জার্নাল, আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, পশুশুমারি ও বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নমুনার ভৌগোলিক রূপরেখা

উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার ৬টি উপজেলা থেকে ২৪টি গ্রামকে সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। জনজীবনের বিভিন্ন দিক যেমন, বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল। এজন্য এসব গ্রামের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, সমাজ সেবক, বেসরকারি সংস্থার কর্মী ইত্যাদি শ্রেণিপেশার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

জরিপ

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিমাণগত (quantative) পদ্ধতি ব্যবহার করে ২৪টি গ্রামের প্রতিটি থেকে ২০ জন করে ৪৮০ জনের কাছে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ করা হয়েছে। নির্ধারিত উত্তরদাতার মধ্যে গৃহিণী ১১০ জন, কৃষক ১০২ জন, ছাত্র/নির্ভরশীল/অন্যান্য ৯৪ জন, চাকুরিজীবি ৬১ জন, ব্যবসায়ী ৪৭ জন, শ্রমিক/দিনমজুর ১৫ জন, ভ্যান/গাড়ি/অটো চালক ১২জন, কুটির/হস্ত শিল্পে নিয়োজিত ৮জন, ইমাম/পুরোহিত ৮জন, গৃহপরিচারিকা ৭জন, বেকার ৬জন, দর্জি ৫জন, জেলে ৩জন এবং পোশাক শ্রমিক ২জন । এসব উত্তরদাতাগণ নিম্নোক্ত বয়সদলে বিভক্ত:

সারণি-১: উত্তরদাতার বয়সভিত্তিক বিভাজন

বয়স গ্রুপ (বছর)	সংখ্যা
৬০+	৫ জন
৪৫-৫৯	৫ জন
৩০-৪৪	৫ জন
১৫-২৯	৫ জন

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

সেমি স্ট্রাকচার্ড ওপেন এন্ডেড (semi-structured open ended) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গুণগত (qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রামের ২ জন করে ৪৮ জন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, বেসরকারি সংস্থার কর্মী ইত্যাদি ব্যক্তির কাছ থেকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দলপভিত্তিক আলোচনা

দ্বৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ৬টি গ্রামে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রামের জ্যেষ্ঠ নাগরিক, নারী, তরুণ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজশাহীর পরিচয় ও ভৌগোলিক ক্রমবিবর্তন

জনপদ হিসেবে রাজশাহীর প্রাচীনত্ব ইতিহাস স্বীকৃত। প্রাচীন মহাভারতে গো-গৃহের উল্লেখ আছে, তা রাজশাহীর উত্তরভাগে অবস্থিত। রাজশাহী প্রাচীন 'মাৎস' দেশের অন্তর্গত (কমল, ২০০৭, পৃ. ৩২)। পুরাণে বর্ণিত বিরাটনগর মাৎসদেশীয় নরপতি বিরাট স্থাপন করেন। বিরাটনগরে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করেন। বিরাট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল রাজশাহী । মোগল সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমলের ভূমি সংস্কারের সময় প্রদেশসমূহকে বিভিন্ন সরকারে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে 'তাহিরপুর' আর 'সাঁতুল' রাজশাহীর অন্তর্গত (কমল, ২০০৭, পৃ. ৩২)।

রাজা বিরাটের সময় হতে সেনদের সময় পর্যন্ত রাজশাহী হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এর পর এতদঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। অনেকে মনে করেন, এ এলাকা বহু রাজার শাসনাধীন থাকায় এ অঞ্চল রাজশাহী নামে পরিচিতি পেয়েছে। মুর্শিদকুলি খানের ভূমি সংস্কারের সময় যেসকল চাকলা গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে 'নিজ চাকলা রাজশাহী' ছিল তার অন্যতম। ইংরেজদের অধিকারের সময় ঐ চাকলার নামানুসারে রাজশাহী জেলার নামকরণ হয়। ইংরেজ শাসনামলে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহী জেলার আয়তন পশ্চিমসীমা ভাগলপুর আর পূর্বসীমা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর পর বিভিন্ন সময়ে এর আয়তনে পরিবর্তন আসে। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের পর রাজশাহী জেলা ভাগ করে মালদহ, পাবনা, বগুড়া জেলা সৃষ্টি করা হয়। (কমল, ২০০৭, পৃ. ৩২) সময়ের পরিক্রমায় রাজশাহী জেলার ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন ঘটে[১]। এর ফলে আয়তন ও লোকসংখ্যারও তারতম্য দেখা যায়। নিচে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত রাজশাহী জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২: বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার চিত্র (Cercus of India, 1941, 1872) [সূত্র: কমল, ২০০৭, পৃ. ১৫]

সন	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
১৭৮৪	১২,৯৯৯	
১৭৮৬	১২,৯০৯	

১৮৩৪	-	১০,৬৪,৯৫৬
১৮৭২		১৩,১০,৭২৯
১৮৮২	২,২৩৪	
১৮৯১	২,৩৩০	১৩,১৩,৩৩৬
১৮৯৭	২,৫৯৮	
১৯০১	-	১৪২০২৮৫
১৯১১	-	১৪৪৩৪৬১
১৯২১	-	১৪৫৭৪৯১
১৯৩১	-	১৩৮৬৫১৫
১৯৪১	-	১৫৭১৭৫

উপরের চিত্রে বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী জেলার আয়তন ও লোক সংখ্যার তারতম্যের একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা রাজশাহীর মানচিত্রও পরিবর্তিত হয়। দেশভাগের পর সদর সাবডিভিশন, নাটোর সাবডিভিশন, নবাবগঞ্জ সাবডিভিশন এবং নওগাঁ সাবডিভিশন নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত হয়। তৎকালীন সদর সাবডিভিশন বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনাধীন এলাকা। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রথম জনশুমারি অনুযায়ী আলোচনাধীন জেলার মোট আয়তন ৯৪৭ বর্গমাইল, মোট জনমসংখ্যা ছিল ৫,৮৪, ৭০০ জন। মোট বসত বাড়ির সংখ্যা ১,৩৯,০০০টি যা- ৯টি থানা, ৬৮টি ইউনিয়ন এবং ১,৫৬৮টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। (Cercus of Pakistan, 1951) বর্তমানকালে এসব এলাকায় প্রায় সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

i) পরিবারের ধরন

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারও পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিক্রমায় রাজশাহীর মানুষের পরিবারের ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। একসময় রাজশাহীতে জন্মহার বেশি ছিল, তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল। তবে বর্তমান সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের গড়ে পরিবারে লোক সংখ্যা ৫ জন ও গড়ে শিশুর সংখ্যা ২জন । তাদের বাবার ভাই-বোন সংখ্যা (গড়) ৫ জন ও দাদার ভাই-বোন সংখ্যা (গড়) ৪ জন। গ্রামে বসবাসকারী পরিবারের ধরন ও সদস্য সংখ্যায় পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবারের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, পরিবারগুলো দিন দিন ছোট হচ্ছে। এর পিছনের কারণ জানতে চাইলে এক উত্তরদাতা বলেন— *এখন মানুষ দিন দিন সচেতন হচ্ছে, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।*

লেখচিত্র-১: পরিবারের ধরন

ii) ভাগচাষের চিত্র

ভাগচাষ হলো কৃষির এমন একটি স্তর যেখানে জমির মালিক কোনো ভাড়াটেকে জমিতে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে জমিটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। রাজশাহী জেলাও ছিল একটি দারিদ্র কবলিত জনপদ। একসময় এ এলাকার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ছিল। কৃষিকাজ বা চাষাবাদই ছিল মানুষের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। তাই নিজের জমি না থাকলে সে ভাগচাষ পদ্ধতিতে অন্যের জমি চাষাবাদ করত। তাই অতীতে ভাগচাষের প্রচলন অনেক বেশি ছিল। তবে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামে ভাগচাষের প্রচলন পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক কম । গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতে, বর্তমানে ৭.৭০% ক্ষেত্রে ভাগচাষ বেশ প্রচলিত যা পূর্বে ছিল ৪০%। বর্তমানে ২৬.২০% ক্ষেত্রে ভাগচাষ প্রচলিত না যা পূর্বে ছিল ৪.৬০%। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামে দিন দিন ভাগচাষের প্রচলন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। এর পিছনের কারণ জানতে চাইলে এক উত্তরদাতা বলেন— *এখন মানুষ দিন দিন স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাছাড়া ভাগচাষ করে এখন আর পোষায় না। তাই যার নিজের জমি নেই সে চাকরী বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হয়। ফলে, ভাগচাষের প্রচলন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে।*

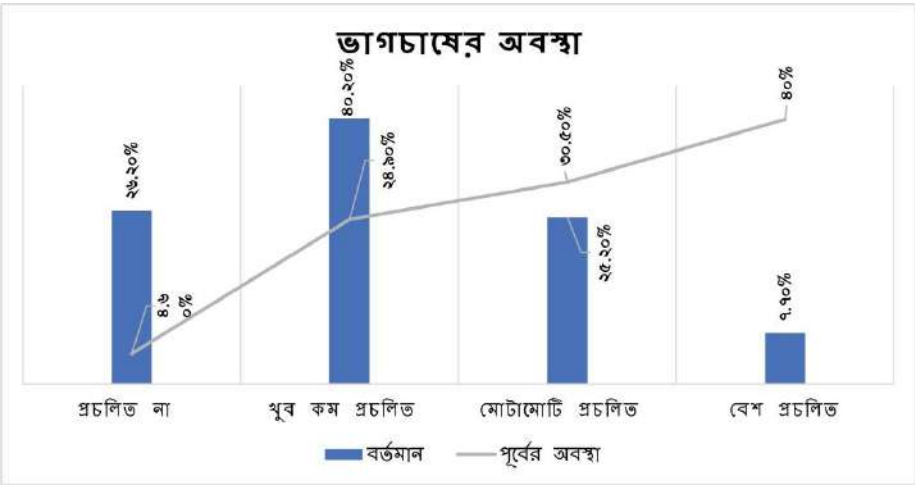

লেখচিত্র -২: ভাগচাষের অবস্থা

iii) রাস্তাঘাটের অবস্থা

অনেকগুলি নদীদ্বারা বেষ্টিত রাজশাহীতে অতীতে প্রায় সকল জায়গায় নৌপথে যাতায়াত করা যেত। (কমল, ২০০৭, পৃ. ২৬) সময়ের পরিক্রমায় রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে এখানকার বেশিরভাগ রাস্তাঘাটেরই অবস্থা ছিল বেশ শোচনীয়। মানুষের যাতায়াতে ভীষণ ভোগান্তি পোহাতে হতো। বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেই দুর্ভোগ কেটে গেছে বললেই চলে। এই গবেষণায় অধিকাংশ (৭৮.৫%) অংশগ্রহণকারীর মতে, স্বাধীনতার পূর্বে রাজশাহীর রাস্তাঘাট ছিল খুব খারাপ। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে একজন উত্তরদাতা বলেন- *স্বাধীনতার পূর্বে সকল রাস্তা ছিল কাঁচা। যোগাযোগের মাধ্যম গরু বা মহিষের গাড়ি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পায়ে হেঁটে যাতায়াত ছিল।*

অন্যদিকে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, বর্তমানে রাজশাহীর রাস্তাঘাট পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। তাঁদের ৪২.২% মনে করেন, বর্তমানে রাস্তাঘাট চলনসই। ৩১.৭% উত্তরদাতার মতে, এখনকার রাস্তাঘাট ভালো। আর, ১৫.১৫% বর্তমান রাস্তাঘাট খুব ভালো বলে ধারণা দেন। বর্তমানের রাস্তাঘাট ও স্বাধীনতার পূর্বের রাস্তাঘাট এর মধ্যে তুলনা করে একজন উত্তরদাতা বলেন- *গ্রামীণ প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম পাকা রাস্তাঘাট, বর্তমানে ভ্যান, রিক্সা, বাস, ইত্যাদি যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। স্বাধীনতার পূর্বে কাঁচা রাস্তা ছিলো। জলপথে নৌকা আর সড়ক পথে গরু/মহিষের গাড়িতেই মানুষ তখন বেশি যাতায়াত করতেন।*

অপর একজন বলেন- *বর্তমানে কাঁচা সেমি পাকা ও সামান্য পাকা রাস্তা রয়েছে। পূর্বে কাঁচা রাস্তা ও জঙ্গল ছিল।*

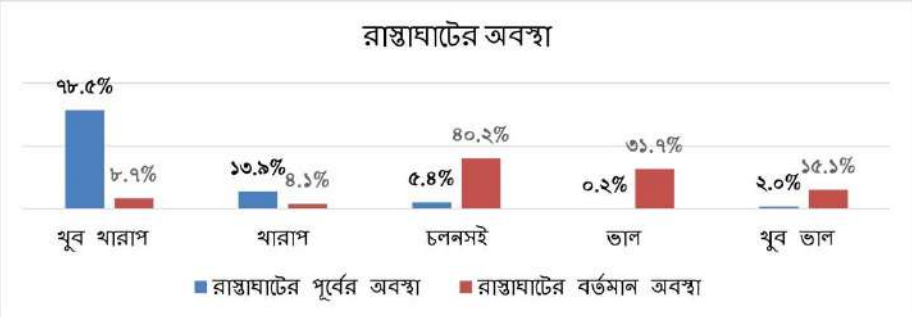

লেখচিত্র-৩: রাস্তাঘাটের অবস্থা

অতীতে যোগাযোগের জন্য নদীপথ বেশি জনপ্রিয় ছিল। কালের আবর্তে সে ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ-রাজড়াদের শাসনামলে রাজশাহীতে স্থলপথ খুববেশি ছিল না। নদীবহুল অঞ্চল হওয়ায় সেসময় জলপথেই বাণিজ্য ও যাতায়াত চলতো। রাজশাহীর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-

> হিন্দু রাজাদের সময়ে রাজপথের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মুসলিমদের সময়েও রাজপথ অতি বিরল ছিল। রাজশাহীতে মুসলমান সময়ে একটিমাত্র রাজবর্ত্ম দেখা যায়। ... রাজশাহীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহাও প্রতীতি হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর ও বগুড়া হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে পদ্মা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তর নদ নদী বিল খাল ছিল এবং এখনও আছে। এজন্যও বোধ হয় সে সময়ে রাস্তা অল্পমাত্র ছিল। (কমল, ২০০৭, পৃ. ৭৭)

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। গ্রামগুলোতে বেশকিছু রাস্তা সংস্কার-উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলমান রয়েছে। কিন্তু, তারপরও তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। রাজশাহীতেও গ্রামীণ পাকা রাস্তার চিত্র সমীক্ষায় উঠে এসছে। গবেষণাটিতে অংশগ্রহণকারী সর্বাধিক ৩২.৪৪% উত্তরদাতা মনে করেন, এলাকাটিতে ০-২০% গ্রামীণ পাকা রাস্তা রয়েছে। সর্বনিম্ন ৬.৮৩% উত্তরদাতার মতে, এই এলাকায় গ্রামীণ পাকা রাস্তার শতকরা (আনুমানিক) পরিমাণ ২০-৪০%। ১৫.১২% উত্তরদাতার ধারণা, এলাকাটিতে ৪১-৬০% গ্রামীণ পাকা রাস্তা আছে। ২৭.২৩% উত্তরদাতা অনুমান করেন, এ এলাকার ৬১-৮০% রাস্তা পাকা। ১৮.২৯% উত্তরদাতার মতে, এই এলাকারার শতকরা (আনুমানিক) ৮১-১০০% রাস্তাই পাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজশাহীর গ্রামগুলোতে পাকার পরিমাণ নিয়ে উত্তরদাতারা অনেকটা মিশ্র ধারণা ব্যক্ত করেন। তবে, প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এই এলাকায় সত্যিকার অর্থেই গ্রামীণ পাকা রাস্তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

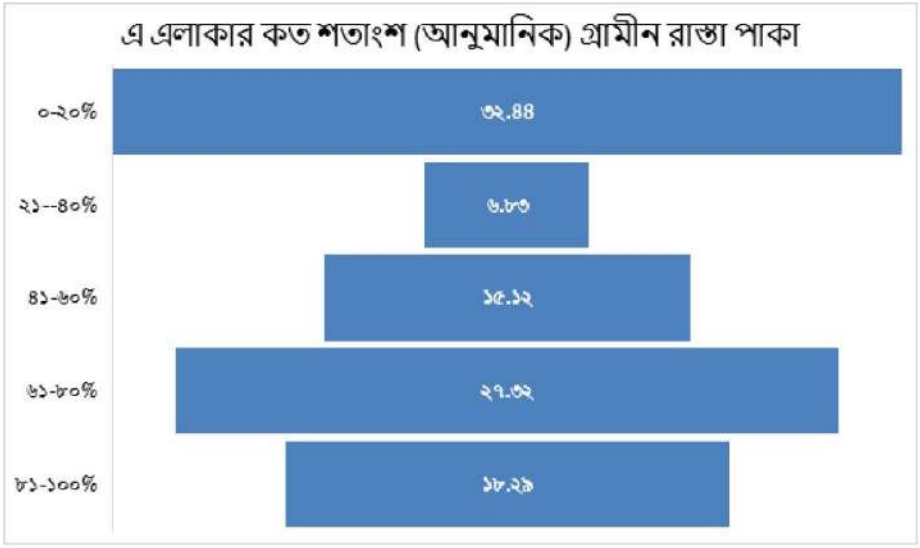

লেখচিত্র-৪ : গ্রামীণ পাকা রাস্তার শতকরা পরিমাণ

iv) গ্রামীণ প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। তবে, প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, খাল ও নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের নিকট রাজশাহীতে গ্রামীণ প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৬২ জন পাকা রাস্তার কথা উল্লেখ করেন। ২০৩ জন উত্তরদাতা পাকা রাস্তার কথা উদ্ধৃত করেন। ২২৫ জন কাঁচা রাস্তার কথা উল্লেখ করেন। সবচেয়ে কম সংখ্যক ১১ জন উত্তরদাতা খালের কথা বলেন। সবশেষে, ১৫ জন উত্তরদাতা গ্রামীণ প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নদীর কথা উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে একজন উত্তরদাতা এভাবে উদ্ধৃত করেন- *গ্রামীণ প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হল পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা।" অপর একজন উত্তরদাতা বলেন, বর্তমানে ৬০-৭০ ভাগ রাস্তা পাকা।*

আবার, কিছুসংখ্যক উত্তরদাতা খাল কিংবা নদীপথে যাতায়াতকে গ্রামীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম বলে ব্যক্ত করেছেন। একই সাথে রাস্তায় আধুনিক সবধরনের যানবাহন চলাচল করে। আগের আমলের গোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি আর তেমন চোখে পড়ে না। গ্রাম জীবনে অত্যাবশ্যকীয় নৌকার প্রচলনও তেমন চোখে পড়ে না।

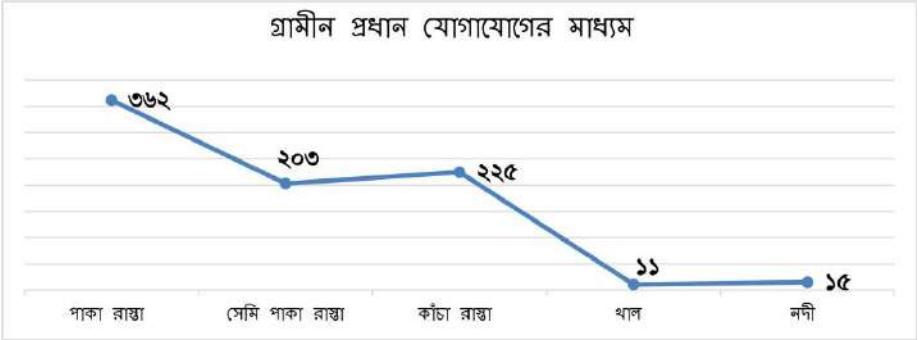

লেখচিত্র-৫ : গ্রামীন প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম

v) গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনধারা

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অন্যতম জেলা রাজশাহীর গ্রামাঞ্চল সর্বদা কর্মমুখর থেকেছে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক কর্মকণ্ডের ভিত্তিতে নানা পেশায় বিভক্ত ছিল। তবে পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী রাজশাহীর মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক জীবন সচল রেখেছিল। নিচের সারণিতে সে সাক্ষ্য মেলে:

সারণি-৩: পেশাভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা হার [২]

পেশা	শতকরা হার
কৃষি	৮১
মৎসজীবী	১
কৃষির সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা ও শিল্প	৪
অন্যান্য শিল্প	৩.৫
অন্যান্য ব্যবসা	.৫
পরিবহন	১
সরকারি চাকরি ও পেশা	২
গৃহস্থালী	.৫
শ্রমিক	৫
ভিক্ষুক ও অন্যান্য	১.৫

উপরের তথ্য অনুসারে সরাসরি কৃষির সাথে জড়িত ছিল শতকরা ৮১ জন মানুষ। কিন্তু কৃষিভিত্তিক অন্যান্য পেশা যোগ করলে সে সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৯০জন। রাজশাহীর জনসংখ্যার সিংহভাগই গ্রামে বাস করেন।এ থেকে বোঝা যায় নগরায়ণের গতি ছিল মন্থর। ১৯৫১ সালে রাজশাহীর মোট জনসংখ্যার ৯৬.১৪ শতাংশ এবং ১৯৬১ সালে ৯৫.৭৩ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করতেন। (Statistical Digest, 1968, p. 28) সেই সময়ে গ্রামের এসব অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। চাকুরি বা ব্যবসায় পেশার লোক খুব বেশি ছিল না। কৃষি কাজ এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন এমন সংখ্যাই বেশি। আবার মৎসজীবী কৃষিকাজও করতেন। মহাভারতের মাৎসদেশ খ্যাত রাজশাহী মাছের প্রাচুর্য ছিল। অতীতে এ অঞ্চলের সব গ্রামেই কয়েকঘর জেলে বাস করতেন। এক পরিসংখ্যানে ২৪ হাজার মৎসজীবীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চলনবিল কেন্দ্রিক ধাওয়া নামক মৎসজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যাও প্রায় ২৫ হাজার। (কমল, ২০০৭, পৃ. ২৮) পেশা নির্বিশেষে এ জেলার লোকেরা সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ছিল বলে তথ্য মেলে। গ্রামের বাইরের জগতের সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। প্রত্যেক গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৩] ধর্মের ভিত্তিতেও কিছু কিছু পেশা নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে ধর্মের ভিত্তিতে রাজশাহী জেলার জনসংখ্যার বিভাজন ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-৪: ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিভাজন (Statistical Digest, 1968, p. 31)

সন	সকল ধর্ম	মুসলিম	বর্ণ হিন্দু	সি. কাস্ট হিন্দু	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
১৯৫১	২২,০৫,০০০	১৭,৭২,০০০	১,৯৭,০০০	২,৩১,০০০	৫,০০০	-	১,০০০
১৯৬১	২৮,১১,০০০	২২,৯৮,০০০	২,৫০,০০০	২,৩৭,০০০	৮,০০০	-	১৮,০০০

রাজশাহীতে চাকরি ও ব্যবসাজীবী লোকসংখ্যা কম ছিল। এখানে কৃষি কাজ লাভজনক ছিল। অনেকে চাকর দ্বারা কৃষি কাজ করেও সুখস্বাচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত হওয়ায় রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমিরূপ উঁচু-নিচু। অতীতে বর্ষাকালে পদ্মা ও তার শাখা ও উপনদীর দু-ধার স্ফিত হয়ে জেলার প্রায় অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয়ে পড়ত। নদীতীরে ও সমতল অঞ্চলের উঁচু ভূমিতে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছিল। ফলে বর্ষাকালে গ্রামগুলিকে এক একটি দ্বীপের মত মনে হতো। বৃক্ষরাজি শোভিত গ্রামগুলিতে শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান। অতীতে রাজা ও জমিদার ব্যতীত অধিকাংশ সাধারণ মানুষের বাড়িই ছিল বাঁশ ও খড় নির্মিত।[৪] ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদারদের বাড়ি ছাড়া অন্যান্য জনসাধারণের পাকাবাড়ি ছিল না বললেই চলে। রাজশাহীতে ঐতিহ্যবাহী মাটির বাড়ি ও বাঁশ-খড় নির্মিত কুঁড়ে ঘর দেখা যেত। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এ চিত্র পরিবর্তন হতে থাকে। স্বাধীনতার একদশক পরে রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরের চিত্র ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-৫: বাড়িঘরের চিত্র[৫]

ছাদের উপকরণ	মোট বাড়ি	দেয়ালের উপকরণ			
		বাঁশ-খড়	কাদা এবং কাঁচা ইট	কাঠ ও সি আই শীট	ইট-সিমেন্ট
সর্বমোট বাড়ি	৭,৭৫,২৫৬	১,৯১,২৭৭	৫,৫৫,৬১৪	৬,৭৫০	২১,৬১৫

বাঁশ-খড়	৪,৫৮,৪৬৪	১,৪৭,৮৬১	৩,০৯,৬১৮	৪৮৯	৪৯৬
টালি	১,০৯,৬০৭	৬,৭৪৯	১,০০,২৯৫	৭৯২	১,৭৭১
কাঠ, সি আই শীট	১,৯৮,৭৭৭	৩৬,৬৬৭	১,৪৫,৭০১	৫,৪৬৯	১০,৯৪০
সিমেন্ট	৮,৪০৮	০	০	০	৮,৪০৮

অবশ্য গ্রাম-বাংলার বসতবাড়ির সাধারণ চিত্র ছিল এটি। স্থানভেদে নির্মাণ উপকরণের কিছু পার্থক্য থাকলেও বাড়িগুলো কুঁড়ে ঘর অথবা মাটি, বাঁশ-কাঠ ও ছনের তৈরি হতো। নির্মাণ সামগ্রীর যোগানের ওপর বিষয়টি নির্ভরশীল। রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরির (১৭৯৩-১৭৯৯) চিঠিপত্রে বাংলার গ্রামের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা উপরোক্ত বিবরণের সাথে মিলে যায়।[৬]

এলফিনস্টোন বাংলা ও ভারতের গ্রামীণ জীবনের দারুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। কৃষকরা গ্রামে একত্রে বসবাস করে, মাঠে দলবেঁধে কাজ করতে যান এবং সন্ধ্যায় গবাদি পশু নিয়ে ঘরে ফেরেন।[৭] গ্রামের মানুষের যৌথ জীবন ব্যবস্থা এক সময় গ্রামগুলোকে স্বয়ম্ভর গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলেছিল। গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামের অর্থনীতিকে সচল রেখেছিল। রাজশাহীতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে পাট, পান, নীল, রেশম এবং গাঁজার চাষ হতো বলে জানা যায়। বর্তমানে প্রায় সকল জমিই চাষাবাদের আওতায় এলেও এ ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পরিচালিত রেভিনিউ সার্ভে অনুযায়ী প্রায় অর্ধেক জমি পতিত ছিল। (কমল, ২০০৭, পৃ. ২৮) পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নিত্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সে চিত্র পরিবর্তন হতে থাকে।

vi) গ্রামীণ হাট-বাজার

পণ্য-সামগ্রী বেচাকেনা ও লেনদেনের জন্য হাট-বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে হাট-বাজারের প্রচলন ছিল। তবে দৈনিক হাট-বাজার বসতো খুব অল্প সংখ্যক স্থানেই। (কমল, ২০০৭, পৃ. ৩০) অস্থায়ী হাট সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন বসত। অনেক ক্ষেত্রে পণ্য-সামগ্রী নিয়ে বসার দোকানগুলিও হাটের দিন একটুকরো কাপড় টানিয়ে তৈরি করা হতো। কোনো কোনো দোকান আবার খোলা আকাশের নিচেই বসত। এসব অস্থায়ী বাজারে সারাদিনব্যাপী কেনা-বেচা চলত। গ্রামীণ ছোট হাটগুলি সাধারণত সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে বিকেল বেলায় বসে সন্ধ্যা অবধি কেনাবেচা চলত। বর্তমানে অনেক স্থানে স্থায়ী হাটবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহীতে স্বাধীনতা পূর্বের অবস্থার তুলনায় হাট বাজারের বর্তমান অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে পাকা দোকান ছিল ০৪% বর্তমানে ৩৮.১০%, পূর্বে আধা পাকা দোকান ছিল ১৫.৫৫% বর্তমানে ৩৫.০৪%, পূর্বে অস্থায়ী দোকান ছিল ৮০.৪৪% বর্তমানে ২৬.৮৬%। এক সাক্ষাৎকারদাতার মতে—

> *হাট-বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের পিছনে কারণ হিসেবে রয়েছে, (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ;(২) মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; (৩) বেসরকারী উদ্যোগ, (৪) সরকারি উদ্যোগ।*

সর্বোপরি, স্বাধীনতা পূর্বের সময়ের তুলনায় বর্তমানে হাট-বাজারের অবস্থার পরিবর্তন মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র বহন করে।

হাট বাজারের পূর্বের অবস্থা	দোকানের ধরন	শতকরা	হাট বাজারের বর্তমান অবস্থা	দোকানের ধরন	শতকরা
	পাকা দোকান	০৪%		পাকা দোকান	৩৮.১০%
	আধা পাকা দোকান	১৫.৫৫%		আধা পাকা দোকান	৩৫.০৪%
	অস্থায়ী দোকান	৮০.৪৪%		অস্থায়ী দোকান	২৬.৮৬%

লেখচিত্র-৬ : হাট বাজারের অবস্থা

vii) মহাজন প্রথা

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহের ন্যায় রাজশাহী জেলাতেও ব্রিটিশ উদ্যোগের আগ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ে মৌসুমী অভাব অনটনের সময় অপ্রচলিত উৎস থেকে অর্থ ধার নেওয়া হতো। তার প্রধান উৎস ছিল মহাজনদের ঋণ। এসব ঋণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এসকল ঋণের সুদের হার ১৮-৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। ঋণ গ্রহীতারা কখনো কখনো খাই-খালাসি বন্ধকীর মাধ্যমেও ঋণ গ্রহণ করত। (মো. আবদুর ২০২২, পৃ. ২২০) ১৯৫৬ সালে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী পূর্ববাংলায় গ্রামীণ ঋণের ৮টি খাত চিহ্নিত করা হয়। যথা- ১. সরকার, ২. কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ৩. পেশাদার অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান, ৪. অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি, ৫. দোকানদার, ৬. মধ্যস্বত্বভোগী- ফড়িয়া, ব্যাপারী, ৭. বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজন এবং ৮. অন্যান্য উৎস।[৮] এই ঋণের ৫৯.৫২ শতাংশ উৎস বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজন। বর্তমানে এই অবস্থার অনেকাংশে পরিবর্তন হয়েছে যার মূলে রয়েছে বিপুল সংখ্যক ব্যাংক-এনজিওর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এ এলাকায় মানুষের তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে তারা নিজেরাও অন্যদের বিপদে-আপদে আর্থিক সহায়তা করতে পারছেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, মহাজন প্রথার প্রচলন পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক কম । বর্তমানে মাত্র ২% ক্ষেত্রে এটি বেশ প্রচলিত যা পূর্বে ছিল ৩২.২০% এবং ৬৫% ক্ষেত্রে এটি প্রচলিত নয় যা পূর্বে ছিল ১৮% ।

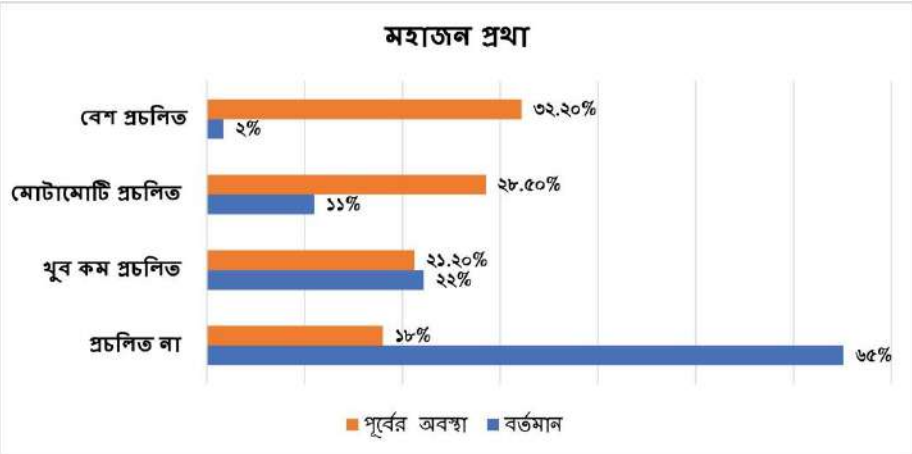

লেখচিত্র-৭ : মহাজন প্রথা

viii) পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

অতীতে পূর্ববাংলা সমৃদ্ধশালী কৃষি উৎপাদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তানি আধা ঔপনিবেশিকক শাসন ও শোষণে এটি পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র অঞ্চলে পরিণত হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এ দেশ সময়ের পরিক্রমায় অর্থনৈতিকভাবে অনেক দূর এগিয়েছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। কিন্তু গ্রামীণ জনপদগুলোয় এখনো কিছু করার সুযোগ রয়েছে। রাজশাহীও এর ব্যতিক্রম নয়। সমীক্ষায় গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার সম্যক চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । তাদের (ব্যক্তিগত) গড় মাসিক ব্যয় ৩৩২১.২ টাকা এবং আয় মাত্র ১৪৩৮৪.৬১ টাকা । তাদের (পারিবারিক) গড় মাসিক ব্যয় ১৪৬২৯.২৭ টাকা এবং আয় মাত্র ২৩৭৮২.২ টাকা ।

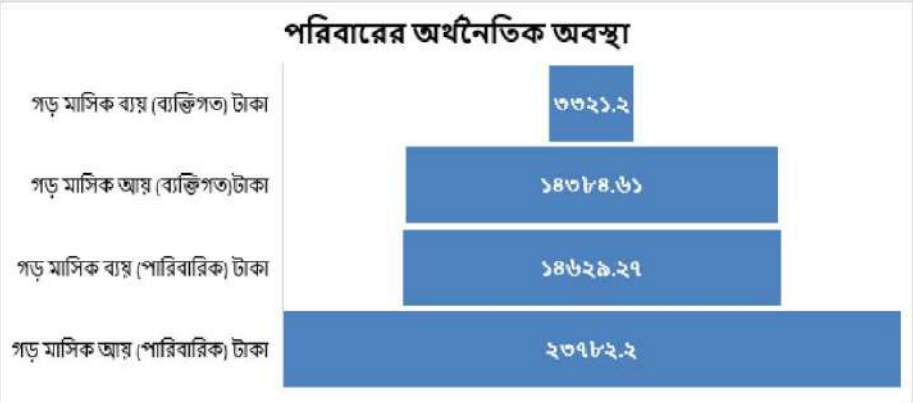

লেখচিত্র-৮: পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

ix) ধার নেয়ার উৎস

একসময় এ এলাকার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এতটা সচ্ছল ছিল না। তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরাও খুব একটা সমৃদ্ধশালী ছিলেন না। আর, তখন এত এত এনজিও ছিল না। ফলে, অভাব-অনটনে পড়লে, উপায়ান্তর না পেয়ে মানুষকে মহাজনদের থেকে ঋণ নিতে হতো। বর্তমানে এই প্রেক্ষাপটটি অনেকাংশে বদলে গেছে যার মুলে রয়েছে বিপুল সংখ্যক এনজিওর উল্যেখযোগ্য ভূমিকা। এ এলাকায় মানুষের তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে তাঁরা নিজেরাও বিপদে-আপদে আর্থিক সহায়তা করতে পারছেন। এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদেরকে এ এলাকার বেশিরভাগ মানুষজন কার কাছ থেকে ধার নেয় এমন প্রশ্ন করা হলে, সর্বাধিক ৩৮১ জন উত্তরদাতা এনজিওর কথা উল্লেখ করেন। ১১১ জন উত্তরদাতা জানান, এ এলাকায় লোকজন তাঁদের বন্ধুদের কিংবা আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার নিয়ে থাকেন। আর, সর্বনিম্ন ৮৫ জন উত্তরদাতার মতে, এ এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহাজন থেকে ধার নেয়া হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে এ এলাকার মানুষ ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে মহাজন নির্ভরতা থেকে সরে এসে ব্যাপক হারে এনজিওমুখী হচ্ছে।

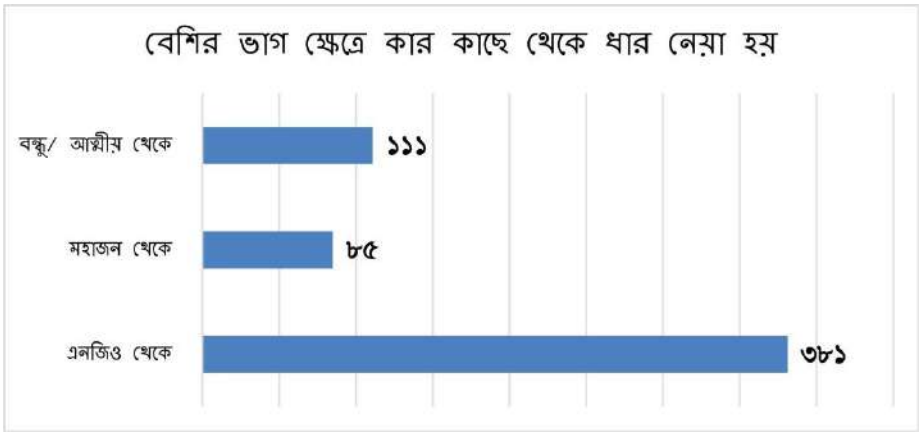

লেখচিত্র-৯ : ঋণের উৎস

x) টাকা লেনদেনের মাধ্যম

মোবাইল ব্যাংকিং টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সুবিধাবহুল মাধ্যম হওয়ায় বাংলাদেশের সর্বত্রই এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। রাজশাহীর মানুষেরাও বর্তমানে লক্ষণীয়ভাবে মোবাইল ব্যাংকিং-এ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। অথচ, কয়েক বছর পূর্বেও এখানকার মানুষ টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পুর্ণরূপে ব্যাংকনির্ভর ছিল। তখন অবশ্য কিছু সংখ্যক মানুষ ডাক বিভাগের সাহায্যেও টাকা লেনদেন করত যা বর্তমানে নগণ্য পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এই এলাকার মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাকা লেনদেন কিভাবে করে থাকেন?- এ প্রশ্নের জবাবে, সর্বাধিক ৬৮% উত্তরদাতা এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং এর কথা উল্লেখ করেন। ৩১.৯% উত্তরদাতা জানান, ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে টাকার লেনদেন হয়। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন ০.১% উত্তরদাতার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, এ এলাকার অধিবাসীরা ডাকবিভাগের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করেন।

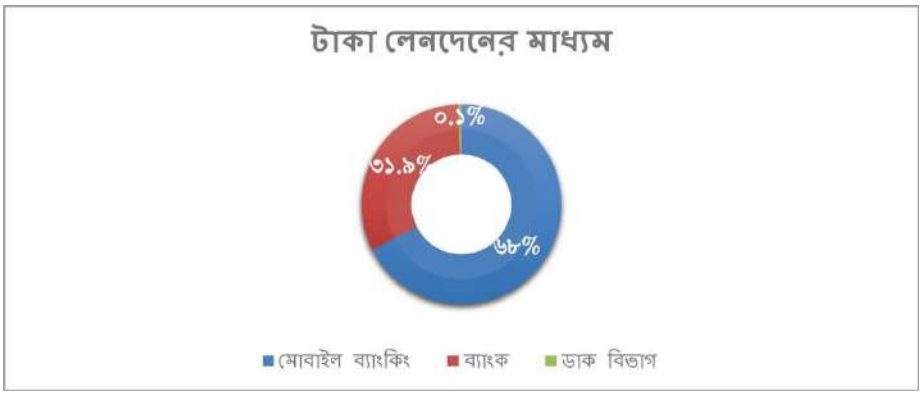

লেখচিত্র-১০ : টাকা লেনদেনের মাধ্যম

xi) সুদ ব্যাবসার প্রচলন

সুদ ব্যাবসা হলো এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে টাকা ধার বা ঋণ দেয়া হয় এবং পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট টাকা হারে লাভ বা মুনাফা বা সুদ নেয়া হয়। সুদ ব্যাবসা পূর্বেও ছিল এবং

এখনও আছে । তবে সুদ কারবারিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে সুদ ব্যবসায় শুধু মহাজনের একচেটিয়া দখল ছিল। তবে বর্তমানে মহাজনের একচেটিয়া বাজার দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন এনজিওগুলো। সুদের হার অনেক। এলাকায় সুদ ব্যাবসা আছে কিনা জানতে চাইলে ৮৭.৮% উত্তরদাতা জানান, এলাকাটিতে সুদ ব্যাবসার প্রচলন রয়েছে। অপরদিকে, ১২.২% উত্তরদাতা এলাকাটিতে সুদ ব্যাবসার প্রচলন নেই বলে জানান। । এ বিষয়ে একজন উত্তরদাতা এভাবে উদ্ধৃত করেন- *সুদ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও বড় মাপের সুদ কারবারি।*

একইভাবে অন্য একজন উত্তরপ্রদানকারী জানান - *ব্যাংক সুদের কারবার বেড়েছে। ১০০ টাকায় ২৫ টাকা সুদ । আশা, ঠেঙ্গামারা, শাপলা ইত্যাদি প্রধান এনজিও ব্যাংক বর্তমানে প্রকাশ্যে সুদ ব্যাবসা করছে।*

আরেক উত্তরদাতা বলেন- *সুদ ব্যাবসা পূর্বে মহাজনের থেকে নেওয়া হতো। বর্তমানে এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে।*

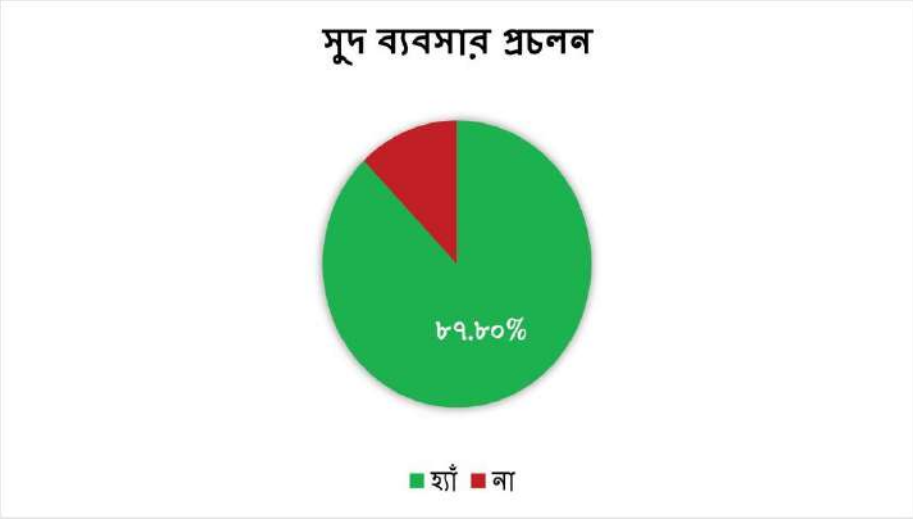

লেখচিত্র-১১: সুদ ব্যবসার প্রচলন

xii) এলাকায় বিদ্যুতায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার প্রভাব

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় শতভাগ এলাকায় বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী এলাকাটিতে কবে বিদ্যুতায়ন হয়? এর জবাবে উত্তরদাতাগণ জানান, ২০০০ সালে এলাকাটি বিদ্যুতায়িত হয়েছে। আবার, কত সালে এই এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ গিয়েছে? প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানান, ২০১৫ সালে এলাকাটিতে সৌরবিদ্যুৎ গিয়েছে। অর্থাৎ, আজ হতে প্রায় ২৩ বছর পূর্বে রাজশাহী এলাকায় বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় এবং এখন থেকে প্রায় ৮ বছর পূর্বে রাজশাহী এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ গিয়েছে।

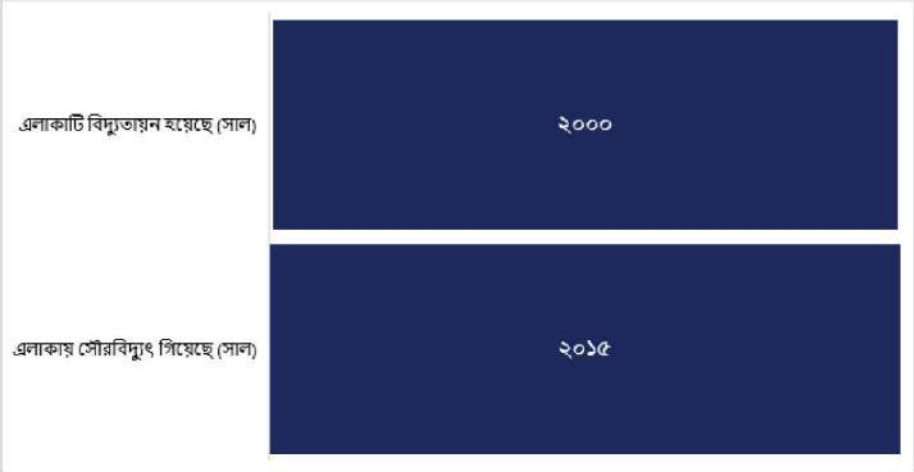

লেখচিত্র-১২ : এলাকায় বিদ্যুতায়ন

উপরের চিত্রে রাজশাহী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্তমানে রাজশাহী অঞ্চলে প্রায় শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পেয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন রাজশাহীর জীবনমানকে উন্নত করেছে।

xiii) গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন ধর্মীয় ও লোকজ সংস্কৃতিতে প্রভাব

গ্রামীণ ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-ইসলামি জলসা ও গানবাজনার আসর আয়োজন। এ দুটোতেই বিপুল জনসমাগম ঘটে। এদের মধ্যে একটি হলো ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যময় আয়োজন এবং অন্যটি হলো সামাজিক অনুষ্ঠান। এলাকায় ইসলামি জলসার আয়োজন হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে ৯৬.১০% উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেন এবং ৩.৯০% উত্তরদানকারী নেতিবাচক সাড়া প্রদান করেন। তবে, হাট/বাজারে গানবাজনার আসর অনুষ্ঠিত হয় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তাঁদের বেশিরভাগই নেতিবাচক উত্তর দেন। এক্ষেত্রে, ৭০.২০% উত্তরদাতা জানান, হাট/বাজারে গানবাজনার আসর অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৯.৮০% জানান যে, হাট/বাজারে গানবাজনার আসর অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব, প্রাপ্ত তথ্যসমূহ থেকে এই মন্তব্যে উপনীত হওয়া যায় যে, রাজশাহীতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান এর চেয়ে বেশি পালিত হয়।

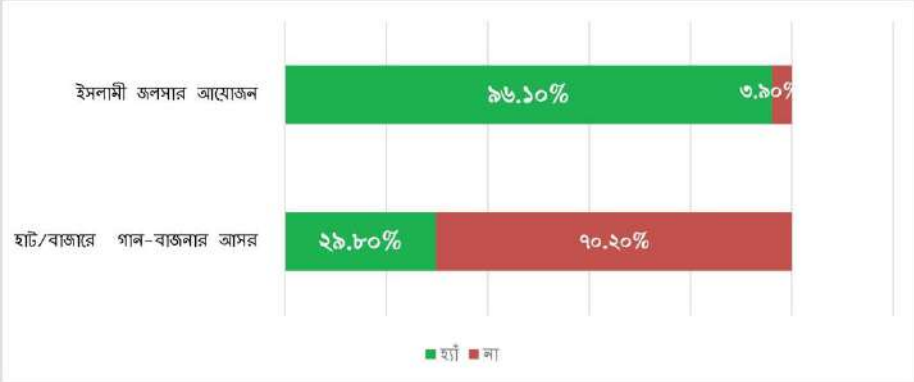

লেখচিত্র ১৩ : ইসলামি জলসার আয়োজন ও হাট/বাজারে গানবাজনার আসর

xiv) উপসংহার

রাজশাহী বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন জনপদ। এ অঞ্চলটি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এটি একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক প্রাচীন উপাদান বিদ্যমান। বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত হওয়ায় এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুলতানি-মোগল-ব্রিটিশ শাসন থেকে পাকিস্তান শাসনামল পর্যন্ত এর সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের গতি ছিল অনেকটা মন্থর। তবে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের গতি উল্লেখযোগ্য। এ পরিবর্তন যেমন এক দিকে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে অন্যদিকে তা ঐতিহ্যিক সমাজ কাঠামোর মূলে আঘাত হেনেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জেলা রাজশাহীর গ্রামগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পরিবারের ধরণ ও তাদের আর্থিক অবস্থা, মানুষের পেশা, হাট বাজারের অবস্থা, আর্থিক লেনদেন, ঋণপ্রথা, চাষাবাদ পদ্ধতি, রাস্তাঘাটের অবস্থা, যাতায়াতের মাধ্যম ইত্যাদির একটি সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ঐতিহ্যবাহীন গ্রাম সংগঠনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজশাহী জেলার গ্রামীণ জীবনের সার্বিক পরিবর্তনের গতিধারা উঠে এসেছে।

অতীতকালে আলোচনাধীন রাজশাহী অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রাম সম্প্রদায়ের ন্যায় নিজেদের জীবন ব্যবস্থা নিয়তির উপর নির্ভরশীল বলেই মনে করতো। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘদিন টিকে ছিল। কিন্তু গত কয়েকদশকে আধুনিক উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শহুরে সুযোগ-সুবিধা প্রচলনের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিবর্তিত হয়েছে। মান্ধাতার আমলের কৃষির স্থলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন, যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ঋণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, পণ্য পরিবহনের অবাধ সুযোগ মানুষের জীবনকে সহজ করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় নদীপথে নৌকা আর স্থলপথে পশুচালিত শকট ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতো। ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে রাজশাহীতে গ্রামীণ জীবনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে । বর্তমানে রাজশাহী জেলার গ্রামগুলোতে খারাপ রাস্তা নেই বললেই চলে এবং অধিকাংশ রাস্তাই পাকা। এখানে মোটরচালিত যানবাহন চলাচল করতেই বেশি দেখা যায়। এই পরিবর্তন মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার করেছে।

অর্থনেতিক সচ্ছলতা শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে, যা পেশা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। অনেকে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। রাজশাহীর গ্রামগুলোতে অধিকহারে পাকা ও স্থায়ী দোকানপাট গড়ে উঠেছে। স্বল্প শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা

এর উদ্যোক্তা। গ্রামের মানুষেরা আগের চেয়ে বেশ আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশই গতানুগতিক আর্থিক লেনদেন থেকে সরে এসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হচ্ছেন। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁরা মহাজনপ্রথা থেকে সরে এসে ব্যাংক ও এনজিওমুখী হচ্ছেন। চাষাবাদ ব্যবস্থায় ভাগচাষের প্রচলন অনেকাংশে কমে এসেছে। এলাকাটি অনেক আগে থেকেই বিদ্যুতায়িত এবং এখানে সৌরবিদ্যুৎও এসে গেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থাকে সহজ করে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিয়ে-সাদিসহ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে শহুরে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রামের কিছু মানুষ ইদানীং কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করছে, যা এক সময় একদমই প্রচলিত ছিল না।

রাজশাহী জেলার গ্রামীণ জীবনে বেশকিছু নেতিবাচক পরিবর্তনও লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন, এখানকার পরিবারসমূহের ধরন বদলে যাচ্ছে তথা পরিবারগুলোর আকার ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। যৌথজীবন ব্যবস্থা এখন খুব একটা নেই। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। খেলাধুলার আয়োজন অনেকটা সমুন্নত থাকলেও এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বাউল গান, মাদারী গান, কবিগান, গম্ভীরা গান কিংবা যাত্রাপালার আয়োজন পূর্বের চাইতে ব্যাপকহারে হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রভাব মানুষের মনস্তত্বকে পরিবর্তন করেছে। মানুষ জীবনঘনিষ্ট সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে বেরিয়ে শুধু অর্থের পেছনে ছুটছে। গ্রামের মানুষ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিচর্চা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে রাজশাহীর গ্রামীণ জনপদে ইসলামি জলসার আয়োজন দিনদিন বেড়ে চলছে। আবার, সুদের ব্যাবসা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মত ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন এখনও এই অঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় যেকোনো অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে, এটি সুষ্ঠু, সাবলীল ও কল্যাণমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতি পরিবর্তনের ধারা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছে। এক সময় গ্রামের মানুষ আশঙ্কা করেছিল গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হলে হাল চাষের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হবে। মানুষের মধ্যে চাতুরি বুদ্ধি প্রবেশ করবে। এদের কূটবুদ্ধির কারণে গ্রামের শান্তি নষ্ট হবে। সেই আশঙ্কা কতটুকু সত্য হয়েছে তা বিচার্য বিষয়, তবে গ্রামের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার স্থলে আত্মকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই যায়। পরিশেষে বলা যায়, রাজশাহীর গ্রামগুলোতে অর্থনৈতিক জীবন অনেক সমৃদ্ধশালী হয়েছে। মানুষের জীবন অনেক সহজ ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে। আধুনিক জীবনের অনেক উপকরণ গ্রামের মানুষের নাগালের মধ্যে। এটি মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনেরই একটি সাধারণ চিত্র বলা যেতে পারে।

টীকা

১. বিভিন্ন সময়ে রাজশাহীর আয়তন ও সীমায় পরিবর্তন এসেছে। বাংলা বিভাগের সময় পূর্ববাংলায় যে ১৭টি জেলা ছিল রাজশাহী তার অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে মোটি ৬৪টি জেলা রয়েছে। আমাদের গবেষণাটি বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনিক জেলা রাজশাহীর আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

২. Final Report on the Survey and settlement operations in the district of Rajshahi 1912-1922, Bengal secretariat Book Depot, Calcutta, 1923, p. 22

Statistical Digest of East Pakistan, (1968) No.5, Dhaka, December 1968, p. 28

৩. In the Interior of the district the villagers live an easy life and contented life. The villages are almost independent of the outside world. The cultivators goes twice a week to a market to bring salt, oil and vegetables, perhaps cloth. He never sees a stranger with ideas or manners different from his own. His Ideas are purely domestic. He is hospitable and superstitious. He has no idea of any sort of public life. .. There is a little demand for education. The cultivator does not see the use of it. Being conservative he discourages it because education makes a man despise plough. He wants to become a clark and often become a tout and a source of trouble in the village. See Final Report on the Survey and settlement operations in the district of Rajshahi 1912-1922, Bengal secretariat Book Depot, Calcutta, 1923, p. 24

Statistical Digest of East Pakistan, No.5, 1968, Dhaka, December 1968, p. 31-31

৪. এলফিনস্টোন বাংলার গ্রামীন বাড়ি-ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন- The cottage of Bengal, with its trim covered thatched roof and cane walls, is the best looking in India. দেখুন- Mountstuart Elphinstone, The History of India, Volume I, 1841, P. 326

৫. Bangladesh Population Census 1981, District Tables, Rajshahi Division, August 1983, P. 6

৬. উইলিয়াম কেরি মি. ফুলারকে লেখা চিঠিতে বাংলার ঘর-গৃহস্থালীর বর্ণনা দিয়েছে এভাবে- গ্রামের সাধারণ মানুষের বাড়ি সাধারণত একটি আঙিনা বা উঠানের চারিদিকে রচিত হয় উঠানটি মাঝখানে এবং সব বাড়ির দরজাই উঠানের দিকে খোলা। এই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি অন্দরমহল, সেখানে বাড়ির গৃহিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্ত্রীে লাকের বাস করেন। একটি বাড়ি রন্ধনশালা, রান্না ও আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত হয়। অপটরটি গোশালা, গৃহপালিত জন্তু ও তাদেও খাদ্যাদি সেখানে থাকে। বাহির মহল সাধারণত ভৃত্যাদি এবং পুরুষ অতিথি অভ্যাগতদেও জন্য নির্দিষ্ট থাকে। অধিকাংশ বাড়িরই বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি। ঘরের খুঁটিগুলো বাঁশের এবং ছাদের দাঁড়াটিও একটি লম্বা বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়। ঘরের চাল খড় দিয়ে সুন্দর করে ছাওয়া হয়। ঘর তৈরি কাজে সুতলি-দড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘরের দেওয়াল সাধারণত মাটির।, কখনো কখনো দরমা বা চাটাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘরের ে মঝে ও দেওয়াল গোবর দিয়ে পরিপাটি লেপা হয়, তাতে ঘর খুব পরিস্কার থাকে। ঘরের বিছানা বলতে একখন্ড কাপড় (চাদর) আর একটি তুলোর বালিশ। কেউ কেউ সুতলি-দড়ি দিয়ে বাঁশের খাটিচয়া তৈরি করে নেন। রান্নাবান্না মাটির হাঁড়িতেই হয়ে থাকে। ... আহারে পাত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলাপাতা বা পদ্মপাতা ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের সমস্ত ব্যবহারেরই পদ্মপাতার বহুল প্রচলন। দেখুন- ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরির চিঠিপত্রে বাংলার গ্রাম (১৭৯৩-১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ,*বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গ্রাম*, (ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত) উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ৮-৯

৭. (In India) the great majority of the population is agricultural. The peasants live assembled in villages; going out to their fields to labour, and returning, with their cattle, to the village at night. Mountstuart Elphinstone The History of India, Volume I, 1841, P. 326

মো. আবদুর রহিম, (২০২২) *পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

৮. Report on the Rural Credit and Rural Unemployment in Pakistan, 1956, Dhaka University Socio-Economic Survey Board, Dhaka, 1956, p. 57

উল্লেখপঞ্জি

জাহিদুর রহমান, (১৯৯৫) *বাংলাদেশের পেশাজীবী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কমল চৌধুরী, (২০০৭) (সংকলন ও সম্পাদনা), রাজসাহীর ইতিহাস, *রাজশসাহীর প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকাঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম[*]

Abstract : On February 10, 1972, Japan became the 28th country to recognise Bangladesh as an independent sovereign state. Bangladesh and Japan have had mutually friendly and diplomatic relations for over fifty years, and Japan-Bangladesh relations is a model example of economic and technical assistance in development partnership. After independence, Japan provided the most assistance to Bangladesh's socio-economic, infrastructural, and technical development projects. It should be noted that since the beginning of Bangladesh's independence, Japan has provided a maximum of 260 quintillion 87 trillion 591 million Japanese yen in various sectors. Japan is one of the crucial partners in the social development of Bangladesh. In the last five decades, Japan has provided a large amount of financial assistance in urban and rural development, health care, and maternal and child health, among many others. Japan has always been and continues to be in the first place as a development partner and donor nation. Japan has been providing easy terms and low-interest loans for the overall development of Bangladesh, especially in education, electricity, road and communication, and information technology. Bangladesh has received about 3.3 billion US dollars in official development assistance from Japan for seven major projects, which will play a direct role in Bangladesh's socio-economic, infrastructural, and sustainable development. February 10, 2022, marks 50 years of diplomatic relations between the two countries. The main objective of this study is to evaluate Japan's role in Bangladesh's socio-economic development in the last 50 years, review the barriers, and discuss the ways to overcome the obstacles in Japan's assistance in sustainable development.

১. ভূমিকা

গত দশ বছরে বাংলাদেশের যে অবিশ্বাস্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে তা আর্ন্তজাতিক মহলে একটি উন্নয়নের অলৌকিক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বিগত পাঁচ দশকের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন থেকে বলা যায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাপানসহ দাতা দেশগুলোর সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অনেক বাধা অতিক্রম করে বিস্ময়কর উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) পর্যায় থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের সারিতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ উন্নয়নের ধারা অনুন্নত দেশের জন্য

[*] সহযোগী অধ্যাপক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা খাতে বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পেছনে জাপানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতার একটি শক্তিশালী বন্ধন দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল জাপান। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই জাপান বাংলাদেশের জন্য 'একক বৃহত্তম দাতা' হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন খাতে ঋণ, অনুদান এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সফর দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী ইতিবাচক সংযোগ স্থাপন করে। এই সফরের মাধ্যমে ঋণ, অনুদান, কারিগরি সহায়তা, বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নানা খাতে জাপান কার্যকর ভূমিকা পালন করার আশ্বাস দেয়। ১৯৭২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর আমরা জাপানের সেই আশ্বাসেরই বাস্তবায়ন দেখতে পাই। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সুর্বণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর উভয় দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশে জাপানের অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যাপকতা সত্ত্বেও, জাপানের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে পরবর্তী অংশ নগণ্য। জাপানের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর্থ-সামাজিক থেকে শুরু করে দুই দেশের মানুষে মানুষে সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এসইজেড) বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা, ভ্যাকসিনসহ উৎপাদনে সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে একে অপরকে সমর্থন করার মাধ্যমে সম্পর্কটিকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা পর্যালোচনা ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ উত্তরণের পথ আলোচনা করা।

২. গবেষণার পটভূমি

জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন অংশীদারিত্বে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার একটি আদর্শ উদাহরণ। বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের সিংহভাগ এসেছে রাসায়নিক খাতে (৫৭%), টেক্সটাইল খাতে (১৬%), ধাতু পণ্য খাতে (১৩%), বৈদ্যুতিক খাতে (১১%) এবং অন্যান্য (৩%)। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য হওয়ার ফলে রাসায়নিক সার তৈরি সহজতর হয়েছে, যা বাংলাদেশের কৃষিখাতে অতুলনীয় অবদান রেখেছে (Majid, 2022)। জাপানের জন্য বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত হলে তা উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে। তুলনামূলক প্রতিযোগী বাজার অর্থনীতি ও দ্রুত বর্ধনশীল বেসরকারি খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্থিতিশীল করবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। যা জাপানের ব্যাবসা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রসারকেও গতিময় করবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বাজারের সম্প্রসারণ একদিকে জাপানি পণ্যের সুযোগকে প্রসারিত করবে, অন্যদিকে বাংলাদেশি জনগণের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ

সৃষ্টির পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। এর ফলে, দেশের সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। জাপানের অর্থনৈতিক সহায়তায় বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল দেশ হিসেবে গড়ে উঠলে তা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তিতে অত্যন্ত ইতিবাচক অবদান রাখবে। এর ফলে জাপানের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত ও মানবিক সহায়তা উভয় দেশের জন্যই ইতিবাচক হবে। মুক্ত বাণিজ্য ও বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জাপানের মতো একটি উন্নত দেশ এবং বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশের প্রতি জাপানের সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রদানের ধরন ও পদ্ধতি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভিন্ন। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাদেশে ওডিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'ফলাফলভিত্তিক শর্তাবলী' মডেল ব্যবহার করে। জাইকা শুধু প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার পরে এবং কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারলে অর্থ সহায়তা প্রদান করে। উন্নয়ন সহায়তা তহবিল বিতরণ এবং তাদের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহারের দিকে নজর রেখে সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি অনুসরণ করে জাপান। তবে বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদানে জাপানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য স্বার্থ উভয় দেশের জন্য পারস্পরিকভাবে লাভজনক (Moni, 2006b)। বাংলাদেশ যদি একটি অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি করে এবং তা ধরে রাখতে পারে, তবে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের পথ আরও প্রশস্ত এবং কার্যকর হবে। আর উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে পারলে বিশ্বের অন্যান্য দেশও বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শুধু ওডিএ নয়, বরং জাপানের ব্যাবসায়ীদের বিনিয়োগ, বেসরকারি বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) এর বিপুল সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে (Naoki, 2022)। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাপান সরকারের প্রস্তাবিত বঙ্গোপসাগর শিল্প প্রবৃদ্ধি বলয় (বিগ-বি) পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিগ-বি'র উদ্যোগের লক্ষ্য হলো- ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকা এবং আসিয়ানে (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা) অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগের পরিবেশের উন্নতি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার সংযোগ বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া। বিগ-বি'র উদ্যোগে সহায়তার জন্য চট্টগ্রামের মাতারবাড়িতে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া জাপানের সহায়তায় এবং বিগ-বি'র উদ্যোগে সুনীল অর্থনীতি (Blue economy), আঞ্চলিক শান্তি স্থিতিশীলতা ও সমুদ্র নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রকে ত্বরান্বিত করবে।

অন্যদিকে, চীন ও অন্যান্য আসিয়ান দেশগুলোতে শ্রমবাজারের মূল্য বৃদ্ধি এবং মার্কিন-চীন বাণিজ্য প্রতিযোগিতার কারণে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমানভাবে জাপানের এফডিআই-এর একটি আকর্ষণীয় ও লাভজনক গন্তব্য হয়ে উঠছে। ২০১৮ সালে জাপান বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ ছিল। ২০২১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৩২১টি জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করছে।

সারণী ১: বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির সংখ্যা (২০০৫-২০২০) তথ্যসূত্র: Alam (2022a)।

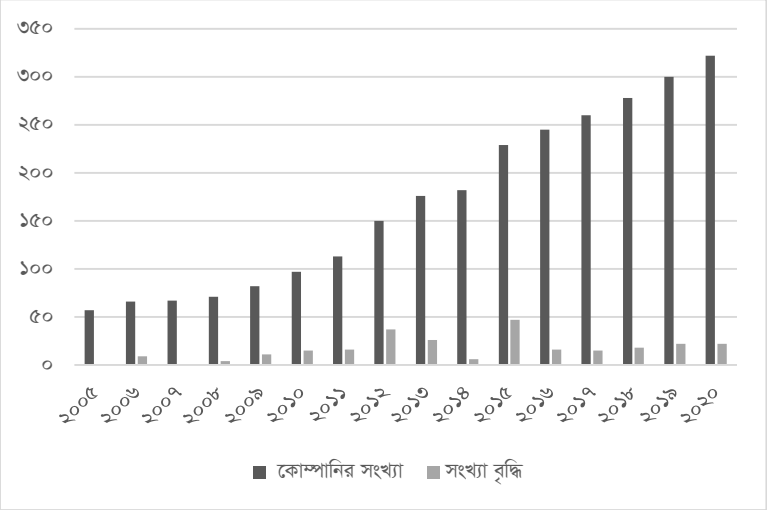

বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগের আগ্রহের কারণে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অবস্থিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটিতে জাপান এক বিলিয়ন ইউএস ডলারের বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে প্রায় এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ সফলতার ভিত্তিতে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও কক্সবাজারের মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় আরও দুটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ চলছে (Raihan, 2021)। আর এই শিল্পাঞ্চল উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল হবে।

জাপানি এফডিআই-এর লভ্যাংশ বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন এবং ভিশন ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে। তবে জাপানের এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো)-এর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাপানি কোম্পানিগুলি বাংলাদেশে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সমুদ্র ও বিমানবন্দর ছাড়পত্রে বিলম্ব, অদক্ষ মানবসম্পদ, ট্যাক্স সংক্রান্ত সমস্যা ও অর্থ প্রত্যাবাসন এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এর মধ্যে অন্যতম। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারকে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সক্ষমতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৩. কেন বাংলাদেশ ও জাপানের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ

দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালে জাপানের স্বপক্ষে বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের (১৮৮৬-১৯৬৭) অবদান। বিচারপতি পাল ১৩ জন বিচারকের মধ্যে একমাত্র যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট, বা টোকিও ট্রায়ালে জাপানের

শীর্ষ যুদ্ধকালীন নেতাদের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন (Cooray et al., 2005)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার মিরপুরে জন্ম নিয়েছিলেন প্রাজ্ঞ আইনজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল। আন্তর্জাতিক আদালতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগসূত্র ছিল, খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত টোকিও ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে তাঁর ভিন্নমতের রায় বিশ্বসমাজকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর দেওয়া ১২৩৫ পৃষ্ঠার রায়ে পরাজিত জাপানিদের স্বস্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং জাপানিদের প্রতি বাঙালিদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সহানুভূতি তৈরি করে। সেই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে জাপানের জনগণের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন অসামান্য শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসা-কৃতজ্ঞতা। তাঁর সেই অবদানের পরিপেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে জাপানের সম্রাট বিচারপতি পালকে প্রথম শ্রেণির অর্ডার অফ দ্য সেক্রেড ট্রেজার (জাপান সম্রাট প্রদত্ত সর্বাধিক প্রশংসিত জাপানি আদেশ যা বিশিষ্টজনদের প্রদান করা হয়) প্রদান করেন। পালের মৃত্যুর পর জাপানের ইয়াসুকুনি মন্দিরে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় বিজয় জাপানের জনগণের কাছে বাংলাদেশের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরে। এর ফলে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর সাধারণ জনগণের পাশাপাশি জাপানের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের দিকে সহায়তার হাত প্রসারিত করেন। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় জাপানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলায় যাদের অবদান ছিল, তাদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী তাকাশি হায়াকাওয়া, অধ্যাপক সুইয়োশি নারার মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন। এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময় নানা ঘটনা প্রবাহ জাপানের জনগণের কাছে বাংলাদেশকে এক অনন্য বন্ধুর আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীকালে বাণিজ্য, বিভিন্ন সহনশীল নীতির প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে (Moni, 2006a)।

জাপানের প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি বাণিজ্যিক আদান প্রদানের মাধ্যম হলো বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর। বলা যায়, এটিই জাপানের বাণিজ্যের উন্নতির অন্যতম প্রধান লাইফলাইন। ভারত মহাসাগরে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি জাপানের এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে। জাপানের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ শুধু উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবেই নয় বরং ভূরাজনৈতিক অবস্থান এবং ভারত মহাসাগরে প্রবেশের সরাসরি সুবিধার জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, জাপানের সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্ক বাংলাদেশকে সফলভাবে 'লুক ইস্ট নীতি' ব্যাবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ভূরাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস বাস্তবায়নে সহায়তা করছে (Naidu, 2004)।

দক্ষিণ এশিয়ায়, জাপানের কৌশলগত কূটনৈতিক এজেন্ডায় বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুক্তবাজার ও বাণিজ্যমুখী অর্থনীতির একটি দেশ। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের সবচেয়ে সম্ভাব্য লাভজনক বাজার হিসেবে বিকশিত হচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত, উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সুলভ শ্রম এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুত গতিসহ ১৭ কোটি গ্রাহকের বাজার বাংলাদেশকে কৌশলগত কারণে জাপান বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।

এছাড়া জাপানের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর্থ-সামাজিক থেকে শুরু করে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এসইজেড) বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে একে অপরকে সমর্থন করার মাধ্যমে সম্পর্কটিকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিশেষ বাণিজ্যিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের বাণিজ্য সম্প্রসারণ বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরও প্রসারিত করবে। যার ফলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে জাপান তার কৌশলগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এজন্যই জাপানের অর্থায়নে আড়াইহাজারে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এছাড়া মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। জাপানের এই বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ আঞ্চলিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সাথে জাপানের দীর্ঘ ৫০ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। আরও উল্লেখ্য হলো, বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের উপায় ও সুনির্দিষ্ট নীতির সুপারিশ যা উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত করতে সহায়তা করবে। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

(ক) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকার পর্যালোচনা করা;

(খ) বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাপানের সহায়তা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ বিশ্লেষণ করা;

(গ) বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে জাপানের সহায়তার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ উত্তরণের উপায় আলোচনা করা।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু এ গবেষণা পদ্ধতি কোনো সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক পদ্ধতিতে হয় না এবং গবেষক ও তথ্য প্রদানকারী তাদের নিজস্ব মত এবং তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তাই গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ঘটনাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণার বিষয়বস্তু মৌলিক উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি তথ্য প্রদানকারীদের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অবস্থার পটভূমি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ পদ্ধতি উপযোগী বলেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুগভীর অর্ধ-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত পত্রিকা, বই ও প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যেসকল গবেষণামূলক প্রবন্ধে উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে ও উভয় দেশের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশে

জাপানের আর্থিক সহায়তা নিয়ে সরাসরি কাজ করেছেন, জাপান ও বাংলাদেশের এমন ১৫ জন বিশেষজ্ঞকে তাত্ত্বিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই গবেষণার আওতায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

তথ্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং উপাত্তকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা শিরোনামের মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করে সারসংক্ষেপ (কোডিং) প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফল প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ফল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী এ গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার জন্য সাম্প্রতিক জরিপ, গবেষণা রিপোর্ট, দেশি-বিদেশি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম, আর্ন্তজাতিক গবেষণা পত্রিকা, নির্ভরযোগ্য অনলাইনে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবর, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা, নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বিবিধ তথ্য-উপাত্তের যা কিছু প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে।

সারণী ২: তথ্য সংগ্রহের বিবরণ

স্বাক্ষাৎকার দাতা	নমুনা	নারী	পুরুষ
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	৫	১	৪
দেশি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তি	৫	০	৫
বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ	৫	১	৪
মোট	১৫	২	১৩

বিবিধ উৎস থেকে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক (secondary) তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এ গবেষণা প্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে এ নিবন্ধের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা, সহায়তা এবং সহায়তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা উঠে এসেছে। এ গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন: ক্ষেত্র বিশেষে ছদ্মনাম ব্যবহার করা, সাক্ষাৎকারের আগে অনুমতি গ্রহণ করা, সাক্ষাৎকার দাতার পরিচয় গোপন রাখা, তথ্যের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

৬. গবেষণা-ফল

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ বিভিন্ন খাতে জাপান বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে সাহায্য করে আসছে। জাইকার দেওয়া তথ্যমতে, জাপানি অর্থবছর ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ওডিএ লোন দেওয়া হয়েছে ৪১৩ কোটি টাকা (Alam, 2022b)। এছাড়াও বিভিন্ন

প্রকল্পে জাপানের আরও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো দক্ষিণ এশিয়ারও আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জাপান। এ অঞ্চলে প্রচুর উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বিনিয়োগ করবে দেশটি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই জাপানের উন্নয়ন সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে। বাংলাদেশও দীর্ঘদিনের বন্ধুপ্রতীম দেশ জাপানকে দেখছে নিজেদের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে। আনুষ্ঠানিক সরকারি উন্নয়ন সহযোগিতা (ওডিএ) কর্মসূচির আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন সহযোগিতা দিয়ে আসছে জাপান। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশে জাপানের মোট সহযোগিতার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৪২৫ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ২৬৩ কোটি ডলারের বেশি অর্থ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান (Embassy of Japan in Bangladesh, 2022)। এসব বিনিয়োগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণী ৩: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে জাপানের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ

প্রকল্পের নাম	**প্রকল্পের খাত**	**পরিমাণ (মিলিয়নঃ জাপানিজ ইয়েন)**
কোভিড-১৯ ক্রাইসিস রেসপন্স ইমার্জেন্সি সাপোর্ট লোন	পণ্য ঋণ	৪০,০০০
ঢাকা গণ র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প	পরিবহন	১,১৫,০২৭
মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প	বৈদ্যুতিক শক্তি এবং গ্যাস	১,৩৭,২৫২
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প	পরিবহন	৮০,০০০
মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	পরিবহন	৩৮,৮৬৬
কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প	সামাজিক পরিষেবা	৩৪,৮৪৭
টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প	টেলিযোগাযোগ	৩,৪২০

তথ্যসূত্র: Embassy of Japan in Bangladesh (2022)

জাপানের এসব বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, লোন ইত্যাদি বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে এই অবদান লক্ষণীয়। এ গবেষণায় তাত্ত্বিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন খাত অনুসারে ফল সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৬.১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা

বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে উন্নয়ন একটি বিস্তৃত ধারণা। অনেকে উন্নয়ন বলতে শুধু ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নকে বুঝে থাকেন, কিন্তু উন্নয়ন বলতে জাইকা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝিয়ে থাকে। জাইকা মূলত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু জাপান

কোনো দেশ বা সমাজকে নিজ থেকে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে সহায়তা করে না। যদিও জাপানের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের অফুরন্ত শক্তি রয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের তেমন কোনো শক্তি নেই। এই শক্তিহীনতা বাংলাদেশকে অন্য দেশের প্রতি পরনির্ভশীল করে তুলছে। সেজন্য বাংলাদেশকে অন্য দেশের পরিকল্পনা ও প্রযৌক্তিক সহায়তা নিয়ে ভৌত অবকাঠামো গড়তে হচ্ছে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ হলো দেশের, কিন্তু পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি হচ্ছে বিদেশের। এই নীতিতে বাংলাদেশের ভৌত অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠছে। এই অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সুবাদে জাপানের সহায়তার নির্মিত ভৌত কাঠামো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন হলো একটি সমাজের সার্বিক উন্নয়ন। এই সার্বিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞানীয়, ভাষিক ও প্রাযুক্তিক উন্নয়ন। অর্থনীতির ভাষায় এই উন্নয়নকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

জাপানের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সহায়তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে, জাপানি খাদ্য ও পণ্য সহায়তা দেশের খাদ্য ঘাটতি কমাতে এবং প্রয়োজনীয় আমদানিতে অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও খাদ্য ভারসাম্য সংকট মেটাতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশকে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া শুরু করে জাপান। ১৯৮০ সালের মধ্যে জাপান বাংলাদেশের 'একক বৃহত্তম দাতা' দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনা হতে এখন পর্যন্ত জাপান বিভিন্ন খাতে প্রায় ২৬,৮৭,৫৯১ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে' একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্প, টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ দৃশ্যমান। জাপানের এসব বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমাগতভাবে উন্নত করতে সাহায্য করেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আরও একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, 'জাপানের এই আর্থিক উন্নয়নের সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অবস্থান করবে। 'রূপকল্প ২০৪১' অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে' বলে অনুমান করেন একজন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ উত্তরদাতা। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন-যাত্রায় জাপান তার আর্থিক সহায়তার মাত্রা বৃদ্ধি করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। জাপান 'অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক (এফওআইপি)' বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশকে সব বাস্তবিক সহযোগিতা দেবে, যেন এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এই সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন অবকাঠামো, সংযোগ ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন (Naoki, 2022)। এই ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে অবাধ ও উন্মুক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ফলে ভবিষ্যতে জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক সুগভীর হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

৬.২ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা

জাপান বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার এবং সহায়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কারণ জাপান বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সামাজিক সেবা জাপানের অন্যতম একটি গুণ, যা তাকে অন্যান্য দেশের চেয়ে অনন্য করে তুলেছে। জাপানের বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকে সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবা খাতে। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নেও জাপান এক অন্যতম অংশীদার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি কীভাবে তা সামাজিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশে জাপানের সামাজিক উন্নয়ন খাতের সহায়তা। শহর ও গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে জাপান প্রচুর পরিমাণ অর্থ সহায়তা করেছে বিগত পাঁচ দশকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে সামাজিক উন্নয়নে কয়েকটি প্রকল্প ও তার বরাদ্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে জাপান।

সারণী ৪: বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে জাপানের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ

প্রকল্পের নাম	**পরিমাণ (মিলিয়নঃ জাপানিজ ইয়েন)**
নগর উন্নয়ন ও শহর শাসন প্রকল্প	২৮,২১৭
স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৬,৫৫৯
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বর্ধিতকরণ প্রকল্প	১৬,৯৯৬
মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি প্রকল্প	১৭,৫২০
উপজেলা শাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প	১৪,৭২৫
ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট	৩০,৬৯০
কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৭,০৭১

তথ্যসূত্রঃ JICA (2016)

জাপান সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন জাপানি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের জন্য সহায়তা, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার কারণে জাপান ও জাপানের নাগরিকেরা বাংলাদেশের জনগণের কাছে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তি অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক অংশীদারিত্ব থেকে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করতে সহায়তা করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের কৌশলগত-কূটনৈতিক এজেন্ডায় বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুক্তবাজার, বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি এবং ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে

সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লাভজনক বাজার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। জাপান বাংলাদেশকে একটি সামাজিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অবদান রাখছে।

৬.৩ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা

সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) অধীনে অর্জিত আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-সম্প্রদায়ের দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিশ্বচিন্তার পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলসহ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে তা বিভিন্ন সূচকে তুলনামূলক শক্ত অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা পেয়ে আসছে, যার মধ্যে জাপান অন্যতম প্রধান দেশ। টেকসই উন্নয়নের জন্য জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন বিনিয়োগ, ঋণ, এফডিআই ইত্যাদি প্রদান করে আসছে। যাতায়াত, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সমাজসেবা, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে জাপান আরো আগে থেকেই বাংলাদেশকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতেও সেসব সহায়তা বজায় থাকবে। যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে সহায়ক হবে।

৬.৩.১ শিক্ষাখাতে জাপানের ভূমিকা

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করেছে। 'জাপানিজ গ্রান্ট এইড ফর দ্য ফোর্থ প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি)' হলো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একক জাতীয় উন্নয়ন কৌশলগত পরিকল্পনা যা বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রেখেছে। সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (SWAPs) এর অধীনে ২০১১ সাল থেকে জাপান অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় পিইডিপি-কে সমর্থন করে আসছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই কোটি শিক্ষার্থীর কাছে পরিমার্জিত পাঠপুস্তক বিতরণ, প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, ২৫ হাজারেরও বেশি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ প্রভৃতি। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাপান বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করে আসছে যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষানীতি উন্নতিকরণ, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন, স্কুল ব্যবস্থাপনাকে উন্নতিকরণ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উন্নতির পাশাপাশি এই অর্থায়ন সহায়তার সমন্বয়ে শিক্ষার উন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ। সেই ধারায় পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০২১ সালে জাপান বাংলাদেশকে ৫০ কোটি জাপানিজ ইয়েন সহায়তা প্রদান করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, একক দাতা রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের এই অবদান বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৬.৩.২ বিদ্যুৎ খাতে জাপানের ভূমিকা

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যা পরিশেষে রূপকল্প ২০৪১ এর ৬০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ খাতের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাপান বাংলাদেশকে

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করছে। এর মধ্যে প্রধান প্রকল্প, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র ৬০০০ মেগাওয়াট-এর প্রকল্প জাইকার সহযোগিতায় অর্জন করা হবে। প্রকল্প সফল করতে ইতোমধ্যে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) জাইকা'র কাছ থেকে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার লোন সহায়তা নিয়েছে। এটি মূলত একটি সহজ শর্তে ঋণ, যার বাৎসরিক মুনাফা মাত্র ০.১%, সময়কাল ৩০ বছর এবং ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আর এ প্রকল্প সম্পন্ন হয়ে গেলে এই প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি কমবে এবং নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতাসহ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যা বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরিকরণে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে ধারণা করা যায়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কলকারখানার বিকল্প নেই এবং জাপানের সহায়তার ফলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের সমধিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

৬.৩.৩ সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়নে জাপানের অবদান

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে একটি সুপরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিকীকরণ করতে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাপানের সহায়তায় একটি ২০ বছরের কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা (এসটিপি) গ্রহণ করে। এসটিপি-এর অধীনে, তিনটি ভারী রেলভিত্তিক এমআরটি, হালকা রেলভিত্তিক এলআরটি এবং তিনটি বাস-ভিত্তিক বিআরটি রুটের সুপারিশ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ২০০৯-২০১০ সালে এসটিপি-তে একটি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করে যা 'ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট স্টাডি (DHUTS-১) নামে পরিচিত। এটি অগ্রাধিকার সড়ক ও যোগাযোগ প্রকল্প হিসেবে মেট্রো লাইন-৬-এর সুপারিশ করেছিল। জাইকা ২০১০-১১ সালে এমআরটি লাইন-৬-এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে। যা DHUTS-২ নামে পরিচিত। এমআরটি লাইন-৬ হলো বিশাল পরিবহন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সামগ্রিক গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (DMRTDP), এমআরটি লাইন-৬-এর আনুষ্ঠানিক নাম ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২-এ একনেক দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩-এ জাইকার সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার জাইকা থেকে ৪,৭৩,৭৫৭ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন-এর ঋণ নেওয়ার জন্য সম্মতি জানায়।

সারণী ৫: বাংলাদেশে সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপানের সহায়তা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	সময়	সহায়তার ধরন	সহায়তা (কোটি টাকায়)
প্রধান হাইওয়ে প্রকল্পে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ	২০১৬-২০২২	প্রযুক্তিগত	১৬৩০
মাতারবাড়ি বন্দর উনয়ন	২০১৮-২০২৬	ঋণ	১৭৭৭৫

ঢাকা গণ র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন (লাইন ১-৬)	২০১২-২০৩০	ঋণ	৩৯৭৮১
যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ	২০১৬-২০২৩	ঋণ	১৬৭৮১
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ	২০১৭-২০২৩	ঋণ	২১৩০০
কাঁচপুর মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ	২০১৬-২০২২	ঋণ	৩৭০০
ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট	২০১৬-২০২১	ঋণ	২৪৭৩
সেতু ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা উন্নয়ন	২০১৫-২০১৮	প্রযুক্তিগত	৮৩২৪
চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড	২০১০-২০২০	ঋণ	২৫০০
ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে উন্নয়ন	২০০৭-২০৩০	ঋণ	৯৬৭৫২

তথ্যসূত্র: জাইকা, ২০১৭

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রকল্পে জাপান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সড়ক ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের জন্য অবদান রেখেছে। জাপান বাংলাদেশের সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে যা এদেশের সার্বিক যোগাযোগ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ-জাপান যৌথ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্ল্যাটফর্মের চতুর্থ বৈঠকে পাঁচটি পরিবহন প্রকল্প বাস্তবায়নে পিপিপি'র মাধ্যমে ৭১ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মধ্য দিয়ে জাপান বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতকে উন্নত করার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ করে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকরি পন্থা হচ্ছে সরকার থেকে সরকারের (জিটুজি) মাধ্যম ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। পিপিপি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জাপানের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যা সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করবে। জাপান বাংলাদেশের একটি অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী এবং একসময় দ্বিপাক্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের একক বৃহত্তম সহযোগী রাষ্ট্র ছিল। এখনও জাপান বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম দাতা রাষ্ট্র হিসেবে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করছে। মাতারবাড়ি কয়লা ও সমুদ্র বন্দর প্রকল্প, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) এর দুটি রুট নির্মাণের ফলে জাপানের ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চলমান প্রকল্প সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত ও গতিশীল করবে এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করবে।

৬.৩.৪ তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে জাপানের অবস্থান

তথ্য ও প্রযুক্তির দিক থেকে জাপান পৃথিবীর অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র। নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে তার অবস্থান শীর্ষস্থানীয়। জাপান প্রযুক্তিগত উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নতিতে সহায়তা প্রদান করছে। যার ফলে উভয় দেশই সমানভাবে লাভবান হচ্ছে। জাপানেও বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্য-প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। জাপানে বাংলাদেশের বার্ষিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকার। গত কয়েক বছর ধরে জাপান বাংলাদেশের আইসিটি খাতের একক বৃহত্তম বাজার হিসেবে অবস্থান করে নিয়েছে। স্থানীয় কোম্পানিগুলো উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। উদ্যোক্তা এবং শিল্পের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাদের মতে— এই লভ্যাংশ এতটাই হতে পারে যে, তা সরকারের ২০২৩ সালের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার ৫ বিলিয়ন ডলারের সিংহভাগ অর্জনে সহায়তা করতে পারে। তদুপরি, বিশ্বব্যাপী করোনভাইরাস মহামারি জাপানের স্থানীয় সংস্থা, যারা চীন ছাড়া অন্য গন্তব্যে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা স্থানান্তর করতে আগ্রহী, তাদের জন্য সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। যদি স্থানীয় বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো সেই সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারে তবে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ জাপানের আইসিটি বাজারের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা যায় বলে ধারণ করেন একজন উত্তরদাতা। জাপান সরকার ইতোমধ্যেই তাদের কোম্পানিগুলোকে চীন থেকে অন্য গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য তারা ২.৪৩ বিলিয়ন ডলারের উদ্দীপনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। যদিও এখানে বাংলাদেশের ভাগ কম হতে পারে, তবে সুসম্পর্ক এবং দক্ষ জনশক্তি প্রদর্শন-পূর্বক এই বিনিয়োগের সংখ্যা আরও বাড়ানো সম্ভব।

বিভিন্ন দেশে স্মার্ট সিটি তৈরি অনেক আগে থেকেই অগ্রাধিকার পেয়েছে। বাংলাদেশ খুব শিগগিরই সে সকল দেশের তালিকায় যোগ দিতে পারে। তার আলোকে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাপান সরকারের প্রতিনিধিরা কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'জাপান বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অনেক ক্ষেত্রে অবদানের মধ্য দিয়ে একটি স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে। আইসিটি একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের ২০৪১ সালের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ করতে পারে' (Alam, 2022c)।

৭. আলোচনা

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চাপিয়ে দিয়ে ১৯০ বছর ধরে সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে (Ovi, 2022)। এরপর পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিম পাকিস্তানও পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ২৪ বছর। তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবহার হয়েছে এ অঞ্চলেরই লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়ে। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ (JICA, n.d.)। যুদ্ধে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনসংখ্যার চাপ,

সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা, অদক্ষ ও শিক্ষার নিম্নমান প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে বাংলাদেশ (Ovi, 2022)। সেসময় সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটির পাশে প্রকৃত বন্ধু হয়ে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে জাপান। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে শুরু হয় জাপানের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান (Hasan, 2022)। বর্তমানে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও কৌশলগত সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে (Atahar, 2014)। জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের শুরুতে কয়েকটি জাপানিজ কোম্পানি চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। বৃহৎ দুটি সার কারখানা এবং স্টিল মিলের গোড়াপত্তন করে জাপান বাংলাদেশে তার শিল্প কার্যক্রম শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে জাপানে একটি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফরে অংশগ্রহণ করেন (Chowdhury, 2008)। ১৯৭৪ সালে জাপান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মি. নাগানো শিজিওর নেতৃত্বে ২৪ জন শীর্ষ কর্মকর্তার একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন (Nath, 2019)। তাঁরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই, সিলেট, সিরাজগঞ্জ ও খুলনাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চল সফর করেন ও বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে বিগত ৫০ বছরে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নের পথকে সহজতর করেছে বলে মত দেন (Cooray et al., 2005)।

২০২২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাপান-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে এবং বাংলাদেশের দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের গন্তব্য এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী জাপানি কোম্পানির সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত একদশকে যা প্রায় পাঁচ গুণের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে (Hasan & Mohammad, 2019)। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিহাসে শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয় (Alam, 2022a)।

২০১৬ সালে গুলশানের সন্ত্রাসী হামলায় সাত জন জাপানি নাগরিক নিহত হন। তাদের মধ্যে ছয় জনই ছিলেন ঢাকার মেট্রো রেল প্রকল্পের পরামর্শক (BBC, 2016)। এ ঘটনার পর ধারণা করা হয়েছিল, জাপান বাংলাদেশ থেকে হয়ত তাদের সহায়তা কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে। অন্ততপক্ষে মেট্রো রেল প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়াবে (Islam, n.d.)। সন্ত্রাসী হামলার পরও জাপান সরকার তাদের সহযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়নি বরং কোভিড-১৯ মহামারি সত্ত্বেও জাপানের বিনিয়োগের পরিমাণ তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। জেট্রোর একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে ৬০ শতাংশেরও বেশি জাপানি কোম্পানি আগামী দুই বছরে বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার আগ্রহ পোষণ করেছে (Ahasan et al., 2020)। জাপানের এ সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি শিগগিরই ৩,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ২০৩০ সালে দেশটি বিশ্বের শীর্ষ ২৫টি অর্থনীতির তালিকায় যোগ দেবে এবং বাংলাদেশ ২১ শতকের উন্নতির রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে। জাইকা'র বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলি ২০১৪ সালের যৌথ বিবৃতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে (Rahman & Semul, 2020)। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে এবং আড়াইহাজারে বাংলাদেশে জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত হবে। এরপর যথাক্রমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর ও বঙ্গবন্ধু রেলসেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। যা আঞ্চলিক সহযোগীতা ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারত ও আসিয়ানের গতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলবে (Naoki, 2022)। এ উদ্যোগ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবে।

২০২২ সালের ২৮ জানুয়ারি জাপান সরকার ভাসান চরে 'রোহিঙ্গা' জনগণের মানবিক ও সুরক্ষার প্রয়োজনে ইউএনএইচসিআর এবং ডব্লিউএফপি'কে প্রথম দাতা রাষ্ট্র হিসেবে মোট ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (Channel I, 2022)। এ বিষয়ে জাপান ও বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে দ্রুত প্রত্যাবাসনের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে। এই অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির পথে 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক (এফওআইপি)' রূপকল্প বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে জাপান বাংলাদেশকে সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে এবং 'ভিশন ২০৪১' অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে (Milton, 2017)। বাংলাদেশের এ লক্ষ্য অর্জনের পথে জাপান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এটি সফল করার জন্য ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণ ও পরিবেশের উন্নতি অত্যাবশ্যক। এই উন্নতির জন্য বাংলাদেশকে সেবা সহজীকরণ করার জন্য এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে কাস্টম ক্লিয়ারেন্সে বিলম্ব, বিভিন্ন দ্বৈত কর, আমদানি অর্থ প্রদানের টেলিগ্রাফিক স্থানান্তরে সীমাবদ্ধতা, দেশি ও বিদেশি কোম্পানির মধ্যে রপ্তানি প্রণোদনার তারতম্য, ইপিজেড এবং এসইজেড-গুলিতে পরিবেশের উন্নতি ইত্যাদি। এরই সাথে বাংলাদেশকে নতুন উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাও করতে হবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে হবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন এবং দক্ষতার সাথে কর্মশক্তির বিকাশও নিশ্চিত করতে হবে। তরুণ ও মেধাবীদের উদ্ভাবনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জাপানের প্রসারিত এফডিআই সেই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠে অর্থনীতিকে সহজতর করতে সহায়তা করবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য উভয়ের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি লাভের জন্য এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে জাপান বাংলাদেশকে বিভিন্ন সহায়তা করে আসছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও জাপান ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কার্যকর এবং স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রেখেছে যা পারস্পরিক আস্থা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার জন্য সক্রিয়ভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে অটল (JICA, 2016)। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাপান বাংলাদেশকে সাহায্য সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের জন্য জাপানি

ওডিএ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন সহায়তা স্বনির্ভরতা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাকারী কম শর্তসাপেক্ষ এবং অধিকতর অনুকূল চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাপানের ওডিএ-এর পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে উন্নয়ন সহযোগিতায় জাপানের অবদান। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানকারী ২০টি প্রধান আন্তর্জাতিক দাতাদের মধ্যে জাপান আইডিএ (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা) এর পরেই রয়েছে, দ্বিপাক্ষিকভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র। ৫০ বছর ধরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগিতা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ জাপানের অনুদান সহায়তার জাপানের মোট বৈদেশিক অনুদান সহায়তার প্রায় ১০% প্রাপক হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে (Aso, 2006)। পরবর্তীকালে, দেশের অর্থ প্রদানের ভারসাম্য এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য কেনা, উৎপাদনশীল খাতে সহায়তা করার জন্য যন্ত্রপাতি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য আরও বেশি পণ্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এই পণ্য ঋণগুলি আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি করে এবং কিছু প্রকল্পের স্থানীয় খরচ মেটানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করেছিল। যা বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে জাপানের প্রদান করা কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতা টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। জাপানের এই ধরনের ঋণ সহায়তা বাংলাদেশকে ঋণের প্রতি নির্ভরশীল না করে বরং স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিভিন্ন সূচকেই তার স্বাক্ষর রেখেছে। জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা-জাইকা গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, পরিবহণ এবং বেসরকারি খাতে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পে অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশেষ করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উন্নত হয়েছে (Jain, 2000)। বর্তমানে জাপান বাংলাদেশি পণ্যের অন্যতম প্রধান গন্তব্য।

জাপান বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত হবে। জাপান মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে সহযোগিতা করছে (Aung, 2020)। স্নায়ুযুদ্ধের পরে বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে পরিবর্তন, বিশ্বায়নের উত্থান, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের প্রচার এবং অন্যান্য উন্নয়ন ইস্যুতে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বিশ্ব কোভিড মহামারির ক্রান্তিলগ্নে যে ধরনের সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তা থেকে উত্তরণের জন্যও প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত হবে।

৮. আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে বাধাসমূহ ও উত্তরণের উপায়

৮.১ সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ

সরকারি সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ উদ্যোগের কারণে সরকারি পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার সহজ করা হয়েছে, যার ফলে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সময়, খরচ এবং পরিদর্শনের সংখ্যা হ্রাস করা

সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এই মডেলটি জনগণের সময়, অর্থ এবং শ্রম সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নাগরিকদের কাছে জনসেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য তৈরি করেছে। এই মডেলটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে, যেন নাগরিকদের কাছে জনসেবা প্রদানের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতা এবং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সেবা প্রক্রিয়াগুলি সরলীকৃত করা এবং অ-মূল্য সংযোজন কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য এটি বেসরকারি খাতে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

৮.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নের দিকে অগ্রগতির জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে। রূপকল্প ২০৪১ দৃঢ়ভাবে বলে যে, সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গরাজ্য থেকে দুর্নীতির অভিশাপকে মোকাবিলা ও নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতি দমনে সামাজিক পরিবর্তনের কর্মসূচির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করতে বদ্ধপরিকর। সরকার একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ উন্নীত করার এবং সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান এবং সরকারের সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৮.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা

এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রযুক্তি এবং যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সুবিধা প্রদান করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এফডিআই প্রবাহের নির্ধারক বোঝা, তাই যোগাযোগ মাধ্যম উন্নতিতে আরও বেশি জাপানি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৮.৪ বিদেশি বিনিয়োগের বাধাসমূহ দূর করা

জাপানি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে কর্পোরেট গভর্নেন্সের অভাব সবচেয়ে বড় বাধা। দুর্বল কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং মানসম্পন্ন জনবলের অভাব বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আটকে রাখার দুটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। প্রকৃতপক্ষে, গত এক দশকে জাপানি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা দশ গুণ বেড়ে ৩২১-এ পৌঁছেছে। কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্সের ইস্যু যা স্থানীয় ফার্ম-গুলিতে অ্যাকাউন্টের বইয়ে স্বচ্ছতা আনার সাথে সবকিছুই জড়িত তা একটি বড় বাধা। এটি বিদেশি কোম্পানিগুলির জন্য একটি প্রধান সমস্যা এবং এটি শুধু বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষই সমাধান করতে পারে।

৮.৫ জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরীত করা

ভালো ফল নিশ্চিত করতে এবং অতিরিক্ত ব্যয় এড়াতে বাংলাদেশের উচিত সময়মতো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। যদিও উল্লেখযোগ্য সম্পদ বরাদ্দ করা হয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকল্পগুলি

দ্রুত বস্তবায়ন করা হয় এবং সময়মতো সম্পন্ন করা হয়, যেন মানুষ প্রকল্পের ফল থেকে দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে।

এই প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের জন্য জাপানের সম্পৃক্ততা হতে পারে সহায়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জাপান যেসব প্রকল্পে অর্থায়ন করছে তা বাংলাদেশকে তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ হবে। গতিশীলতা উন্নত করতে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য যৌথ কমিটি গঠন করা হয়।

৯. উপসংহার

বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম জাপানপন্থি দেশ, যেখানে ৭১ শতাংশ বাংলাদেশি জাপানের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ২০১৪ সালে, বাংলাদেশ জাপানের সুবিধার্থে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য পদের জন্য তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। নিঃসন্দেহে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য জাপান বাংলাদেশের সমর্থন লাভ করে। ফলে জাপান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে এবং বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে আটকে পড়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর নিরাপদ ও প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জাপান অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ভারত মহাসাগর জাপানের বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জাপানের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। এ কারণে জাপান বাংলাদেশকে লুক ইস্ট পলিসি, বিগ-বি প্রকল্প, ফ্রি এন্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক ইত্যাদি বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্পে সহায়তা ও সহযোগিতায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশ স্বভাবতই বিভিন্ন দেশের মতো জাপানের জন্যেও একটি আকর্ষণীয় বাণিজ্য বিনিয়োগের স্থান, ফলে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল বিনিয়োগের অঞ্চল হিসেবে সকল রাষ্ট্রের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে সম্পূর্ণরূপে এই সুবিধা ভোগ করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও অনুকূল করতে হবে। জাপান থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহযোগিতার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও জাপানিজ বিনিয়োগ পেতে পারে। অন্তত জাপানের ঋণ এবং ওডিএ-এর বণ্টন ব্যবস্থা তাই নির্দেশ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাপান বাংলাদেশের সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং তা অর্জনে এখনও কাজ করে যাচ্ছে। মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দর, মেট্রো রেল প্রকল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। আড়াইহাজারে স্পেশাল ইকোনোমিক জোনের নির্মাণ দেশের রপ্তানি খাতের উন্নতির মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং জাপান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বের ৫০ বছরে জাপানের কাছ থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, প্রণোদনা, সাহায্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে এ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হবে। পরিশেষে বলা যায়, সম্পর্কের ৫০ বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ ও জাপান আগামীতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক ব্যবসায়িক বিনিয়োগের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উভয় দেশের অংশীদারিত্বকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে যাবে।

উল্লেখপঞ্জি

Ahasan, R., Kabir, A., & Nirzhar, Y. R. (2020, November 5-8). *Forecasting the impact of metro rail implementation on mobility and accessibility: Case of Dhaka, Bangladesh* [Virtual conference session]. 2020 60th ACSP Annual Conference. https://www.acsp.org/page/ReportsResources

Alam, M. J. (2022a). *Bangladesh-Japan Diplomatic Relations (1972-2022): A New Paradigm of Strategic Partnership*. MuktoBuddhi Publishers. https:/doi.org/10.55156/9789843527455

Alam, M. J. (2022b). Japan's contribution to Bangladesh: Aspirations for inclusive development and regional cooperation, *Cogent Social Sciences, 8*(1), 2138150. https:/doi.org/10.1080/23311886.2022.2138150

Alam, M. J. (2022c). Japan's Foreign Policies in South and Southeast Asia under Chinese Influence: Significance of Bangladesh. *Journal of Japanese Studies: Exploring Multidisciplinarity, 1*(2). https://doi.org/10.55156/jjsem.Jul22.007

Aso, T. (2006, February 10). *Japan intends to prioritize development of the private sector [in Bangladesh], together with transportation and power* [Interview]. The Daily Star. http://archive.thedailystar.net/2006/02/10/d60210150198.htm

Atahar, S. A. (2014). An assessment of Japanese ODA to Bangladesh: Changing to a new height of relations. *South Asian Studies, 29*(1). http://journals.pu.edu.pk/journals/index.php/ IJSAS/article/view/2923/1162

Aung, A. (2020). The international politics of the Rohingya crisis in Myanmar: China, Japan, and the United States. *Kyoto Working Papers on Area Studies*, 134, 1-50. http://hdl.handle.net/2433/250135

BBC News Bengali. (2016, July 3). নিহত জাপানিরা ছিলেন মেট্রো রেল প্রকল্পের পরামর্শক [The slain Japanese were consultants for the Metro Rail project]. https://www.bbc.com/bengali/news/2016/07/160703_dhaka_attack_japanese_death

Channel I. (2022, January 28). ভাসানচরের রোহিঙ্গাদের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার দেবে জাপান [Japan will donate 2 million for Rohingya in Bhasan Char]. https://rb.gy/1jhjau

Chowdhury, M. H. (2008). Japan–Bangladesh Relations: A review of development partnership. *International Studies, 45*(1), 1-21. https://doi.org/10.1177/002088170804500101

Cooray, N. S., Gottschalk, R., & Shahiduzzaman, M. (2005). Will Japan increase aid and improve its allocation to help the poorer countries achieve the Millennium Development Goals? IDS Working Paper 243, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/3415

Embassy of Japan in Bangladesh. (2022). Japan and Bangladesh celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations. https://www.bd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_ 00488.html

Hasan, A. (2022, February 8). বাংলাদেশ-জাপানের বন্ধন আরও জোরদারের অঙ্গীকার [Commitment to further strengthen Bangladesh-Japan ties]. *Rising BD.* https://www.risingbd.com/national/news/445864

Hasan, M. K., & Mohammad, N. (2019, February). *An Outlook over Electrical Energy Generation and Mixing Policies of Bangladesh to achieve sustainable energy targets-vision 2041*. 2019 International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE) (pp. 1-5). IEEE. https://doi.org/10.1109/ECACE.2019.8679446

Islam, S. (Ed.) (n.d.). *Pal, Justice Radhabinod.* Banglapedia. https://en.banglapedia.org/index.php/Pal,_Justice_Radhabinod

Jain, P. (2000). Japan and South Asia: between cooperation and confrontation. In I. Takashi, & P. Jain (Eds.), *Japanese Foreign Policy Today* (pp. 266-282). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62529-1_15

JICA. (2016). *JICA's operation in Bangladesh.* https://www.jica.go.jp/ bangladesh/english /office/others/c8h0vm00009u4ya3-att/brochure.pdf

JICA. (2017, June 29). *The signing of Japanese ODA loan agreements with Bangladesh: Provision of Japanese ODA loans on the largest scale for accommodating an increase in demand for electric power and public transportation and for raising rural incomes.* https://www.jica.go.jp/english/news/press/2017/170629_02.html

JICA. (n.d.). *To make an educational system which utilizes Bangladeshi people's character to the maximum.* https://www.jica.go.jp/bangladesh/english/office/about/story_14.html

Majid, M. A. (2022, April 2). বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক: একটি উপরিদর্শন [Bangladesh-Japan Bilateral Relations: An Overview]. *Bonik Barta.* https://rb.gy/luamzd

Milton, A., Rahman, M., Hussain, S., Jindal, C., Choudhury, S., Akter, S., Ferdousi, S., Mouly, T., Hall, J. & Efird, J. (2017). Trapped in statelessness: Rohingya refugees in Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *14*(8), 942. https://doi.org/10.3390/ijerph14080942

Moni, M. H. (2006a). Japan–Bangladesh economic partnership: Focus on aid, trade and investments. *International Studies*, *43*(4), 395-410. https://doi.org/10.1177/002088170604300403

Moni, M. H. (2006b). Japan's ODA to Bangladesh: Lessons learned and strides forward. *Journal of International Development Studies*, *15*(1), 117-130. https://www.jstage.jst.go.jp/ article/jids/15/1/15_117/_pdf

Naidu, G. V. C. (2004). Whither the look east policy: India and Southeast Asia. *Strategic Analysis*, *28*(2), 331–346. https://doi.org/10.1080/09700160408450136

Naoki, I. (2022, February 10). বাংলাদেশের উন্নয়ন-যাত্রায় জাপান পাশে থাকবে [Japan will be by Bangladesh's side in the development journey]. *Prothom Alo.* https://rb.gy/pbedpu

Nath, S. (2019). *Japan's growing strategic footprint in South Asia.* The Diplomat. https://thediplomat.com/2019/01/japans-growing-strategic-footprint-in-south-asia/

Ovi, A. B. (2022, February 22). জাপান বাংলাদেশ সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও আস্থার [Japan-Bangladesh relations are friendly and trusting]. https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/editorial/239338

Rahman, A. K. M. A., & Semul, A. S. M. T. A. (2020). Changing balance of power in the Indo-Pacific region: Challenges for Bangladesh. In N. N. Pandey (Ed.), *Security and economic challenges in the Indo Pacific.* Consortium of South Asian Think Tanks (COSATT).

Raihan, Z. (2021, November 22). ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগে নজর, ২০২২ সালে উৎপাদনে যাবে জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল [Looking at the 1 billion investment, the Japanese economic zone will go into production in 2022]. *The Business Standard*. https://rb.gy/jaqvrh

পঞ্চসূত্রে *বিদেহ* : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আহমেদুল কবির*

Abstract : Each art form requires an aesthetic stratagem or 'technique' to materialise itself effectively. The theatre as an art form also employs techniques called the 'five fundamentals'. Alexander Dean and Laurence Carra discuss five techniques elaborately in the chapter 'The Five Fundamentals of Play Directing' in their book titled *Fundamentals of Play Directing.* A large number of theatre practitioners accept these 'five fundamentals' as effectual tools in theatre-making all over the world. The 'five fundamentals', according to Dean and Carra are (i) Composition, (ii) Picturization, (iii) Movement, (iv) Rhythm and (v) Pantomimic Dramatisation. This essay investigates to what extent these 'five fundamentals' have influenced Lucky Inam in her direction of the play Bideho. Furthermore, it examines the aesthetic principles Lucky Inam employs in her theatre-making using the theoretical frameworks of the 'five fundamentals'. Overall, this essay explores the idiosyncratic features of Lucky Inam's theatre direction and creative process, as well as the theoretical and practical aspects in the context of Bangladesh theatre.

লাকী ইনাম[১] নারী হিসেবে অবগুণ্ঠন ভেদ করে নিজের নাট্যালয়ে হয়েছেন উদ্‌ভাসিত। আমাদের নাটকে যে প্রধান প্রণোদনা 'মুক্তিযুদ্ধ' সেটিকেও উপজীব্য করে নির্মাণ করেছেন নাটক। মুক্তিযুদ্ধ, এতে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান, সর্বোপরি ললাটলিখন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্য-নির্মাণের শৈল্পিক যুদ্ধে ত্রয়ী সঙ্গমে তৈরি হয় লাকী ইনামের নান্দনিক ভুবনের জঙ্গমতা। নীলিমা ইব্রাহিম *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* লাকী ইনামের অভিনীত ও নির্দেশিত এককাভিনয় প্রসূত নাটক। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> স্বাধীনতা যুদ্ধে লাঞ্ছিত নারীদের বঙ্গবন্ধু মাতৃ সম্মানে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দিয়েছিলেন। জনকের সিদ্ধান্তে এ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এসব নারীদের অন্তর্জ্বালা চির প্রবহমান। এ জ্বালা ও অন্তর্দহন লাকী ইনাম নিজের মধ্যে ধারণ করে নির্মাণ করেন এ নাটক। (গোলাম শফিক, ২০১২ : ৭১)।

এই নাটক সম্পর্কে লাকী ইনাম বলেন :

> মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো নারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই আমি এই নাটকটির মঞ্চরূপ দিয়েছি। নতুন প্রজন্মের কাছে বীরাঙ্গনাদের অবস্থা উন্মোচন এবং পুরনো প্রজন্মের যারা বীরাঙ্গনাদের উপেক্ষা করে চলেন তাদের দৃষ্টি প্রসারের জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৭ এপ্রিল ২০১৬)।

* সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লাকী ইনামের খোঁড়াখুঁড়ি অব্যাহত আছেই। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন ইনামুল হক[২] রচিত নাটক *সেইসব দিনগুলো*। ইনামুল হক এ ডকুড্রামা রচনা করেন জীবন ঘেঁষে, নির্দেশক হিসেবে লাকী নির্মাণ করেন মনন ঘেঁষে। জীবন ও মননের মিথস্ক্রিয়ায় এটি হয়েছে অনবদ্য সৃষ্টি। সারাদেশ জুড়েই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন পরিবারে দেখা দিয়েছিল নানাবিধ সংকট, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বেরই সারাৎসার *সেইসব দিনগুলো*। নির্দেশনার প্রাসঙ্গিকতায় এই নাটকে তিনি ব্যবহার করেন মৌসুমী ভৌমিকের বিখ্যাত 'যশোর রোড' গান। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য :

> নাটকে এ ধরনের প্রাসঙ্গিক সংযোজন এতে নয়া দ্যোতনা দান করে। কলকাতার গঙ্গা-যমুনা উৎসবে এ নাটক প্রদর্শিত হলে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী প্রতিবেশি দেশের বোদ্ধা দর্শক আবেগ আপ্লুত হন। চাপা থাকে না এ হৃদয়গ্রহ। লাকী ইনাম নিজেও অবতীর্ণ হন অভিনেত্রীর ভূমিকায়। নির্দেশক লাকী ইনামের মুন্সিয়ানা এই যে, তাতে তাঁর নিজস্ব ভাবনা সংযোজিত হয়েছে। (গোলাম শফিক, ২০১২ : ৭৪)।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্য-নির্মাণের সর্বশেষ সংযোজন শাহমান মৈশান[৩]-এর *বিদেহ*। ত্রয়ী অভিনেত্রীর ত্রিবেণী সঙ্গমে নির্মিত হয়েছে এ নাটক। বেণীত্রয়– লাকী ইনাম, মোমেনা চৌধুরী ও জ্যোতি সিনহা। এটিও বীরাঙ্গনা কথন। স্বাধীনতার ৪০ বছর ও শিল্পের আলোয় মহান মুক্তিযুদ্ধের ছায়ায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয় এ নাটক। নাটকে নির্দেশক লাকী ইনাম মেধার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এই নাটকের নাট্যকার শাহমান মৈশান নাটকটি সম্পর্কে বলেন :

> ইতিহাসকে নাটকে মোকাবিলার ইতিহাস সামান্য নয়। শেকসপীয়রের উর্মিমুখর নাটকের দুনিয়া ইতিহাস-ফলনেই হয়েছে শস্যসঙ্কুল। বার্টল্ট ব্রেখটের মার্কসবাদী শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক খোয়াবনামা ইতিহাসের হাতিয়ারেই হয়েছে বিপ্লবতীর্থগামী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন ও মামুনুর রশীদের বহু নাটকের দেহমনে ঝংকৃত হচ্ছে বাংলার বঙ্কিম ইতিহাসের অনেক কলরোল। একজন লেখকের কাছে ইতিহাস সর্বদাই আকর্ষণীয় বীজভাণ্ডার। কেননা মানুষের আবহমান জীবন ইতিহাসের প্রবাহেই নির্মিত। তবে ইতিহাসের আশ্রয়ে কাহিনি কিংবা নাটকের জন্মবৃত্তান্ত রচনার ক্ষেত্রে লেখকের ফাঁদে নিপতিত হবার ভয়শঙ্কা কখনোই আত্মা ছেড়ে যায় না। ইতিহাসের অধিপতিশীল বয়ান কিন্তু অজ্ঞানসূত্রে লেখককে নসিহৎ করতে চায়, ডিকটেশন দিতে চায়। তবে সৃজনশীল লেখকমাত্রই ইতিহাসের ক্রীতদাস নয়। কাহিনির ভেতরে ইতিহাস পুনর্নির্মিত হয় ভাবাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডিসকোর্স নিপীড়িত বীরনারীর বয়ান কতটুকু হাজির আছে? প্রতাপশালী ডিসকোসর্কে তালাক দিয়ে দলিত নারীর দেহকেন্দ্রিক উৎসর্গের উচ্চারণকে আজকের দর্শকের ভাবনাসূত্রগুচ্ছ কোন প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত করবে–এই প্রশ্নের সুরাহার জন্য নাটক আমাদের জন্য খুব জরুরি এক আশ্রয়ী পাটাতন? ১৯৭১–এর লড়াকু ইতিহাসকে দলিত নারীর চোখ দিয়ে দেখার কিছু অভিমুখ, কিছু মনোভঙ্গির খোঁজ না ঘটাতে পারলে সময়ের মৌলবাদী-পুঁজিবাদী আঘাত মোকাবেলার রাজনৈতিক ভাষা হারিয়ে উপদ্রুত সময়ের করাল গ্রাসে আমরা লুপ্ত হয়ে যাব। এই শঙ্কাকুল প্রশ্নের সাথে-সাথে আরেকটি ইমিডিয়েট ভাবনা আমাদের মগজে ফরমান জারি করে। যেমন, ন্যাশনালিস্ট ও পোস্টন্যাশনালিস্ট ডিসর্কোসের প্রেক্ষাপট আমাদের আত্মপরিচয়কে, উত্তরাধিকারকে কোন অভিমুখে ভাসাবে? কারণ, স্বদেশে বিদেশ ও পৃথিবীর নাগরিকত্বের ধারণাগুলোর খোলনল ইন্টারনেটকেন্দ্রিক এক ভার্চুয়াল এপিক রিয়েলিটি আমূল উল্টে দিয়েছে। তবু আমরা জানি, ইতিহাস মারফতে অতীত নয়, কথা কয় বর্তমান। সেজন্যই মুক্তিযুদ্ধের কথন আমাদের কাছে হয়ে উঠে ভোরের বার্তাবাহিকা। মুক্তিযুদ্ধ যদি বাংলাদেশের ইতিহাসের দেহ গঠন করে তবে মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' নারীরা নিপীড়িত

> হবার ইতিহাস এর মাতৃগর্ভ রচিছে। মৌলবাদী-পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মুক্তিযুদ্ধের নিপীড়িতা বীরনারীদের বয়ান-ভাষ্য-নাটক আমাদের কাছে হতে পারে আগামী দিনের স্বপ্ন ও সাহসের আগুনদ্যুতি। (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৩ : অনুল্লেখিত)।

নাট্যকার শাহমান মৈশান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভিত্তি করে *বিদেহ* নাটকে যেভাবে গড়ে তোলেন তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো :

> মেঘনা তীরবর্তী এক চরে হালিমা খাতুন ও শান্তিকুমারীর অধিবাসন। প্রায় ৪০ বছর ধরে একসাথে থাকার ভেতর দিয়ে এই দুই নারী যেন একে অপরের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশে আজ পরিণত। ধর্মবোধের পাথর্ক্য তাদের জীবনবোধকে বিচিত্রগামী করলেও ইতিহাসের এক উত্তাল অধ্যায় দুই জীবনকে এক অভিন্ন চৈতন্যে বেঁধে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' এই দুই নারী বুকের ভেতরে, দেহের অন্তর্গত রক্তস্রোতে পাক হানাদার ও মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের লালসার দগদগে স্মৃতি ও স্ফুলিঙ্গ বহন করে চলে। জোছনা-আপ্লুত এক রাতে দুই নারীর কথোপকথন, দেহভঙ্গী, সংলাপ-প্রলাপের এক বাস্তব-পরাবাস্তব প্রতীকী আবহে হালিমা ও শান্তি পরস্পরবিরোধী অবস্থানটি হীরকদ্যুতিতে চিনে নেয়া যায়। এর ফলে দৃশ্যত এক মনোজাগতিক সংকটের অবতারণা ঘটে। হালিমা ভাবে, ইতিহাসের বিষপুরাণ যে নারীর দেহ অদ্য স্বাধীনতার বীজমন্ত্র সেই কথা নারীকেই আজ বলতে হবে। আবার, শান্তি অভিমানী। সে ভাবে, মুক্তিযুদ্ধে শত্রুলাঞ্ছিত এই দেহের মনোজাগতিক বিদীর্ণতাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেবলি স্বদেশ-সুধায় একদিন মৃত্যু হলেই চুকে যাবে। হঠাৎ উৎকণ্ঠার মেঘমুহূর্তের মতো আসে এক তরুণী। সে এক আগন্তুক। উন্মোচিত হয় মেয়েটি একাত্তরের যুদ্ধশিশু। সে আজ পাশ্চাত্যবাসী। শান্তি ভাবে, তরুণীটি দেখতে ঠিক হালিমার মতো। কিন্তু মেয়েটি বলে, তার মা আর বেঁচে নেই। স্মৃতি ও বাস্তবের এক অনিশ্চিত স্থানাংক রচনা করে মেয়েটি ঘাটে বাঁধা নৌকায় ফিরে যায়। কেননা এরই মধ্যে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঘটে হালিমার। মেয়েটি অদ্ভুত সব আলাপের ভেতর থেকে ছুটে আসা চিন্তা এবং সর্বোপরি হালিমার মৃত্যু নারী হিসেবে নিপীড়িত দেহের গল্প না বলার ট্যাবু এক প্রত্ন-ঝড়ে ভেঙে যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত যে বাংলাদেশ সেই দেশমুক্তির স্বপ্নির ভেতরে নারীর এই নিপীড়িত দেহের গল্পতো নারীর উৎসর্গেরও ইতিহাস। একাত্তরের উৎসর্গের গল্প অবশেষে শান্তিকুমারীর আজকের কথনের বিষয়ে পরিণত হয়। অগ্নিগর্ভ মুক্তিযুদ্ধে নারীর উৎসর্গের বয়ান অনেকমুখী। দৃশ্যের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর এই বহুমুখী লড়াইয়েরই এক অন্যসূত্রে হাজির করে নাটক *বিদেহ*। (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৩ : অনুল্লেখিত)।

নাট্যকার শাহমান মৈশান-এর পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেয়ে নির্দেশক লাকী ইনাম উদ্বেলিত। কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য নিম্নরূপ :

> বাঙালীর হাজার বছরের শেষ্ঠ অর্জন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধ আমি দেখেছি। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছি। লাশ দেখেছি, লাশের পচন দেখেছি। দেখেছি কীভাবে দিগ-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে বাংলাদেশের নারীরা সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে। কীভাবে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে অসহায় ছোট্ট শিশু। সশস্ত্র লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আর তাদের দোসরদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে বাঙালী নারী। তাইতো মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেমন আছেন বীরমাতা– রাহেলা, রাজুবালা, কমলা, হাসিনা ও সূর্য বেগমরা? কী কষ্ট আজও তাঁরা বহন করে চলছে? আমরা কি ভাগ করে নিতে পারি না তাদের সেই কষ্ট? নিতে হবে। কারণ আমরা দায়বদ্ধ। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও তাদের সেই ত্যাগের মূল্যায়ন আমরা করতে পারিনি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ঐ লাল সবুজের

> পতাকায় ওদের অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে ওদের কণ্ঠ আছে। ওরা বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার এ অর্জন তাঁদেরই অবদান। (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৩ : অনুল্লেখিত)।

অতত্রব, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর *বিদেহ* নাটকে নির্দেশনার মৌলিক পঞ্চসূত্র– বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা দেখা যেতে পারে।

ক. নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম বিন্যাস (কম্পোজিশন)। আলেক্সজান্ডার ডিন[৪] এবং লরেন্স কারা[৫] *Fundamentals of Play Directing* গ্রন্থে বিন্যাসের যে কৌশল বর্ণনা করেছেন *বিদেহ* নাটকে তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ চিত্রটি দেখা যেতে পারে :

চিত্র : *বিদেহ* নাটকে হালিমা ও শান্তিকুমারী

বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপের জন্য উচ্চতা ও দেহগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। মঞ্চে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দর্শকের দিকে মুখ করে সোজাসুজি দাঁড়ায় স্বভাবতই দর্শক তার দিকে প্রথম তাকায়। কারো দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকানো মানেই তাকে আকর্ষণ করা। এটা শুধু মঞ্চে নয়, পথে ঘাটে চলতে-চলতেও বহুলোকের মধ্যে কেউ যদি কোনো একজনের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকে তো দেখা যায় অনেক লোকের মধ্যে সেই লোকটিকে চোখে পড়ছে। তাই আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা এই সাধারণ সত্যকে মঞ্চে কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। *বিদেহ* নাটকের উপরিউক্ত চিত্রে সামনে তাকানো ও উচ্চতায় দাঁড়ানোর জন্য শান্তিকুমারী চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন "Levels present a much used method. The attention of the observer is attracted by what is higher than the regular line of vision" (1965 : 112)। বিভিন্ন উচ্চতা বা লেভেল বলতে মঞ্চতলের ওপর অবস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচ্চতাকে বোঝায়। উচ্চতার পার্থক্যের

কারণে গুরুত্বেরও পার্থক্য হয়। সাধারণত, সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় যে মঞ্চে শুয়ে থাকে সে, তারপর মেঝেতে বসে থাকা, চেয়ারে বসে থাকা, চেয়ারের হাতলে বসে থাকা, মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা, মেঝের কোনো উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা, দুই সিঁড়ি, তিন সিঁড়িতে দাঁড়ানো– এগুলো ক্রমান্বয়ে অধিক গুরুত্ব দাবি করে। এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যখন কোনো দৃশ্যে সবাই উঁচু লেভেলে আছে তখন চরিত্র যদি হাঁটুগোড়ে বসে থাকে বা মেঝেতে শুয়ে পড়ে তাহলে তীব্র বৈপরীত্যের কারণে হাঁটুগাড়া বা শুয়ে থাকা চরিত্র বেশি গুরুত্ব লাভ করে। অতএব, উপরিউক্ত চিত্রে শান্তিকুমারী উচ্চতায় দাঁড়ানোর জন্য হালিমার চেয়ে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

চিত্র : অভিনেত্রীদ্বয়ের সমান্তরাাল বিন্যাস

উপরিউক্ত চিত্রে দুই অভিনেত্রীর সমান্তরাল বিন্যাসের কারণে ভারসাম্য তৈরি হয়েছে এবং উভয়কে দৃঢ় মনে হয়েছে। চিত্রশিল্প সম্পর্কে ধারণা না থাকলে 'দৃঢ়তা'র ব্যাপার উপলব্ধি করা বেশ দুরূহ। তাই দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করার আগে ছবির কথা বলা প্রয়োজন। ছবি আঁকার জায়গা একখানা চারকোণা কাগজ বা ক্যানভাস। যাই আঁকা হোক না কেন ঐ চারকোণা কাগজের ওপরই আঁকতে হবে। কিন্তু ঐ চারকোণা কাগজের যে কোনো জায়গায় সুন্দরভাবে এঁকে দিলেই তা ছবি হয়ে ওঠে না। ঐ চারকোণা কাগজের চারপাশে একটা ফ্রেম কল্পনা করে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে এমনভাবে ছবির সাবজেক্ট বা বিষয় আঁকতে হবে যাতে ফ্রেম ভরাট মনে হয় অর্থাৎ কিছুতেই যেন মনে না হয় ছবি আর ফ্রেম আলাদা বা বিচ্ছিন্ন । ফ্রেম অযথা কিছু নয়, ফ্রেমের মধ্যে সাবজেক্ট দৃঢ়বদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোকচিত্রে দুই অভিনেত্রী দৃঢ়বদ্ধভাবে মঞ্চের ফ্রেম ভরাট করে সমান্তরাল বিন্যাস সৃষ্টি করেছে।

খ. নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন)। *বিদেহ* নাটকে দৃশ্যায়নের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। দৃশ্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মঞ্চে চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্টকরণ। সংলাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুট করা। সেহেতু বলা হয় "Picturization is the visual interpretation of each moment in the play" (Alexander Dean and Lawrence Cara, 1965 : 173)। এক কথায় দৃশ্যায়ন বা পিক্চারাইজেশন হচ্ছে নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলোকে মঞ্চে এমন ভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে চরিত্রগুলোর পরস্পরের প্রতি যে আবেগময় সম্পর্ক ও

মনোভঙ্গি এবং দৃশ্যের যে নাটকীয় পরিস্থিতি রয়েছে তা যেন কোনো সংলাপ বা ক্রিয়া ছাড়াই দর্শকের বোধগম্য হয়। দৃশ্যায়নের কাজ হলো এইভাবে– অবস্থান, শরীর ভঙ্গি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে নাট্যকাহিনি প্রকাশে সহায়তা করা। দৃশ্যায়নের মধ্যে গল্প বলার দিকটাও রয়েছে। দৃশ্যায়নের সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও যেন শুধু চোখে দেখেই নাটকের দৃশ্যের অর্থ বুঝতে পারে, আবেগ অনুভব করতে পারে। যা নিম্নের আলোকচিত্র লক্ষ করলে উপলব্ধি করা সম্ভব :

চিত্র : হালিমা ও শান্তিকুমারী

উপরিউক্ত দৃশ্যে চরিত্রদ্বয়ের বসার ভঙ্গি তাদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য স্পষ্ট হয়েছে। চরিত্রের চিন্তা, আবেগ প্রকাশের জন্য দৃশ্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং শুধু সংলাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারাও দৃশ্যকে পরিস্ফুট করা সম্ভব।

গ. নির্দেশনা কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছন্দ (রিদম)। নির্দেশকের অন্যতম দায়িত্ব নাটকের অন্তর্গত ছন্দ আবিষ্কার করা। গতিশীল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন ছন্দ বিদ্যমান নাটকের কাহিনি, সংলাপ, প্রতিটি-দৃশ্যাংশ, এমন কী চরিত্রের প্রত্যেক মুহূর্তের গতিবিধিরও ছন্দ আছে। নির্দেশককে এই সমস্ত খণ্ডিত ছন্দসমূহকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে হয়। প্রতিটি দৃশ্যের স্থায়িত্বকাল এবং সংলাপের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ছন্দ। নাট্যাচার্য কনস্টানটিন সার্গেইভিচ আলেকিসয়েভ স্তানিসস্লাভস্কি[৬] ঠিক চরিত্রায়ন এবং নাট্যক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে "Tempo Rhythm" (চন্দন সেন, ২০০৪ : ১২০)–এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাট্য সমালোকের মতে, "শারীরিক ক্রিয়ার সময় সততা ও দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে লয়-ছন্দ। নির্দেশকের কাছে গোটা অভিনয়ের সার্বিক ছন্দকে খুঁজে বের করার গুরুত্ব রয়েছে" (Sonia Moore, 1967 : 66)। ছন্দের গুরুত্ব নাটকের একটি অভিজ্ঞতা এবং তা আসে বিশেষ ঝোঁকের পুনরাবর্তনে এবং এই ব্যাপারটি দৃশ্য এবং শ্রাব্য ক্ষেত্রে একক বা সম্মিলিতভাবে ঘটতে পারে। সংলাপ, গতিবিধি, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আবহ সবকিছুতেই তাই ছন্দ থাকে "নির্দেশকের দায়িত্ব প্রয়োজনভেধে তাকে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করা" (সাধন কুমার, ১৯৮১ : ১২৮)। *বিদেহ* নাটকের গল্পে হালিমা ও শান্তিকুমারীর কথোপকথন দ্বারা দুই বীরাঙ্গনা নারীর এক মনোজাগতিক সংকট তৈরি হয়। দুই নারীর কথোপকথনে তৈরি নাট্যিক ঘটনার আবহে বৈচিত্র্য আসে তরুণী আগন্তুকের উপস্থিতিতে। নাট্যের বুননে মূল ছন্দ রক্ষিত হয়েছে। নিম্নের আলোকচিত্র লক্ষ করা যাক :

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

স্থান-কাল ও আবহের ক্ষেত্রে *বিদেহ* প্রযোজনায় ছন্দের প্রয়োগ ছিল যথাযথ। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন, "The locale in which the play is laid becomes an important consideration in determining the rhythm" (1965 : 241)।

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, লাকী ইনাম ছন্দকে অবহেলা না করে বরং প্রকৃত ছন্দ-লয় ব্যবহারের মধ্যমে *বিদেহ* নাটকে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। ছন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছন্দ প্রত্যেককে একত্রিত করে। ছন্দের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে দর্শকের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব, যা *বিদেহ* প্রযোজনায় দর্শক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব, ছন্দ মূলত *বিদেহ* নাটককে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের ভাব, ধরণ, প্রকৃতি, নাট্যপরিস্থিতি, স্থান, অবস্থা, চরিত্রায়ণ, আবহ ও পরিবেশ প্রভৃতি প্রকাশ করতে ছন্দের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে।

ঘ. নাট্য নির্দেশনায় চলন (মুভমেন্ট) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। দৃশ্যায়ন আলোচনায় যে সংলাপ ও ক্রিয়াহীন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে– সেই দৃশ্যে চলন যুক্ত হয়ে যে গতিশীল দৃশ্য তৈরি হয় তাই

মঞ্চ-দৃশ্য। বিন্যাসের ভেতর দিয়ে দৃশ্যায়নের দিকে যেতে হয়। দৃশ্যায়ন ধারাবাহিকভাবে কতগুলো ছবি। ছবিগুলো হয় স্থির। ছবিগুলো তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। প্রতিটি চলনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ছবিগুলো বদলে যায়। চলনের কারণে অর্থও পাল্টায়। একটি ছবি থেকে আরেকটি ছবিতে যেতে সাহায্য করে চলন। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতেও চলনের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি চলনই এক একটি ছবি তৈরি করে। আর প্রতিটি ছবি এক একটি অর্থ প্রকাশ করে। ক্রিয়াশীল মঞ্চে ছবি তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। চলন ও বিন্যাসের মূল পার্থক্য হচ্ছে– চলন প্রকাশ করে মঞ্চে ক্রিয়ারত কোনো চরিত্র বা চরিত্রসমূহের বিশেষ ভাবকে। সমালোচকদের মতে কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চক্ষেত্রে হাঁটা-চলাই চলনের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীরের সমস্ত রকম ভঙ্গিই চলনের অন্তর্ভুক্ত। চলনের কৌশলগত এবং ভাবগত মূল্য থাকে। আবার এর দৃশ্যগত মূল্যও লক্ষণীয়। তাই নির্দেশক সাধারণত, "চরিত্রের মূল্য নির্ধারণে, বৈচিত্র্য আনায়নে, ভাব প্রকাশে ও চরিত্রকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য চলনের ব্যবহার করতে পারেন" (Alexander Dean and Lawrence Cara, 1965 : 189)। নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন :

> Repeated experimentation has shown that a figure or group passing from left stage to right stage gives the effect of stronger movement, as well as a greater amount and force of movement of the figure, than movement from right stage to left. (1965 : 194)।

সাধারণত আমরা যখন কিছু পড়ি বা ফটোগ্রাফ দেখি, সেক্ষেত্রে আমরা বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে যাই। যখন আমরা মঞ্চে কোনো কিছু দেখি তখনও একই কাজ করি। যখন কোনো চরিত্র বা দল আমাদের চোখে যেভাবে ক্রিয়া করে, সেভাবে হেঁটে যায়। তখন চোখও চলমান মানুষগুলোর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। চরিত্রটি ততক্ষণই আমাদের সাথে হাঁটতে থাকে, যতক্ষণ না সে নেপথ্যে চলে যায়। অপরদিকে যেভাবে আমাদের চোখ অভ্যস্ত, সেরকম না হয়ে চরিত্রটি উল্টো দিকে হাঁটলে চোখ স্বাভাবিকভাবেই একটু বাধাগ্রস্ত হয়। যখন এই দৃশ্যগত বাধা তৈরি হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি চোখে দেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ছন্দোময় ডান থেকে বামে যাবার চেয়ে বাম থেকে ডানে যাওয়া শক্তিশালী চলন। নিচের আলোকচিত্র লক্ষ করা যাক :

চিত্র : আগন্তুকের চলন

উপরিউক্ত *বিদেহ* নাটকের আগন্তুকের এই দৃশ্যে ডান দিক থেকে বাম দিকে চলনের ফলে দৃশ্যটি কমশক্তিশালী চলনে পরিণত হয়েছে। এছাড়া নাটকে যথারীতি চলনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য, অনেকেই ধাঁধায় পড়ে যায় যে, মঞ্চে ডান বা বাঁ বলতে ঠিক কী বোঝায়, কারণ দর্শকের দিক থেকে যেটা মঞ্চের বাঁ, অভিনেতার দিক থেকে সেটা মঞ্চে ডান; অতত্রব মঞ্চে ডান বা বাঁ বলতে কোনটা বুঝব? এখানে মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চ-বিজ্ঞানে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিক থেকেই ডান, বাম ধরা হয়।

ঙ. নির্দেশনা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)। প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয় বলতে কী বোঝায়? সোজা কথায় প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন হচ্ছে সংলাপহীন নাট্যক্রিয়া বা "action without dialog" (Alexander Dean and Lawrence Cara, 1965 : 257)। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য :

> নাট্যক্রিয়া বা অ্যাকশন হলো মুখের ভাবভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি, হাত নাড়া এবং চলন। এগুলির উৎস হচ্ছে বাস্তব জীবন। নাটকে এগুলির প্রয়োগ করা হয় চরিত্র, দৃশ্য-পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদিকে প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। মুখে সংলাপ না বলে–এই উপাদানগুলির সাহায্যে বক্তব্য পরিস্ফুট করার নামই প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয়। (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ১৯৮৫ : ৪৫)।

কিন্তু নির্বাক অভিনয় নাটকে দরকার হয় কেন? এটা নাটকে দরকার হয় দর্শক মনের চাহিদা মেটাবার জন্য। নাটক দেখতে বসলে দেখা যায় দর্শক যতটা শুনতে চায় তার থেকে বেশি সে দেখতে চায়। সংলাপ শোনার বিষয় আর নির্বাক অভিনয় দেখার বিষয়। কাজেই কথার ফাঁকে দেখাবার উপাদানগুলোকে হিসেব মতো ব্যবহার করলে নাটকে অনেক বেশি প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব। দক্ষ নির্বাক অভিনয় দ্বারা সংলাপ ছাড়াই গল্প, চরিত্র, পরিবেশ ও স্থান প্রকাশ করা সম্ভব। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন "It gives a conviction of reality, showing people living in a definite place, reacting with the responses of life" (1965 : 262)। উদাহরণস্বরূপ আলোকচিত্রটি লক্ষ করা যাক :

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

উপরিউক্ত চিত্রে হালিমা ও শান্তিকুমারীকে দেখা যাচ্ছে। হালিমা রান্না করছিলেন। শান্তিকুমারী এসে গান শুরু করলে হালিমাও যোগদান করেন। শান্তিকুমারী আসার পূর্বে কোনো কথা বললেও হালিমা চুলার উপর হাঁড়ি, লাকড়ি গুঁজে দেয়া ইত্যাদি ক্রিয়া করছিলেন। সংলাপহীন এধরনের ক্রিয়া দ্বারা– লাকড়ি দিয়ে রান্না করা, বিশেষ একটি স্থান, জীবনযাপনের প্রকৃতি যেমন বোঝানো সম্ভব হয়েছে তেমনি মানবিক বোধের তীব্র উৎসারণের মাঝেও বেঁচে থাকার জন্য খাবার তৈরির বাস্তবতাও উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আলোকচিত্রটি লক্ষ করা যাক :

চিত্র : *বিদেহ* নাটকে আগন্তুক

উপরিউক্ত চিত্রে আগন্তুকের সংলাপহীন তথাপি নির্লিপ্ততা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে এই স্থানটি তার জন্য নতুন। সুতরাং *বিদেহ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রদত্ত নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি সূত্রের প্রয়োগ হয়েছে। যদিও ডিন ও কারার সূত্র ধরেই নির্দেশনায় এটি প্রয়োগ হয়নি বরং নির্দেশকের অভিজ্ঞতা ও কৌশলে সহজাতভাবে বিষয়গুলো এসেছে। যার দ্বারা নির্দেশকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এর ব্যত্যয়ও চোখে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চলন সহজাত না হয়ে বরং ছকে বাঁধা মনে হয়েছে। *বিদেহ* নাটকে চলন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথাও-কোথাও অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে তা সত্যেও নির্দেশক পঞ্চসূত্র ব্যবহার করে সার্থকভাবে নির্দেশনাকর্ম সমাধান করেছেন। আলেক্সান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার সূত্র যথাযথভাবে জেনে প্রয়োগ করলে নাটকের চরিত্র, গল্প, পরিস্থিতি, স্থান, পরিবেশ, আবহ ইত্যাদি আরও শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। লাকী ইনামও তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় তত্ত্বসূত্র বা কোনো নির্দিষ্ট মেথড পুরোপুরি অনুসরণ করেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, নির্দেশনার বহু ক্ষেত্রে ব্রেখটের[৭] তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

লাকী ইনামের নাট্য-নির্দেশক হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে ধারাবাহিক, লক্ষ্যাভিমুখী ও পদ্ধতিগত চর্চার ফল। তাইত তিনি বিগত চুয়াল্লিশ বছর থিয়েটারের সকল শাখায় কাজ করে অবশেষে সমাজিক দায়বদ্ধতার কারণে নাট্য-নির্দেশনায় এসেছেন। এই দায়বদ্ধতার কারণেই লাকী ইনামকে দেখা যায় সমাজের অবহেলিত 'নারী' ও 'মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক' নাটক নির্দেশনা দিতে। লাকী ইনাম অভিনয় করেছেন, পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন, অনুবাদ করেছেন, পোশাক, সংগীত ও নৃত্য

পরিকল্পনা করেছেন এবং শিশুদের নিয়ে নাটক করেছেন– এই সব বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক চর্চা করে নির্দেশনায় এসেছেন তিনি। তাই তো লাকী ইনাম বলেন, "নাটক নির্দেশনা দিতে গিয়ে কেউ যদি অভিনেতা এবং নাট্যকার হন তবে তাঁর জন্য নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রটি সাংঙ্ঘাতিক সহায়ক হয়"(ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৩ মার্চ ২০১৬)। সুতরাং থিয়েটারের সকল শাখায় কাজ করে লাকী ইনাম নাট্য-নির্দেশনার 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' আয়ত্ব করতে পেরেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি লাকী ইনামের নির্দেশনায় ধারাবাহিক চর্চা, পরিশ্রম ও গবেষণার পাশাপাশি ব্যক্তিগত 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি নির্দেশনা কাজে জীবন ও শিল্প এই দুটোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে চান। জীবন যে কত গভীর এবং জীবনের ভিতরে যে কত জীবন থাকে সেগুলো তাঁর নির্দেশনায় ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেকেরই জীবনের ভিতরে আরেকটি জীবন আছে। সেই জীবনকে শিল্প-রস দিয়ে সৃষ্টি করাই হলো শিল্পস্রষ্টা বা নির্দেশকের কাজ।

মহড়ায় তত্ত্বসূত্র বা মেথড প্রয়োগে লাকী ইনাম খুবই স্বাধীনচেতা নির্দেশক। তিনি আকস্মিকভাবে নাট্য-নির্দেশনায় আসেননি। থিয়েটারে তিনি অনেক সময় দিয়েছেন। তিনি শেখার চেষ্টা করেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন। আতাউর রহমান[৮], আলী যাকের[৯] সহ এমন গুণী অতিথি নির্দেশকের নির্দেশনা মেথড বোঝার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি দীর্ঘ সময় তাঁদের সাথে থিয়েটারে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রুপ করার পর থেকে নির্দেশনা দেয়া শুরু করেন। লাকী ইনাম বলেন, "আমার শুরুর দিকের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অনেক বৈপরীত্য আছে। পরিবর্তন যে কোনো নির্দেশকের বেলায় আসাটা স্বাভাবিক। আমারও এসেছে" (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৭ এপ্রিল ২০১৬)। লাকী ইনাম তাঁর নির্দেশনা মেথড প্রয়োগে ব্রেখট-এর এপিক ও অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বকে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন :

> আমি ব্রেখট-এর তত্ত্বসূত্র বা মেথড বেশি পছন্দ করি এবং সেটা মেনে চলি। আমার নির্দেশিত নাটকের কোথাও না কোথাও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। স্তানিস্লাভস্কির মেথডও প্রয়োগ করি। আমি আমার *গৃহবাসি* নাটকে স্তানিস্লাভস্কির-এর মেথড প্রয়োগ করেছি। আধুনিক থিয়েটারে মেথড বা তত্ত্বসূত্র ব্যবহার করতেই হয়। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৩ মার্চ ২০১৬)।

তবে উল্লেখ্য লাকী ইনামের নির্দেশিত নাটক লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি তত্ত্বসূত্র বা মেথড ভালো করে জেনে নিয়ে স্ব-কৌশলে ব্যবহার করেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি লাকী ইনাম ইংল্যান্ড চলে যান। সেখানে তাঁর সুযোগ হয়েছিল ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের মহড়া দেখার। তিনি বলেন :

> আমি তাদের মহড়া দেখতাম। নির্দেশকের মেথড ও নির্দেশনা কৌশল লক্ষ করতাম। প্রায় সারাদিন আমি কাজগুলো দেখতাম। আমি বলবো, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কিছু কাজ আমাকে উৎসাহিত করেছে। দেশে ফিরে আসার পর যখন থিয়েটার শুরু করি তখন আমি লক্ষ করলাম আমার কাজে অবচেন ভাবে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কাজের প্রভাব পড়ছে। (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৭ এপ্রিল ২০১৬)।

লাকী ইনাম মনে করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি তৈরিতে এই ভ্রমণ কাজে দিয়েছে। তাছাড়া নির্দেশনার বিভিন্ন গ্রন্থও তাকে সহযোগিতা করেছে। লাকী ইনাম সরাসরি কোনো তত্ত্বসূত্র বা মেথড অনুসরণ করেন না বলে অবহিত করেন। অতএব উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, লাকী ইনাম নির্দেশনা-কৌশলে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা-প্রণীত পঞ্চসূত্রের প্রয়োগ ঘটান। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। তা সত্ত্বেও লাকী ইনাম নির্দেশিত– *বিদেহ* নাটকের প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণে পঞ্চসূত্রের কিছু উপাদানের কার্যকর উপস্থিতি এবং অর্থপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে।

টীকা

১. লাকী ইনাম : নাগরিক নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রথম নারী সদস্য ও অন্যতম অভিনেত্রী। বেতার ও টেলিভিশনে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী হিসাবেও জনপ্রিয়। তাঁর রচিত বেতার নাটকের সংখ্যা প্রায় ৩০টি এবং টেলিভিশন নাটকের সংখ্যা ১৫টি। তাঁর নির্দেশিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– *সরমা*, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, *স্বপ্ন*, *সুদূরে দিগন্ত*, *সুলতানার স্বপ্ন*, *বিদেহ* ইত্যাদি। তিনি একাধিক প্রযোজনার পোশাক-পরিকল্পনা, আবহ সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে তিনি নাগরিক নাট্যাঙ্গনের প্রধান সংগঠক।

২. ইনামুল হক : প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, লেখক, শিক্ষক। তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিভিন্ন আন্দোলনমুখী নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের আইয়ুব খানের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন নাট্যচর্চাকে হাতিয়ার করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সৃজনীর ব্যানারে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ট্রাকে-ট্রাকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পথনাটক করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'নাগরিক নাট্যাঙ্গন', যে দলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজও দায়িত্ব পালন করছেন। ইনামুল হকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– *নির্জন সৈকতে*, *গৃহবাসী*, *মুক্তিযুদ্ধ নাটকসমগ্র*, *স্ট্রিন্ডবার্গ এর দু'টো নাটক*, *মহাকালের ঘোর সওয়ার*, *বাংলা আমার বাংলা* ইত্যাদি।

৩. শাহমান মৈশান : নাট্যকার, নির্দেশক, অনুবাদক ও শিল্প-সমালোচক। লোকপুরাণ থেকে বিনির্মাণ করেছেন *ভেলুয়া ও নসিমন*। যৌথভাবে রচনা করেছেন *বেহুলার ভাসান*। বাংলায় অনুবাদ ও পুনর্লিখন করেছেন মার্কসবাদী নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেখটের *সিদ্ধান্ত* (*দ্য মেজারস টেকেন*) এবং ফ্রাঙ্ক ওয়েডেকিন্ডের *স্প্রিং আওয়েকনিঙ* অবলম্বনে *বসন্ত জাগরণ*। এছাড়াও অনুবাদ করেছেন হ্যারল্ড পিন্টারের চারটি নাটক। তত্ত্বীয় প্রবন্ধ এবং কবিতা অনুবাদ করেছেন তিনি। পরিচালনা করেছেন জার্মানির উত্তরাধুনিক নাট্যকার হাইনার মুলারের *হ্যামলেটমেশিন*-সহ আরো কিছু সংখ্যক নাট্যকারের নাটক। তার রচিত *অশেষকৃত্য*, *কালচৌতিশা*, *ফনা*, *দক্ষিণাসুন্দরী*, *ওথেলো-ভূতেলো*, *সুরাক* প্রভৃতি নাটক নতুন নাট্যভাষার সূচনা করেছে।

৪. আলেক্সজান্ডার ডিন (১৮৯৩-১৯৩৯) : বিশিষ্ট গবেষক, নির্দেশক ও নাট্যশিক্ষক। তিনি Yale University Drama School–এ শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল নাট্য-নির্দেশনা। গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি রচনা করেন *Fundamentals of play Directing* গ্রন্থটি; যেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নাট্য-নির্দেশনার বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। নির্দেশনার প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচটি কলা-কৌশলের সূত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে 'আনাড়ী' নাট্য-শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কীভাবে নির্দেশক হিসেবে গড়ে তোল যায়, সেই অভিনব পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীর সকল নাট্য-শিক্ষার্থীর পাঠ্য হিসেবে গ্রন্থটির স্বীকৃত। সর্বোপরি একজন 'আনাড়ী' বা শিক্ষানবিশ নির্দেশকের জন্য তাঁর কর্মপদ্ধতি বাইবেলস্বরূপ। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটো গ্রন্থ– *Unified Log Processing : Integrating and processing event streams, Little Theatre Organization and Management*।

৫. লরেন্স কারা (১৯০৯-২০০৬) : একজন সফল থিয়েটার ও টেলিভিশন নাট্য-নির্দেশক। বিখ্যাত অভিনেতা ও নির্দেশক শিক্ষক লরেন্স কারা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার কারণে তিনি Yale University Drama School–এ নাট্যশিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে তাঁর পড়াশুনার পাঠ সম্পন্ন করে আলেক্সজান্ডার ডিনের গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করেন। আলেক্সজান্ডার ডিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে *Fundamentals of play Directing* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ডিনের মৃত্যুর পর লরেন্স কারা সহকারী লেখক হিসেবে গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন, যা বর্তমানে নাট্য-নির্দেশনার পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে তিনি নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে Northwesten University এবং University of Texas–এ পাঠদান করেন। পরবর্তীকালে Drama School of Carnegie Tech (বর্তমানে Carnegie Mellon University)–এ যোগদান করেন এবং সেখানে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো *Fundamentals of play Directing, Controls in Play Directing : Types and Styles, The Prince and the Piper, The Great Magician : A Modern Conception of a Commedia*।

৬. কনস্টানটিন সার্গেইভিচ আলেকিসয়েভ স্তানিস্লাভস্কি (Constantin বা Konstantin Sergeivich Alexicv Stanislavsky ১৮৬৩-১৯৩৮) অভিনয় ও সামগ্রিক নাট্যকলাকে বিজ্ঞানভিত্তি ও সৃজনশীল শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা

করার গৌরবে অধিষ্ঠিত। আধুনিক অভিনয় কলা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির স্থাপতি তিনি। কৈশোর কালেই স্তানিস্লাভস্কি তাঁদের পারিবারিক থিয়েটারে অভিনেতা ও নির্দেশকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সালে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, নামকরণ হয় মস্কো আর্ট পপুলার থিয়েটার, যা মস্কো আর্ট থিয়েটার রূপে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছে। থিয়েটারে রিয়ালিজমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে নাট্য প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে ও অবদান রেখেছে এবং বিশ্বনাট্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল সেটি হলো রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– *An Actor Prepares, Building A Character, Creating a Role, My Life in Art*।

৭. বার্টল ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬) : তাঁর পদ্ধতিতে মহাকাব্যের (Epic) বর্ণনাধর্মিতা এবং অভিনেতার সঙ্গে চরিত্রের ও দর্শকের বিচ্ছিন্নকরণকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। দর্শক যাতে অভিনেতাকে নাটকের চরিত্র মনে না করে নাটকের মূল বক্তব্য অনুধাবনপূর্বক নাটক থেকে শিক্ষালাভ এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে তাদের করণীয় স্থির করতে পারে সে জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন ব্রেখট। ব্রেখট চেষ্টা করেছেন, অলৌকিকতার মায়াজাল সৃষ্টির শৃঙ্খল থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি চেয়েছেন থিয়েটার একই সাথে হবে আনন্দকর ও শিক্ষাদানের মাধ্যম। ব্রেখটের মতে থিয়েটার ইতিহাসের ব্যাখ্যাকারী বা বিশ্লেষক নয়, থিয়েটার নতুন মূল্যবোধের আলোকে সমাজ বদলের হাতিয়ার। থিয়েটারের চেয়ে মানুষ বড় এবং মানুষের জন্যই থিয়েটার। ব্রেখট মানুষের শ্রেণিগত ভেদাভেদ তুলে ধরতে চেয়েছেন থিয়েটারে। ব্রেখট দর্শকের কাছে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিষয়বস্তু তুলে ধরতে নতুন একটি প্রকাশভঙ্গি খুঁজেছেন। এজন্য বিষয়বস্তুর মতো নাট্যরীতিতেও আমূল পরিবর্তন আনলেন। নতুন আঙ্গিকের নাম দিলেন এপিক। কারণ, তাঁর নাটক লেখার ধারাটি মহাকাব্যের শিল্পরীতির মতই বিশাল, সরল ও সুন্দর। অ্যারিস্টটলের তত্ত্বনির্ভর থিয়েটার তথা প্রচলিত থিয়েটারকে ব্রেখট বলেছেন 'নাটকীয় থিয়েটার' (dramatic theatre), যা তার মতে মূলত স্থবির। অপরপক্ষে বর্তমান বা আধুনিক কালের জন্য যে রূপ থিয়েটারের প্রয়োজন– যার উদ্দেশ্য হবে রাজনৈতিক, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে উদ্বোধিত করার কর্মে নিবেদিত, তিনি সেই থিয়েটারকে 'এপিক' রূপে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন এপিক আঙ্গিকই আধুনিক থিয়েটারের সত্যকার আঙ্গিক। 'The Modern Theatre is the Epic Theatre' প্রবন্ধটিতে তিনি নাটকীয় আঙ্গিক ও এপিক আঙ্গিকের যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তাতে এই দুই বিপরীতধর্মী থিয়েটারের আঙ্গিকে কোন বিষয়ের গুরুত্ব বেশি ও তাদের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন ধরা পড়ে তেমনি এপিক থিয়েটারের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকীয় থিয়েটারকে তিনি বুর্জোয়া থিয়েটার রূপে অভিহিত করেছেন, অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, কারণ তা' সমাজকে স্থিতাবস্থায় রাখতে চায়, এবং দর্শককেও নিষ্ক্রিয় করে রাখে। অপরপক্ষে এপিক থিয়েটার মানুষেকে ও সমাজকে দেখে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ও সংগ্রামের সূত্রে ও প্রেক্ষিতে; সামাজিক ও মানবিক অবস্থাকে পরিবর্তন করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক *Mother Courage and Her Children, The Threepenny Opera, The Caucasian Chalk Circle, Life of Galileo, The Good Person of Szechwan, The Resistible Rise of Arturo Ui, Baal, Drums in the Night* ইত্যাদি।

৮. আতাউর রহমান : বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যশিক্ষক। আতাউর রহমান লন্ডন একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের মতো উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর বাইরেও তিনি একজন নাট্যকার, অনুবাদক এবং নাট্য-গবেষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা– *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, *ভেঁপুতে বেহাগ*, *মাইলপোস্ট*, *কবর দিয়ে দাও*, *সাজাহান*, *গণনায়ক*, *গোডোর প্রতীক্ষায়*, *গ্যালিলেও*, *ঈর্ষা*, *হিম্মতী মা*, *রক্তকরবী*, *অপেক্ষমাণ*, *বাংলার মাটি বাংলার জল* ইত্যাদি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তক বলে বিবেচিত।

৯. আলী যাকের : একজন অভিনেতা, নির্দেশক, ব্যবসায়ী ও কলামিস্ট। তিনি টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকে সমান জনপ্রিয়। তিনি একই সাথে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় ও দেশীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। আলী যাকের আমৃত্যু বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা এশিয়াটিক থ্রিসিক্সটির কর্ণধার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নির্দেশিত প্রযোজনা– *বিদগ্ধ রমণী কুল*, *তৈল সংকট*, *এই নিষিদ্ধ পল্লীতে*, *সৎ মানুষের খোঁজে*, *অচলায়তন*, *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন*, *নূরলদীনের সারাজীবন* ও *কাঁঠাল বাগান* ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনীত প্রযোজনা– *কবর*, *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, *দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা*, *ম্যাকবেথ*, *টেমপেস্ট*, *কবর দিয়ে দাও*, *গ্যালিলিও* ইত্যাদি।

উল্লেখপঞ্জি

গোলাম শফিক (২০১২)। 'লাকী ইনামের যুযুধান অঙ্গুলিগুচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী'। *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ* [সম্পা. মাহমুদুল ইসলাম সেলিম], ঢাকা: নাগরিক নাট্যাঙ্গন

লাকী ইনাম (২০১৬)। *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি [ব্রশিয়ার] (২০১৩)। *বিদেহ*। রচনা : শাহমান মৈশান, নির্দেশনা : লাকী ইনাম

Alexander Dean and Lawrence Cara (1965)। *Fundamentals of Play Directing*। New York: Holdt, Rinehart and Wnston, Inc.

চন্দন সেন (২০০৪)। *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা*। কলকাতা: প্রতিভাস পাবলিশিং

Sonia Moore (1967)। *The Stanislavski System*। New York: Pocket Books

সাধন কুমার ভট্টাচার্য (১৯৮১)। *প্রযোজনা ও পরিচালনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ [সম্পা.] (১৯৮৫)। *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

তারানা গীতিশৈলীর বিবর্তন

আকলিমা ইসলাম কুহেলী*

Abstract : Hazrat Amir Khusrau, the great genius of the thirteenth century (1253–1324), introduced the Tarana style. Although Khyal and Tarana are apparently similar songs, the main difference lies in the language. It is said that Khayal songs are composed in rich language and Tarana uses many so called meaningless words like derena, dani, dreem, tum tanana etc. However, Ustad Amir Khan discovered in his study of the style of Tarana songs that the words used in Taranas are not meaningless atall. He found a mystical philosophy of life in Taranas created by Amir Khusru. The essay will try to shade light on that topic.

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, তারানায় দেরেনা, দানি, দ্রীম ও দিয়ানা তুম তনানানা ইত্যাদি অর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যা তেলেনা নামেও অভিহিত । এতে দুটি তুক বা ভাগ থাকে—স্থায়ী ও অন্তরা। রাগ ও তালের প্রাধান্যই এই সংগীতে বেশি লক্ষ করা যায়। তারানার বিস্তার সাধারণত এতে ব্যবহৃত শব্দের সাহায্যে হয়ে থাকে। মধ্য ও দ্রুতলয়ে গীত এই শৈলীতে লয়কারীর প্রাধান্য বর্তমানে অধিক প্রচলিত। দ্রুতলয়ে গাওয়ার সময় কখনো এতে তবলা পাখোয়াজের বোল যেমন ধিড়নাগ, কিটতক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দ্রুতলয়ে গীত এই সংগীতে সাধারণত দ্রুত ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল ব্যবহৃত হয়। চিত্তরঞ্জক ও লয় প্রধানের পাশাপাশি বিশেষ উপভোগ্য ও সমাদৃত বলে অনেক খেয়াল গায়ক ঠুমরি, ভজনের পরিবর্তে খেয়াল গানের পর তারানা শৈলীর গান পরিবেশন করে থাকেন।

তারানা গানের উৎস সম্পর্কে বলা যায় যে, আধুনিক গবেষকদের মতে তারানা গানের উদ্ভাবক হলেন হজরত আমীর খসরু। তবে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কোনো শাস্ত্র গ্রন্থে তারানা গীত-শৈলী তথা গীতশৈলী সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় না। এর কারণ হতে পারে যে, তারানা রাগ সংগীতের অর্ন্তভূক্ত হলেও পূর্বে হিন্দু সংগীত গুণীদের দৃষ্টিতে তা ম্লেচ্ছ গীত বলে বিবেচিত হত। তবে মুসলিম সংগীত শাস্ত্রীরা তারানা গান সম্পর্কে বলেছেন:

> " ক) ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আবুল ফজ্‌ল্‌ রচিত *আইন ই আকবরী* গ্রন্থে বলা হয়েছে- দিল্লিতে যে গীত গাওয়া হয় তার নাম কওল ও তারানা। আমীর খুস্রৌ দেহলবী (দিল্লীর বাসিন্দা) সমুৎ ও তাতার নামক দুজন গায়কের মুখে শোনা তাঁদের ভাষায় গীত ভেঙে এই ধরণ দুটির (অর্থাৎ কওল ও তারানার) প্রবর্তন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফার্সি সাউৎ, নক্‌শ্‌- এই সকল গীত পদ্ধতি অবলম্বন করেন।
>
> খ) ফকির উল্লাহ রচিত রাগদর্পণ (১৬৬৬ খ্রি.) গ্রন্থে লিখিত হয়েছে- দিল্লিতে প্রচলিত গীত- কওল, তরানা, খিয়াল, নক্‌স্‌, নিসার, বসিত, তিল্লানা, সোহ্‌লা। এইগুলি মীর খসরু (আমীর খুস্রৌ) কর্তৃক প্রবর্তিত। তারানা- ইচ্ছামত কবিতা গদ্য হতে পারে, কিন্তু এতে তা, না, তলী- এইসব শব্দ থাকবে। তিল্লানা- সম্পূর্ণ (ভাবে) তা না, তলী- এই শব্দাদি দ্বারা গঠিত।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ) ১৬১৭ সালে রচিত মীর্জা খাঁ তাঁর *তুহফাৎ-উল-হিন্দ* গ্রন্থে বলেছেন- সোরবন্ধ নামক গীতের প্রকারভেদে অর্থহীন এলা, এলালা, এলালুম, তানা, তন্, দেরেনা, দানী, তাদানী প্রভৃতি শব্দ সুর সহযোগে গাওয়া হয়। আমীর খুস্রৌ এর প্রবর্তক। কওল ও তারানাকে বর্তমানে 'তিলানা' বলা হয়। এই জাতীয় গীতে আরবী ও ফার্সী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।" (প্রদীপ, ২০১০: ২৩-২৪)।

কাজেই তারানা সংগীতের প্রবর্তক যে, হজরত আমীর খসরু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপযুক্ত আলোচনায় এটাও প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুদের প্রবন্ধ গানের কোনো কোনো প্রকারের সাথে মিল পাওয়া যায় এমন গীতের সঙ্গে সমুৎ ও তাতার নামক দুজন গায়কের কাছে শেখা পারসিক গীত সাউথ ও নকশ-এর মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করে আমীর খসরু কওল ও তারানা গানের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কওল গান পরবর্তীকালে খেয়াল গান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আমীর খসরুর শিষ্যসম্প্রদায় কওল বচ্চে ঘরানার শিল্পীরাই কওল গীতকে খেয়ালে রূপান্তরিত করেন। অপরদিকে তারানা গানের প্রকারভেদকে বলা হয় তিল্লানা বা তেলেনা। তিল্লানাকে আবার সোরবন্ধও বলা হয়, যার জনক আমীর খসরু। হজরত আমীর খসরু তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা এমন গীতশৈলীর প্রবর্তন করেন যা পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। আর এই গীতশৈলীকে জনপ্রিয় করতে ওস্তাদ আমীর খাঁ একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এই প্রসঙ্গে কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯২৭-২০০৬) তাঁর *কুদরত্ রঙ্গিবিরঙ্গী* গ্রন্থে লিখেছেন,

"আমীর খাঁ একাধিক তারানা গাইতেন যাতে অন্তরায় ফার্সী বয়েৎ থাকত; তারপর ছোট কুটতান দিয়ে উনি মুখরায় আসতেন। এ রচনাগুলি সুন্দর, কিন্তু ওর পাঁচজন ভক্তবৃন্দের জ্ঞাতার্থে বলি, এ-তারানার ফর্ম ওঁর আবিষ্কৃত নয়। এ- ধরণের তারানা প্রাচীন এবং আমীর খসরুর নামে প্রথম চালু হয়।" (কুমার, ১৯৯৫:২২০)।

আমীর খসরু একজন উচ্চমানের কবি, সংগীতজ্ঞ এবং পীর হজরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার (১২৩৮-১৩২৫) ভক্ত ছিলেন। পীর দেহত্যাগ করার পর আমীর খসরু তাঁর মাজারেই (সমাধিস্থল) থাকতেন এবং তারানায় ব্যবহৃত শব্দগুলো তিনি তাঁর ধর্মগুরু হজরত নিজামউদ্দীন আওলিয়ার জন্যই বানিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক বিরহ, বেদনা বা আনন্দব্যাঞ্জক অর্থে তারানায় এই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই পুনরাবৃত্তি ভক্তমনকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আরবি ও ফারসি ভিত্তিক এই পুনরাবৃত্তি যেমন: দরা দরা দরতন, দরাত দরতন দরতন। এর অর্থ হচ্ছে হে ঈশ্বর আমার দেহের মধ্যে সমাহিত হও। এই যে অর্থবহুল শব্দ সেগুলো ব্যবহৃত হতো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যা ছিল পুরোটাই আধ্যাত্মিক। কিন্তু কালের বিবর্তনে এই অর্থবহুল শব্দগুলো অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়েছে।

আমীর খাঁ সাহেব বলতেন যে; কালান্তরে হজরত আমীর খসরুর সাহিত্যের ভাষা না বুঝতে পারার কারণে এবং সংগীতজ্ঞদের নিরক্ষর হওয়ার কারণে উচচারণ বদলে যেতে থাকে। আরবি-ফারসি ভাষার জ্ঞান না থাকায় অর্থের অনর্থ করার বদলে অনেক শিল্পী বাদ্যাক্ষর (ধা কিড়নগ, ধুম কিটতক ইত্যাদি) ব্যবহার করতে লাগলেন আর তারানার রূপ আমূল বদলে দিলেন। যেমন- 'য়ে য়লী য়লে য়লা য়লল্লে' আরবি ভাষার বোল। 'য়া আলী' কে সংক্ষেপে 'য়লী' অথবা 'আলক্ষা'কে 'য় ল ল' বলে গাওয়া হয়। তেমনি তু দানী কে আমরা 'তদানী' গাই।

ও দানী- সে জানে
তো দানী- (খুদা!) তুমি জানো। (তেজপাল, ২০০৫:১৪০)।

ওস্তাদ আমীর খাঁ (১৯১২-১৯৭৪) অত্যন্ত ভক্তির সাথে তারানা গাইতেন। প্রতিটি তারানার পর তিনি ফারসি ভাষায় রচিত এবং দার্শনিক অর্থবহুল শের গাইতেন। একথা অনস্বীকার্য যে, ওস্তাদ আমীর খাঁর তারানা গায়কী ছিল একেবারেই ভিন্ন। লয়ের সূক্ষ্ম এবং মধুর কারুকার্য গুলো তিনি এত সহজ করে পরিবেশন করতেন যে শ্রোতা এই জটিল গায়কীর কোন সংকেত পেতেন না বরং একাগ্রচিত্তে তাঁর গায়কীর আনন্দ উপভোগ করতেন। ওস্তাদ আমীর খাঁর তারানায় অন্য সকল গায়কীর মতো উত্তেজনা থাকত না। তিনি যখন 'য়লল লোম' শব্দগুলো গাইতেন তখন মনে হতো সৃষ্টিকর্তাকে তিনি স্মরণ করছেন এবং সেই ভাব নিয়েই তিনি তারানা পরিবেশন করতেন যা তাঁর গায়কীকে নব উদ্ভাবিত এক রূপ দিয়েছিল।

আমীর খাঁ সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য তেজপাল সিংহ ওস্তাদ আমীর খাঁর তারানা নিয়ে গবেষণাকালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শরীফ হুসেন কাশমীর (জন্ম ১৯৪৪, দিল্লি) সাহায্যে খাঁ সাহেবের গাওয়া তারানার শের গুলোর অর্থ এবং শব্দার্থ ও তার সঠিক উচ্চারণ বুঝতে সক্ষম হন যার বিবরণ তিনি তার রচিত পুস্তকে দিয়েছেন।

রাগ হংসধ্বনিতে একটি তারানা খুব গাইতেন খাঁ সাহেব। সেই তারানাটির সাথে এই ফারসি শের গাইতেন:

ইত্তিহাদীস্ত মিঞানে মনো তো
মনো তো নীস্ত মিঞানে মনো তো। (তেজপাল, ২০০৫:১৪১)।

এখানে ইস্তাহাদিস্ত বলতে বোঝানো হচ্ছে মিল হওয়া বা কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে। মিঞানে বলতে বোঝানো হচ্ছে মাঝখানে , মনো তো শব্দের অর্থ তোমার, নীস্ত অর্থ নেই। উপযুক্ত শব্দের ভিত্তিতে এই পুরো গানের যদি ভাবার্থ বের করা হয় তা হয় এইরকম– আমি তোমার নাম এত মনে করেছি যে আমরা দুজন এক হয়ে গিয়েছি এবং তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কটা এমন গড়ে উঠেছে যে আমাদের দুজনার মাঝে আর কোনো তফাৎ নেই। গানে এই ধরনের বাণীর ব্যবহারকে সুফি দর্শনের মতে তসররুফ বলে যা ভক্ত ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে একটি সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। ওস্তাদ আমীর খাঁ তাঁর তারানা গায়কীতে জীব ও পরমাত্মার এক হয়ে যাওয়ার এই ভাব অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন যা ফুটে উঠত তাঁর গায়কীতে।

রাগ যোগ-এর তারানার সঙ্গে যে শের গাওয়া হয় সেটি হলো–

বসন্ত ইন কীমতে খুসরো কে গূঈ
গুলামে রাএগানী রা ইন চিনীন অন্ত। (তেজপাল,২০০৫:১৪১)।

এখানে বসন্ত বলতে বোঝানো হয়েছে যথেষ্ঠ, ইন অর্থ এই, কীমতে অর্থ দাম, কে গূঈ অর্থ যা তুমি বলেছ, গুলামে অর্থ গোলাম, রাত্রগানী বলতে বোঝানো হচ্ছে বিনা মূল্যে আর রা ইন চিনীন অন্ত হচ্ছে— সঙ্গে এরকমই হয়। যার ভাবার্থ করলে এরকম হয় যে, তুমি যে মূল্য ধার্য করেছ তাই যথেষ্ট, বিনামূল্যে কেনা দাস বা গোলামের সাথে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক।

রাগ চন্দ্রকোষের তারানার ফারসি শের—

সূয়ে মন আ কে তুরা য়ার এ বফাদার মনম্
হর চে দারী বে নমা কে খরীদার মনম্। (তেজপাল,২০০৫:১৪২)।

এখানে সুয়ে অর্থ দিকে, মন অর্থ আমার, আ অর্থ এসো, কে হচ্ছে কারণ, তুরা অর্থ তোমার জন্য, যা এ বফাদার বলতে বোঝানো হচ্ছে বিশ্বস্ত বন্ধু, মনন অর্থ আমি, হর চে অর্থ যা কিছু, দারী বলতে বোঝানো হচ্ছে তোমার কাছে আছে, বেনমা মানে দেখাও, আর খরীদার হচ্ছে ক্রেতা। এই গীতের ভাবার্থ এমন দাঁড়ায়— যেহেতু তোমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু আমি তাই তুমি আমার কাছে এসো আর যেহেতু আমিই সবকিছুর ক্রেতা তাই তোমার কাছে যা কিছু আছে তা আমাকে দেখাও।

রাগ সূহা-র তারানার সঙ্গে খাঁ সাহেব ফারসি ভাষায় যে শের গাইতেন সেটি চতুর্দশ শতকের এক প্রখ্যাত শায়র হাফিজ রচিত-

সাকিয়া বরখেজ দর দেহ জামরা
খাক বর সর কুন গমে অইয়াম রা। (তেজপাল, ২০০৫:১৪২)।

আলোচ্য গীতে সাকিয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে ও সাকী, বরখেজ অর্থ ওঠো, দরদেহ জামরা অর্থ আমাকে পেয়ালাটি দাও, খাক অর্থ মাটি, বর হচ্ছে উপরে, সর বলতে বোঝানো হচ্ছে মাথা আর কুন হচ্ছে করে ফেলা। গমে অর্থ দুঃখ, অইয়াম অর্থ হচ্ছে নিত্যদিন। যার ভাবার্থ করলে এমন হয় - ও সাকী, তুমি উঠে এসে আমাকে পেয়ালাটি দাও আর এই প্রতিদিনের যে কষ্ট তার উপর মাটি চাপা দিয়ে সেই কষ্ট ভুলিয়ে দাও।

রাগ আভোগীর তারানার ফারসি শের—

বর্ জমীনে কে নিশানে কফে পায়ে তো বোব্দ
সাল হা সজ দ গহে সাহেব নজরান খাহদ বূদ। (তেজপাল, ২০০৫:১৪২)।

এই গীতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে বর অর্থ সেই, জমীনে হচ্ছে জমি বা স্থান , কে নিশানে হচ্ছে যেখানে চিহ্ন, কফে পায়ে হচ্ছে পায়ের তলা, তো অর্থ তোমার, বোরদ অর্থ হবে, সালহা শব্দের অর্থ বহু বছর ধরে, সজদা গহে হচ্ছে সিজদা বা প্রণাম করার স্থান, যার দৃষ্টি শক্তি আছে তাঁকে বলা হচ্ছে সাহেব নজরান আর খাহদবুদ শব্দের অর্থ হচ্ছে হবে। যার ভাবার্থ হয়- বহু যুগ বা বছর ধরে তোমার পদচিহ্ন যেখানে পড়েছে সেই স্থানটি সমঝদার ব্যক্তির জন্য সিজদার পীঠস্থান হয়ে থাকবে।

দরবারির তারানার সঙ্গে আমীর খাঁ সাহেব হজরত আমীর খসরু রচিত একটি ফারসি শের গাইতেন—

বে লবম্ রসীদ জানম তো বিয়া কে জিন্দা মানম
পস্ অজ আঁ কে মন ম মানম্ বে চে কার খাহী আমদ। (তেজপাল, ২০০৫:১৪২)।

এই গীতের শব্দগুলোর অর্থ এরকম— বে লবম অর্থ ঠোঁট পর্যন্ত, রসীদ অর্থ প্রাপ্তি, জনম হচ্ছে আমার জীবন, তো অর্থ তুমি, বিয়া হচ্ছে এসো, কে অর্থ যাতে করে, জিন্দা বলতে বেঁচে থাকাকে বোঝানো হচ্ছে, পস অজ আ অর্থ পরে তার, মন ন মানম অর্থ আমার অনুপস্থিতিতে, কাজী খাহী আমদ বলতে বোঝানো হচ্ছে আগমন হওয়া কে। গীতের ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়— আমি মরণাপন্ন, যখন আমি থাকব না তখন তুমি কার জন্য আসবে? তাই তুমি এসো যাতে আমি বেঁচে যাই।

রাগ গুর্জরী তোড়ীতে তারানার সঙ্গে এই শের গেয়েছেন খাঁ সাহেব—

হুসনে য়ূসুফ দমে ঈসা য়দে বহজা দারী।
অওঁ চে খূবাঁ হম্মে দারন্দ তো তন্হা দারী। (তেজপাল, ২০০৫:১৪৩)।

আলোচ্য গীতে হুসনে য়ুসুফ বলতে পয়গম্বর ইউসুফের মতো নূরাণী রূপের কথা বলা হয়েছে, দমে ঈসা বলতে বোঝানো হয়েছে যীশুর মতো জীবনী শক্তিকে, য়দে বজহা অর্থ হজরত মুসার মতো সাদা হাত, অও চে খুদা অর্থ মহাপ্রাণদের সব গুণাবলি, হম্মে দারন্দ অর্থ নিকটে আছে, তো অর্থ তোমার, তানহা দারী হচ্ছে শুধু নিজের আছে। এই গীতের ভাবার্থ এমন দাঁড়ায়— ইউসুফের মতো রূপ, যীশুর মতো জীবনী শক্তি, মুসার মতো শুভ্র হাত— সব মহাপ্রাণদের সকল গুনাবলি তোমার একার মধ্যে বিদ্যমান।

মারবা রাগের তারানার শের হচ্ছে—

হরম্ ও দয়ের কুজা ও দিলে দীবানে কুজা
জুজ পরস্তারিয়ে তো হীচ ন দানম্ অয় দোস্ত। (তেজপাল,২০০৫:১৪৩)।

এখানে হরম অর্থ হলো অন্তর, ও দয়ের কুজা অর্থ এবং কোথায় উপাসনার জায়গা, দিলে দিবানে কুজা বলতে বোঝানো হয়েছে কোথায় পাগল এই মন, জুজ পরস্তারিয়েতো শব্দের অর্থ হচ্ছে কেবল তোমারই পূজা বা উপাসনা , হীণ চ শব্দের অর্থ আর কিছু না, দানম হচ্ছে জানে এবং অয় দোস্ত অর্থ হে বন্ধু। আলোচ্য গীতের ভাবার্থ এমন হতে পারে— এই পাগল মন তোমার উপাসনা বা তোমার পূজা ছাড়া অন্য কিছুই জানে না।

ওপরের আলোচনায় বোঝা যায় যে, হজরত আমীর খসরু তারানায় যেসকল শব্দের ব্যবহার করতেন তা ছিল একেবারেই আধ্যাত্মিক ও ভক্তি রসে সিক্ত। যে সকল তারানা ওস্তাদ আমীর খাঁর গায়কীর দরুণ একটি নতুন মাত্রায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তারানা গীতশৈলীতে আকৃষ্ট হয়ে তারানা ভাঙা গান রচনা করেছেন। তবে এই ভাঙা গানে তিনি তারানার রাগ ও তালকেই ব্যবহার করেছেন। কাঠামোতে অর্থবোধক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি এক ভিন্ন মাত্রার তারানা ভাঙা গান রচনা করেছেন।

	মূলগান	ভাঙা গান	রাগ/তাল	পর্যায়
১.	অহো! আস্পর্দ্ধা একী	দারা দ্রিম তানানা	বেহাগ/ত্রিতাল	বাল্মিকী প্রতিভা
২.	ওই পোহাইল তিমির	তোম তানা তানা নানা	আলাইয়া/ত্রিতাল	বক্ষ সংগীত
৩.	চরাচর সকলি মিছে মায়া	দারা দ্রিম তানানা	বেহাগ/একতাল	প্রেম ও প্রকৃতি
৪.	সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারা দিম, দারা দ্রিম	নটমল্লার/ত্রিতাল	পূজা
৫.	হায় কে দিবি আর	তানানা দ্রে দ্রে	দেশ/ত্রিতাল	বক্ষসংগীত (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫:৬১১)

হংসধ্বনি রাগে গীত ওস্তাদ আমীর খাঁর একটি বিখ্যাত তারানার স্বরলিপি:

রাগ হংসধ্বনি ত্রিতাল

স্থায়ী : তা নোম তনন, তদীম তদেরে দাননী
তদ্রে দানী তননন য়লী য়ল ললল
অন্তরা : ইত্তিহাদেস্ত মিঞা নে মনো তো
মনো তো নেস্ত মিঞা মেনো তো । (তেজপাল,২০০৫:১৪৪)।

স্থায়ী

গ	—	গপ	রে	-রে	রে	স	স	প্	রে	-রে	রে	গ	গ	স	রে
তা	ऽ	ऽ	নো	ऽম	ত	ন	ন	ত	দী	ऽম	ত	দে	রে	দা	নী
গপ	গপ	নির্স	র্গর্রে	র্সনি	পপ	গরে	সস	প্	রে	-রে	রে	গ	গ	স	রে
তাऽ	ऽऽ	ऽऽ	নোऽ	ऽম	তऽ	নऽ	নऽ	ত	দী	ऽম	ত	দে	রে	দা	নী
গ	গ	গ	র্গর্রে	র্সনি	পপ	গরে	সস	প্	রে	-রে	রে	গ	গ	রে	স
তা	—	ऽ	নোऽ	ऽম	তऽ	নऽ	নऽ	ত	দী	ऽম	ত	দে	রে	দা	নী
গ	—	গ	র্গগ	র্গগ	র্রেস	নিপ	গরে	প্	রে	-রে	রে	গ	গ	স	রে
তা	ऽ	ऽ	নোऽ	ऽম	তऽ	নऽ	নऽ	ত	দী	ऽম	ত	দে	রে	দা	নী
গ	গপ	গরে	সস	র্সরে	র্সস	পপ	গপ	পপ	পপ	র্গ-	-র্রে	--	নিপ	গরে	সরে
ত	দ্রেऽ	দাऽ	নীऽ	তऽ	নऽ	নऽ	নऽ	য়ऽ	লীऽ	য়ऽ	ऽল	ऽऽ	লऽ	লऽ	লऽ
০				৩				×				২			

অন্তরা

			গ	—	প	র্স	—	র্স	—	—	র্সর্স	—	র্স	র্স	প
			ই	ऽ	ত্তি	হা	ऽ	দে	ऽ	ऽ	স্তऽ	ऽ	মি	এঞা	ऽ
—	পনি	র্রেগ্র	র্রে	র্সর্রে	র্সর্স	পনি	পপ	গপ	গরে	স	রে	স	স	গ	ऽ
ऽ	নেऽ	ऽऽ	ম	নোऽ	ऽऽ	তোऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽ	ऽ	ম	নো	তো	ऽ
প	-প	নি	নি	র্রে	—	গর্রে	র্সনি	পর্গ	গর্রে	পনি	নিপ	গপ	গরে	সরে	—
নে	ऽস্	ত	মি	এঞা	ऽ	নেऽ	ऽऽ	মऽ	নোऽ	তোऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽ
০				৩				×				২			

আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে যে, তারানার বাণী সম্পর্কে আমরা এতদিন ধারণা পোষণ করে এসেছি যে এগুলো নিছক অর্থহীন বাণী— যা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন নয়। এই শব্দগুলো সৃষ্টির পেছনে আধ্যাত্মিক এক ভাবনা ছিল যা হজরত আমীর খুসরু তাঁর পীরকে স্মরণ করার জন্য তাঁর গায়কীতে ব্যবহার করতেন। যা পরবর্তীকালে ফারসি ভাষার জ্ঞান না থাকায় অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়েছে। অন্য গায়কদের তারানা গায়কীতে দেখা যায় লয়ের আধিক্য এবং তবলার সাথে পাল্লা দিয়ে নানা ধরনের লয়কারীর সমাবেশে পূর্ণ কিন্তু তারানা গাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু দ্রুতলয়ে নিরর্থক শব্দের উচ্চারণ বা গায়কের জিহ্বার প্রদর্শন নয়। বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। একরকম জপ করার মতো। যা আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত শব্দ নিয়ে সৃষ্ট। এই শব্দগুলো জপের মাধ্যমে গাওয়াই ছিল তারানা গায়নের আসল উদ্দেশ্য। যা আমরা দেখতে পেয়েছি ওস্তাদ আমীর খাঁর গায়কীতে। আমীর খাঁর তারানা গায়কী ছিল সকলের চেয়ে ভিন্ন। তিনি তাঁর তারানা গায়কীতে যে সৌন্দর্য্য বোধ জনিত আভিজাত্যের প্রকাশ করেছেন তা ছিল অভূতপূধ।

উল্লেখপঞ্জি

উৎপলা গোস্বামী (১৯৯০)। *ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত*। সলিল সাহা, কলকাতা

করুণাময় গোস্মামী (১৯৯৫)। *সংগীত কোষ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *কুদ্‌রত রঙ্গিবিরঙ্গী*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:

তেজপাল সিং (২০০৫)। মীনা বন্দ্যোপাধ্যায় [অনু.] *সংগীতসূর্য উস্তাদ আমীর খাঁ*। কলকাতা : থীমা

দেবব্রত দত্ত (১৯৮৪)। *সংগীত তত্ত্ব*। কলকাতা : ব্রতী প্রকাশনী

প্রদীপ কুমার ঘোষ (২০১০)। *মধ্যযুগের সংগীত ও সংগীতজ্ঞ*। কলকাতা : শিবলিঙ্গ

নীলরতন বন্দোপাধ্যায় (১৯৬০)। *সংগীত পরিচিতি (পূর্বভাগ)*। সংগীত প্রকাশনের পক্ষে মীরা নাথ, কলকাতা

মোবারক হোসেন খান (১৯৮৮)। *সংগীত মালিকা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৫)। *গীত বিতান* (অখণ্ড)। ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা

আনন্দের ঝরনাধারায়ঃ উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

Abstract : Upanishad is the best instance of Indian wisdom. The influence of Upanishad is unending in Indian thought, religion, philosophy and literature. Upanishad shows the path of immortality from mortality, from the death to divinity, from the sorrow to bliss. Among us who are great and ever memorable, they are very much inspired by Upanishad. Particularly Rabindranath Tagore is wellversed in Upanishad. In his appearance, lifestyle, speech, poetry and songs flow the fountain of Upanishad, and this flow is of joy. A sincere effort to explore the flow of the fountain of joy in Upanishad and Rabindranath is the focus of this article.

বেদ ভারতের সর্বপ্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন। বৈদিক সাহিত্যের চারটি স্তর আছে– সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। সংহিতাভাগে আছে মন্ত্র বা কবিতার সমষ্টি। এই কবিতায় আছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সত্তার ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার স্তব-স্তুতি। ব্রাহ্মণভাগে আছে দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যাগ-যজ্ঞের কথা। এই যাগ-যজ্ঞে অনেক পশু উৎসর্গ করা হতো। আরণ্যকে আছে পশুবলিরূপ যজ্ঞকর্ম থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে জ্ঞান অনুসন্ধানের কথা। আর উপনিষদে আছে শুদ্ধ জ্ঞানের কথা। ইহজগৎ থেকে পরজগতে উত্তরণের কথা। কর্ম থেকে জ্ঞানে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, দুঃখ থেকে আনন্দে পৌঁছানোর কথা। দেব-দেবতা থেকে নিরাকার ব্রহ্মের কথা। সেই ব্রহ্ম যাকে পেলে, উপলব্ধি করলে সব পাওয়া হয়ে যায়। ভারতীয় মনীষায় ব্রহ্ম এক অসাধারণ আবিষ্কার, এক অনন্য উপলব্ধি। বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্ম নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। অরূপ ব্রহ্মের ওপর নানা গুণ আরোপিত হয়েছে। তাঁর একটি গুণ তিনি আনন্দময়। এই আনন্দময়তা বিভিন্ন উপনিষদে উপলব্ধ হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ এর দ্বারা নানাভবে প্রাণিত হয়েছেন ।

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে–

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ২/৩/১

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬: ৭২৭

তিনি মূর্ত আবার অমূর্ত। মর্ত্য এবং অমর্ত্য, স্থির এবং গতিশীল, সত্তাবান এবং সত্তাহীন। এখানে ব্রহ্মের দুটি রূপের পরিচয় মেলে। তাঁর অমূর্ত রূপ, সৃষ্টির পূর্ব রূপ। এই অমূর্ত রূপে তিনি অমৃত, স্থির, ইন্দ্রিয়াতীত। অমূর্তরূপই তাঁর অদ্বৈতরূপ।

কঠ উপনিষদে ব্রহ্মের এই অমূর্তরূপের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে এভাবে:

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১/৩/১৫

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ১১৪)

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অমূর্ত অবস্থায় ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন, যিনি শাশ্বত ও অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত, যিনি হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও নিত্যবস্তু– সেই আত্মাকে জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। ব্রহ্মের এই অমূর্তরূপ ইন্দ্রিয়াতীত, অদ্বৈতভাব। এই অদ্বৈত অবস্থায় ব্রহ্ম 'একমেব'। তখন তিনি নিঃসঙ্গ। অমূর্ত, অসঙ্গ, নিশ্চল, স্থাণুরূপ ব্রহ্মের আনন্দ নেই। তাই তিনি আপনাকে মূর্তরূপে সৃষ্টি করলেন। আনন্দই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা। আপনার একক অমূর্তরূপে দ্বৈতভাব আরোপ করে নানা রূপ-রস-বর্ণে বিচিত্র বিশ্বরূপে তিনি আপনাকে করলেন সৃষ্টি।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে:

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১/১

(অতুলচন্দ্র সেন,সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৩২৭)

সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। অন্য কিছু ছিল না। সেই আত্মা ইচ্ছা করলেন, বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হয়েছে এরূপ কথা:

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং
তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ৬/২/১

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৫৭৭)

এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশের পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। এখানে 'সৎ' কথাটির অর্থ 'যার অস্তিত্ব আছে'। বেদান্তশাস্ত্র এই সৎকে এক অখণ্ড সত্তা বলে বর্ণনা করেছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'– যা এক ও অদ্বিতীয়, যা সর্বব্যাপী, নিরাকার, বাক্যমনাতীত ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই ব্রহ্ম একাকী হয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করলেন। তিনি বহু হতে চাইলেন। এই বহু হওয়ার মধ্যে আছে আনন্দ। আনন্দ আস্বাদনের জন্য আনন্দ করার জন্য তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হতে চাইলেন। এই বহুরূপতা, আনন্দময়তা বিভিন্ন উপনিষদে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে,

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত।
তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তদপোঽসৃজত।
তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৬/২/৩

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৫৭৭)

তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব। তারপর তিনি তেজ অর্থাৎ অগ্নি সৃষ্টি করলেন। সেই তেজও সঙ্কল্প করলেন, আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়। তাহলে তিনি কী করে আবার বহু হন ? বেদান্ত মতে, মাটি থেকে যেমন নানা আকারের পাত্র তৈরি হয়, এও ঠিক তেমনি। বেদান্ত বলে, জগতের সকল বৈচিত্র্যের মাঝে সেই এক সত্য রয়েছে। সেই 'একই' ব্রহ্ম। তিনিই বৈচিত্র্যময় জগতের অধিষ্ঠান। সেই 'একই' বহু হয়েছেন। এই বহু হওয়াটা কিন্তু নামরূপের পরিবর্তন মাত্র। যেমন,

মাটি থেকে নানা আকারের পাত্র তৈরি হলেও মাটি মাটিই থাকে। তার কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনি এক ব্রহ্মই সব হয়েছেন– আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী সবকিছু।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটু ভিন্নভাবে এ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে :

> আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সো২নুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনো২পশ্যৎ সো২হমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততো২হংনামাভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতো২হমমিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রুতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বো২স্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মানঔষত্তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যে২স্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১/৪/১
>
> অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৬৮৯)

এখানে সৃষ্টিপূর্ব অদ্বৈত ব্রহ্মকে সঙ্গীবিহীন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পূর্বে আত্মা পুরুষরূপে বর্তমান ছিলেন। সেই আত্মা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। তিনি প্রথমেই বললেন, আমি আছি। এভাবে 'অহম্' নাম হলো। এজন্য এখনও লোককে সম্বোধন করলে সে প্রথমেই বলে 'এই আমি'। তারপর যদি অন্য কোনো নাম থাকে, তবে সেই নাম বলে। যেহেতু তিনি এ সকলের পূর্বে সমস্ত পাপ দগ্ধ করেছিলেন, সে জন্য তাঁর নাম পুরুষ। তিনি একা থাকতে চাইলেন না। এ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও বলা হয়েছে :

> স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। ১/৪/৩
>
> (অতুলচন্দ্র সেন,সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৬৮৯)

অর্থাৎ, তিনি আনন্দ পেলেন না। সেজন্য কেউ একা থেকে আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় অর্থাৎ সঙ্গী লাভ করতে চাইলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে :

> সো২কাময়ত – বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপো২তপ্যত।
> স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥ তৈত্তিরীয়, ২/৬/৩
>
> (অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ২৯৯)

সেই একক, নিঃসঙ্গ, অদ্বিতীয় সৃষ্টিপূর্বসত্তা যখন কামনা করলেন– তিনি জন্মগ্রহণ করে বহু হবেন, তখন তিনি তপস্যা করলেন। সেই তপস্যার বলেই এইসব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং তাতে প্রবেশ করলেন অর্থাৎ এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকট হলেন। এই সৃষ্টিপ্রবাহই ব্রহ্মের মূর্তরূপ। তাই মূর্তরূপের যেমন সৃষ্টি আছে, তেমন ধ্বংস আছে। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আছে। আবার অমৃতও আছে। এখানে অমৃত বলতে মৃত্যুহীন নয়; অমৃত আনন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূর্ত অবস্থায় ব্রহ্মকে আনন্দরূপ ও অমৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ উপনিষদের মতে, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুকে আনন্দের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় 'ব্রহ্মানন্দবল্লীতে' উল্লেখ আছে— আত্মার অবস্থান পর পর পাঁচটি কোষের মধ্যে ঘটে। এই পাঁচটিকে অতিক্রম না করে আত্মদর্শন ঘটে না। প্রথমটি অন্নময় কোষ। অর্থাৎ স্থূলবস্তু দ্বারা তৈরি কোষ। দ্বিতীয়টি প্রাণময়, অর্থাৎ নির্জীব স্থূল দেহে প্রাণের সঞ্চার। তৃতীয়টি মনোময়, অর্থাৎ প্রাণে সূক্ষ্মতাবোধের আবির্ভাব। চতুর্থটি বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ মনে বুদ্ধির সংযোগ। পঞ্চমটি আনন্দময়, অর্থাৎ মনের তৃপ্তিময়-সুখময় অবস্থা।

আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি অদ্বৈত থেকে দ্বৈতরূপ ধারণ করলেন। আপনাকে নিয়ে আপনার মাঝে গড়ে তুললেন বৈচিত্র্যের রসধারা। তাই তিনি রসময়। তিনি সৃষ্টিরসের আনন্দধারায়

আত্মমুগ্ধ শিল্পরসিক। তিনি স্রষ্টারূপে বিশ্বশিল্পী, বিশ্বরূপে শিল্প এবং দ্রষ্টারূপে মানবমনে শিল্পরসিক। আবার ভোগ্য-ভোক্তার সম্বন্ধরূপে তিনি শিল্পানুভূতির প্রকাশ। তিনিই আনন্দ, তিনিই রসস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে:

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। ২/৭/২

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৩০১)

তিনি রসস্বরূপ। জীব এই রসস্বরূপকে লাভ করে আনন্দিত হয়। কেই বা জীবনধারণ করত বা প্রাণধারণ করত যদি না এই আকাশ আনন্দের আধার হতো? দৃশ্যমান বিশ্বের ভিতর দিয়ে তিনিই আনন্দ আস্বাদন করেন।

গভীর জ্ঞানগর্ভ উপনিষদের এই বাণী। ব্রহ্ম রসযুক্ত তাই তিনি আনন্দময়। কেননা রসই আনন্দের সঞ্চার করে। ব্রহ্ম বিশ্বশিল্পী। তাঁর শিল্প আকাশপটেই বিধৃত। আকাশভরা সূর্যতারা ব্রহ্মেরই শিল্পকর্ম, তাঁরই আনন্দধারা। মানুষের মনের মাধ্যমে বিশ্বশিল্পী যেন আনন্দকে অনুভব করেন।

ব্রহ্মের আনন্দময় রূপ সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদে আলোচনা করা হয়েছে এভাবে:

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২/২/৭

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ২৩৪)

যিনি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে সব কিছু জানেন, এই বিশ্ব যাঁর মহিমা, সেই আত্মা, মানবাত্মাই ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় পুরী, মানবহৃদয়ে অবস্থিত আছেন। তাই হৃদয়াকাশের আর এক নাম ব্রহ্মপুর।

মনরূপে প্রকাশিত এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মদেহের চালক হিসেবে পরমাত্মা স্থূলদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে বাস করেন। বিবেকীরা তাঁকেই ভেতরে-বাইরে সর্বত্র উপলব্ধি করেন, যিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, যাঁর মহিমা দৃশ্যমান বিশ্বরূপে উপচে পড়ছে। অসাধারণ উপনিষদের এই কবিতা, অনন্য এর বাণী। সুগভীর চিন্তা প্রকাশের এক মাধ্যম। ব্রহ্ম কে ? এই বিশ্ব যাঁর মহিমা। কোথায় তাঁর অবস্থান ? সর্বত্র– তিনি বাইরে আছেন আবার ভেতরেও আছেন। তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। যিনি প্রকৃত আত্মোপলব্ধি করেছেন, তার দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতিই ব্রহ্মসত্তায় জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। তিনি উপলব্ধি করেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'– 'আনন্দরূপ, অমৃতরূপ যেন প্রকৃতিরূপে দৃশ্যমান বিশ্বরূপে উপচে পড়ছে।' শঙ্করাচার্যের ভাষায়– তখন তাঁর কাছে বিশ্ব তরঙ্গরাজি, আনন্দতরঙ্গে বা আনন্দলহরীতে রূপায়িত হয়। কেবল মানবের অন্তরে নয়; বিশ্বের প্রতি ধূলিকণায়, আকাশে-বাতাসে, তৃণরাজিতে, প্রকৃতির প্রতিটি সত্তায় তাঁর কাছে আত্মা বিরাজিত, মধুময়। তাই বৃহদারণ্যকের ঋষি নয়ন মেলে বিশ্বকে দেখেছেন মুগ্ধচিত্তে। তাঁর উপলব্ধিতে এ পৃথিবী মধুময়, মধু ছড়িয়ে আছে তার সবখানে । আর অমৃতময় এক সত্তা আনন্দরূপে সকল কিছুর মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর কাছে –

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং
পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং,
শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স
যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ বৃহদারণ্যক, ২/৫/১

(অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], ১৯৮৬ : ৭৩৬)

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময়, অমৃতময় শরীর পুরুষ– এই উভয় পুরুষই মধু। ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই অখিল বস্তু।

এখন উল্লিখিত সেই ব্রহ্মানন্দ কী, তার একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। এক যুবা পুরুষ। তিনি কেবল বয়সে যুবা নন, উপরন্ত তিনি সৎ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ, দ্রঢ়িষ্ঠ (সুগঠিত দেহ) এবং বলিষ্ঠ। ধনসমৃদ্ধ সসাগরা পৃথিবীর তিনি অধিকারী। তখন তাঁর যে আনন্দ হয়, তা মানুষের কাছে সর্বোত্তম আনন্দ।

এখানে মানুষের এই পূর্ণ আনন্দচিত্রের কল্পনা করা হয়েছে ব্রহ্মানন্দকে তুলনা করার জন্য। মানুষের এই পূর্ণ আনন্দকে একক ধরে নিয়ে তাকে একশ গুণ বর্ধিত করলে গন্ধর্বদের আনন্দের একক হয়। উল্লেখ্য, কামনাহীন বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও গন্ধর্বদের তুল্য। দেব-গন্ধর্বদের আনন্দের শতগুণ চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষদের আনন্দ। চিরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণের আনন্দের শতগুণ আজান স্বর্গবাসী দেবতাদের আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ হলো যজ্ঞের আহুতি গ্রহণকারী দেবতাদের এক আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ হলো যজ্ঞের আহুতি গ্রহণকারী দেবতাদের এক আনন্দ এবং কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষের আনন্দও সমপরিমাণ।

বর্তমান প্রবন্ধে উপনিষদের এই আনন্দবাদ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা আলোচনা করার পূর্বে রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষদের আবির্ভাবকাল এবং এর বিবর্তিত রূপ ও পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের শৈশব থেকেই উপনিষদের সাথে পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের পারিবারিক প্রার্থনা সভায় উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করা হতো। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অনেক মন্ত্র মুখস্থ করেছিলেন। এভাবে ছোটবেলা থেকে উপনিষদের প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তাঁর। কবির মতে, সেটা ছিল অনেকটা বাহ্যিক টান। এ সম্পর্কে তিনি *মানুষের ধর্ম* প্রবন্ধে বলেছেন :

> বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৬৫৩)

মূলত তাঁর প্রৌঢ় জীবনের শুরুতে উপনিষদের বাণী তাঁকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে তাঁর কবিসত্তায় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদের প্রধান তত্ত্বগুলি যেমন– ব্রহ্মতত্ত্ব, আনন্দতত্ত্ব, জন্ম-মৃত্যু তত্ত্ব, শ্রেয়তত্ত্ব, মানবিকতাবাদ প্রভৃতি গভীর দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করে কবি তাঁর নিজের রচনায় কবিতা-গানে- নাটকে- প্রবন্ধে নানারূপ দিয়েছেন। উপনিষদের ঋষি এবং তাঁদের বাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল আত্যন্তিক প্রীতি যা কবি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করেছেন তাঁর *নৈবেদ্য* কাব্যের ৫৭ নং কবিতায়:

> হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর
> তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
> ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
> অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,

বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ২৯৩)

কবি তাঁর 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালায় উপনিষদের অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে তা ব্যাখ্যা করেছেন শ্রদ্ধা সহকারে। এই বক্তৃতাগুলি তিনি বাংলা ১৩১৫ হতে ১৩২১ সালের মধ্যে দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলিতে তিনি নিজস্ব কথার অন্তরালে উপনিষদের অনেক বাণী ব্যাখ্যা করেছেন, তার দর্শনকে সহজ ভাষায় সকলের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। বৈদিক ঋষিদের মতো তিনি প্রকৃতির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আনন্দের অভিযাত্রী হয়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে অনুভব করেছিলেন মহাসত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি।

এখন আলোচনা করা যাক, উপনিষদের ঋষিদের আনন্দানুভূতির আনন্দধারা কীভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম, আত্মপরিচয় প্রভৃতি প্রবন্ধে, উপদেশমালায় এবং কাব্য, নাটক ও গানের মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। 'আত্মপরিচয়ে' 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মানবজীবনের স্রষ্টার তিনটি পর্যায়, তিনটি স্বরূপ স্মরণ করেছেন। সেগুলি হলো– শান্তম্, শিবম্ ও অদ্বৈতম্। তাঁর মতে শান্তম্ হলো নিরবচ্ছিন্ন সুখের পর্যায় (বাল্য ও কৈশোর), শিবম্ জীবনসংগ্রামের পর্যায় (যৌবন) এবং অদ্বৈতম্ হলো আনন্দের পর্যায়। এই পর্যায়ে জীবনের সুখ-দুঃখ সবকিছুতেই আনন্দ থাকে। এই আনন্দলাভের জন্য দ্বন্দ্ব জর্জরিত শিবম্ পর্যায়কে অতিক্রম করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে অখণ্ড দৃষ্টিতে অনুভব করেছেন। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, জন্ম-মৃত্যু সব নিয়েই মানবের অখণ্ড জীবন। জীবনে দুঃখ আছে, আছে না পাওয়ার নানা কষ্ট, রয়েছে আপনজন হারানোর শোক। কিন্তু কবি জীবনের এই নেতিবাচক অনুষঙ্গের সীমানা পেরিয়ে অনুভব করেছেন আনন্দলোকের আলিঙ্গন। কবির কাছে এ জীবন আনন্দময়, এ জগৎ আনন্দেরই যজ্ঞশালা। আর আনন্দের এই যজ্ঞশালায় তিনি নিমন্ত্রিত। এতেই তাঁর মানবজীবন ধন্য ও পুণ্য।

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৩৬)

এই আনন্দযজ্ঞে কবি তাই প্রাণের কান্না-হাসি দিয়েই গানে গানে বাঁশি বাজিয়েছেন। জীবনকে নিয়ে তিনি ইতিবাচক চিন্তা করেছেন। কোনো নেতিবাচক চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই আপনজনের মৃত্যুতে তিনি শোকে দুঃখবাদী না হয়ে দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন।

আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে । ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১৬৪)

দুঃখের তরী বেয়ে আনন্দসাগর পাড়ি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি তাঁর *গীতাঞ্জলি* কাব্যে –

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই
টানরে সবাই টান্ ।
বোঝা যতই বোঝাই করি

করব রে পার দুঃখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১৭)

জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন অখণ্ডদৃষ্টিতে। তিনি মনে করেন, খণ্ডদৃষ্টি দিয়ে জীবনের আনন্দরস অমৃতসুধা পান করা যায় না। জীবনের সুখ-দুঃখকে খণ্ডভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করলে তাতে এই অনন্ত সৃজনরহস্য অনুভূত হয় না। মানুষ যখন অখণ্ড ঐক্যসূত্র ধরে নিজেকে এই বিশ্বজগতের সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করে, তখন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সীমানা পেরিয়ে তার মাঝে নিত্য আনন্দ বিরাজ করে।

নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে
দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকে একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১৩৯)

সুখ আর আনন্দ এক নয়। আনন্দ সুখাতীত। সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, প্রীতি-বিদ্বেষ, জীবন-মৃত্যুকে জড়িয়ে যে মানবজীবন– তাই কবির আনন্দের লীলাক্ষেত্র। তাই আনন্দপিপাসু কেবল সুখকে নয়, দুঃখকেও হাসিমুখে বরণ করে নেয়। তার কাছে জন্ম কেবল আনন্দদায়ক নয়, মরণও আনন্দের অনুষঙ্গ– একান্তই আপনজন। 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান'।

তাই কেবল সুখকামনা করে দুঃখকে এড়িয়ে চললে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখ-দুঃখ উভয়েই আনন্দেরই উপাদান। তাই জীবনে আনন্দকে উপলব্ধি করতে হলে সুখ-দুঃখ উভয়কেই সানন্দে বরণ করতে হবে।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। ... সুখ কিছু হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। ...সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত – আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১৬১)

উপনিষদের ঋষির মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, কেবল আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তেই সৃষ্টিকর্তা এ বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। তাই ব্যবহারিক প্রয়োজন চরিতার্থ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সৃষ্টিকর্তা যেন মহান শিল্পী আর বিশ্বসৃষ্টি তাঁরই শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রসাহিত্যে সৃষ্টিকর্তা কখনও বিশ্বকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলছেন, কোথাও তাঁকে তুলনা করেছেন জাদুকরের পালার সঙ্গে, কোথাও বা তিনি নৃত্যপরায়ণ নটরাজ।

মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বজুড়ে যেন আপনমনে খেলছেন। উৎসর্গ কাব্যের ৩৮ নং কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সৃষ্টিকর্তা অশ্রুত এক গানের ছন্দে চিরকাল লীলা করছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন, আবার তাঁর হাতে হয় ধ্বংস। তিনি যেন ডান হাত থেকে একবার বাম হাতে এবং বাম হাত হতে ডান হাতে দোলা দিয়ে যান। নিজধন তিনি নিজ হাতেই যেন হরণ করছেন। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া তাঁরই খেলার ছন্দ। তাঁরই খেলার ছন্দে মিশে আছে আনন্দ আর ভালোবাসা।

চিরকাল একি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,

বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা –
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
.....
বহি সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১১৩-১১৪)

কবি তাঁর '*মহুয়া*' কাব্যের '*বোধন*' কবিতায় বিশ্বসত্তাকে 'নিত্যকালের মায়াবী' বলেছেন। এই কবিতার বিষয়বস্তু একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ে লিখিত। শীতে প্রকৃতি জীর্ণ-শীর্ণ জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। শীতের অলস প্রকৃতিতে চলে পাতা ঝরার খেলা। কিন্তু বসন্তের বোধনে মৃতপ্রায় প্রকৃতি কচি সবুজ পাতায় ফুলে ফুলে ভরে যায়। প্রকৃতিতে জাগে শিহরণ, যেন নবপ্রাণের বোধন। এই বিষয়কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দভাবনা ব্যক্ত করেছেন এই কল্পনা করে যে– বিশ্বসত্তা যেন এক নিত্যকালের মায়াবী। তাঁরই মায়ার খেলায় প্রকৃতি হয়ে যায় রিক্ত-নিঃস্ব। আবার তাঁর মায়াবী জাদুর স্পর্শে নবজীবন ফিরে পায় প্রকৃতি। বিশ্বসত্তা যেন নববর সেজে লক্ষ্মীকে জয় করে নিতে চায়–

নিত্যকালের মায়াবী আসি
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১০)

রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টিধারা যখন নৃত্য, তখন স্রষ্টা নৃত্যপরায়ণ নটরাজ। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু এসব নটরাজের নৃত্যের ছন্দ, তাঁর নৃত্যে উথলিত উচ্ছলিত হয় আনন্দ।

নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ –
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯২ : ২৯৫)

এ প্রসঙ্গে *গীতবিতানের* অন্য একটি গান উল্লেখ করছি ।

নৃত্যের বশে সুন্দর হলে বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুঃখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯২ : ২৯৪)

কবির কাছে আনন্দে ভরা মধুময় এ পৃথিবী। এখানে আনন্দের হিল্লোলে ভোরের আলো পাতায় পাতায় খেলা করে। আকাশভরা সূর্যতারা, নির্ঝরের স্রোতোধারা, নদী-সাগর-উপবন, মৃদুমন্দ শীতল বায়ু, শিশিরভেজা তৃণরাজি সকল কিছুর মাঝে আনন্দ খেলা করে। মানুষ সুন্দরের পূজারী। এ কারণেই প্রকৃতির মনোময় বর্ণময় দৃশ্যাবলি তাকে বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। প্রকৃতির অপরূপ রূপের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে। এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করে আনন্দে বিভোর হয় মন। তখন বিশ্বসত্তায় ব্যষ্টিসত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ব্রহ্মসত্তায় জীবসত্তা লীন হয়। ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডতা, তুচ্ছতা, সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত না হলে আনন্দকে উপলব্ধি করা যায় না। আনন্দপিপাসু মুক্তিকামী প্রকৃত সৌন্দর্যপ্রেমিক, তিনি প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে উপলব্ধি করতে পারেন ব্রহ্মসত্তাকে। পৌঁছে যান সুদূর স্বপ্নময় এক কল্পলোকে– যেখানে দুঃখ নেই, বেদনা নেই, ভয় নেই, হারাবার কিছু নেই– আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা ক'য়ে ॥
সে পুণ্যনির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখো সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯২ : ৭৭)

কবির সকল গান যেন আনন্দ রাগিণীর সুরে মিশে আছে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে এই মাটির পৃথিবী, তরুলতা, ঘাসে ঘাসে জীবন মরণের সীমানা পেরিয়ে আনন্দ হাসে তাদের সুরে। *গীতাঞ্জলি* কাব্যে কবির এ আনন্দকে আমরা দেখি –

যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৮৭)

উপনিষদের ঋষিদের গভীর তত্ত্বকথা আনন্দবাদ। তাঁরা গভীর অনুধ্যানে সৃষ্টিপ্রবাহকে আনন্দরূপ ও অমৃতরূপের প্রকাশ বলে ব্যক্ত করেছেন। যা বিমূর্ত ও গভীর আত্মতত্ত্বের বিষয়। উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রমানসকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে গঠন করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কাব্যশক্তি দ্বারা উপনিষদের আনন্দবাদকে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করে তুলেছেন– অসাধারণ উপমা প্রয়োগের কৌশলে। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে উপনিষদের ঋষিদের দেওয়া তত্ত্ব তিনি গভীরভাবে অনুধ্যান করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি *আত্মপরিচয়ে* একটি মন্তব্য করেছেন :

> আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি – কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ১৭৪)

রূপে রসে ভরা বিশ্বচরাচরকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত করে ভালোবেসেছেন সেই অসীমেরই সসীম প্রকাশ বলে। কোনো কিছু পরিহার নয়– সব কিছুতেই অধিকার; এড়িয়ে যাওয়া নয়– পেরিয়ে যাওয়া এ সবই তাঁর বলিষ্ঠ ইতিবাচকতার প্রকাশ। তিনি নৈরাশ্যবাদী নন, জীবনবাদী ও জীবনপ্রেমী। সত্য-শিব-সুন্দরের সার্থক উপাসক তিনি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দৌরস্তু নঃ পিতা' ৬/৩/৬ মন্ত্রটি কবির আরোগ্য কাব্যের একটি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি –
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে–
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৩৫)

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুর দোলাচলে বহমান মানবজীবন। এ জীবনে যেমন সুখ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুঃখ। জন্ম আছে বলেই তো মৃত্যু অনিবার্য। খণ্ড দৃষ্টিতে এই উপলব্ধি সম্ভব নয়। খণ্ড দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে বিশ্বসত্তার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দকে উপলব্ধি করা যায় না। যার খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি, তার সব কিছুতেই ভয়। তার শোকের অবসান নেই, মৃত্যুতে তার চরম ভয়। সবখানে তার দুঃখ। কিন্তু জগৎকে যিনি অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই জগৎকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জগৎসৌন্দর্যের প্রকৃত দর্শক, সত্য-সুন্দরের পূজারী, বিশ্বসত্তার আনন্দভাণ্ডারের অধিকারী। তিনি আনন্দলোকের যাত্রী, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি সবার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নেন। নিজ গণ্ডি পেরিয়ে বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে তাঁর আত্মা মন্দ্রিত হয়ে ওঠে।

> আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা – মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ। আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে, সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই', কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয় – আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না – পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৫৭৯)

এভাবে দেখা যায়, আনন্দের যে ঝরনাধারা উপনিষদে প্রবাহিত, রবীন্দ্রনাথের জীবনে জীবনবোধের প্রকাশে তা উচ্ছলিত তরঙ্গায়িত। এই আনন্দ ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, এই আনন্দ দেয় অপূর্ব এক প্রশান্তি। সৃষ্টি করে বিশ্বৈক্যবোধ – সমগ্র মানুষ, জীবজগৎ, জড়-অজড় সব কিছুর মধ্যে একই চৈতন্য উপলব্ধ হয়। এই উপলব্ধিতে সৃষ্টি হয় হিংসা-বিদ্বেষশূন্য এক অনির্বচনীয় আনন্দ। এ আনন্দে অবগাহন করে আমরা পবিত্র হব, পূর্ণ হব। এ ভুবন আনন্দময়। আজ এই হোক আমাদের প্রার্থনা– আনন্দসংগীতের ছন্দে আমরা নির্ভয়ে যাত্রা করব সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে। জীবনের সুখ-দুঃখ পেরিয়ে, সমস্ত স্বার্থ-দৈন্য ও জড়তাকে দলিত করে, জন্ম-মৃত্যু পেরিয়ে পথ আমাদের এগিয়ে চলুক সামনে... সামনে, শুধুই সামনে। এভাবে চলতে চলতে একদিন ঠিক পৌঁছে যাব আনন্দময় ভুবনে।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া –
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি –
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবন কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,

স্বার্থনিমগন কী কারণে ?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৯ : ৭৭)

উল্লেখপঞ্জি

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত] (১৯৮৬)। উপনিষদ। কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী

ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৯৩)। বাংলার বাউল। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস

ক্ষিতিমোহন সেন (২০১০)। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। কলকাতা : পুনশ্চ

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (১৯৮৭)। উপনিষদ ভাবনা, কলিকাতা : তারা প্রিন্টার্স

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৫)। তপোবন (শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্র-রচনাবলী- সপ্তম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড-৬। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। উৎসর্গ, রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড-৫। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। মহুয়া, রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড-৮। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। আরোগ্য, রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড-১৩। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড-১৪। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯২)। গীতবিতান। ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সংসদ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৮১)। উপনিষদের ভূমিকায় রবীন্দ্রমানস। কলিকাতা : নবশক্তি প্রেস

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৪১)। আমাদের পরিচয়। কলিকাতা : বীণা লাইব্রেরী

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (২০১৫)। উপনিষদের সন্দেশ। কলকাতা : নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* উপন্যাসে লোকজ উপাদানের রূপায়ণ

তাশরিক-ই-হাবিব*

Abstract : Syed waliullah is the first vibrant and modern fiction writer achieving very glorious position in the area of Bangladeshi fiction, by adding advanced sense of life, artistic excellence and impersonal attitude through his writing and thus created readers' conscious collision. At first he identified the distinct temperament and type of East-Bengal fiction and applied them following own styles in his short stories and novels. Family position, prominent reputation at social working circle, huge depth of study, dense passion about art-literature, dedication in writing and own cultural heritage-international linked up – all factors combinedly played a pivotal role to make a exceptional artistic intellect that he owned, was very rare in the area of Bangla literature. On the other hand, folklore of Bangladesh is very exuberant by the combination of huge elements of cultural diversity. His novel named *Lalsalu* is tremendously artistic, based on the rural life and folklore of East-Bengal. This article is based on the compact discussion about the mensioned topic.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। লেখক হিসেবে প্রাতিস্বিক জীবনভাবনা, সমুন্নত চেতনা ও আন্তর্জাতিক শিল্পবোধকে তিনিই বাংলাদেশের কথাশিল্পে সর্বাগ্রে ধারণের অনবদ্য নজির স্থাপন করেন। সমকালীন কথাশিল্পী শওকত ওসমান *দেশ* পত্রিকায় অভিমত জানিয়েছিলেন– 'বাঙালি-মুসলমানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা নির্মাণের দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁদের অন্যতম মহৎ কারিগর।[১] তাঁর *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস-ত্রয়ের কোনোটিই ঘটনাভুক কিংবা সংবাদপ্রিয় পাঠকশাসিত নয়; বরং মেধাবী হৃদয় আর আত্মসন্ধানী ব্যক্তির জন্য মূলত প্রতীক্ষাপ্রবণ।[২] অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ধরনের গদ্যরীতি, তীক্ষ্ণ-শাণিত ভাষা, শিল্পময় কৌশল ও অপ্রচলিত আখ্যানবিন্যাসের গুণে তাঁর উপন্যাসগুলো বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার পথনির্মাণ করেছে। সেকারণেই শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যপাঠক ও সমালোচকমহলেও তাঁকে নিয়ে আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ বাড়ছে।[৩] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ধর্মভাবনা ও সমাজচিন্তার অনন্য নিদর্শন তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালু*[৪] (১৯৪৮)। তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনার স্বরূপ অনুধাবনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ[৫] এ উপন্যাসের আদ্যন্ত লক্ষণীয়। শস্যহীন জনবহুল দারিদ্র্যপীড়িত যে অঞ্চলের বাসিন্দাদের কঠোর জীবনসংগ্রামের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে, এর নাম এতে অনুল্লেখিত। তবে এতে বিবৃত একাধিক দৃশ্যে সমগ্র দেশের উল্লেখ থেকে ধারণা করা সম্ভব, তিনি প্রকারান্তরে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলাকেই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট[৬] হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ফলে, মহব্বতনগর গ্রামটি নির্দিষ্ট স্থানিক ও

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভৌগোলিক সীমারেখায় গণ্ডিবদ্ধ না থেকে সম্প্রসারিত অর্থে সমগ্র দেশেরই রূপকে উন্নীত হয়। এ উপন্যাসে প্রকৃতিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের অদৃষ্টবাদী জীবনদৃষ্টি ও লোকজচেতনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধর্মাদর্শের অন্তর্গত আচারসর্বস্বতার সংঘাত রূপায়িত হলেও লেখকের শিল্পদৃষ্টি এক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন।[৭] এ উপন্যাসে বাঙালি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা চলে।

১. লোকসংস্কার

এ উপন্যাসে মহব্বতনগরের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া নারীর আচার-আচরণ, কৃষিকর্ম, গার্হস্থ্য ও অশুভ-অমঙ্গল, জ্বিন-ভূত সংক্রান্ত নানা লোকসংস্কার এতে লক্ষণীয়।

১.১ পীরকে ভক্তি ও মাজারপূজা

পীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন, তার অলৌকিক ক্ষমতায় ভক্তি নিবেদন, তার দোয়া-দরুদ পড়া পানি পান, তাবিজ ধারণের মাধ্যমে অসুস্থতা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এর অন্তর্গত। আউয়ালপুরের পীরের বৃত্তান্তে এসবের উল্লেখ লক্ষণীয়। লেখক জানিয়েছেন, সারা দেশেই পীরদের সফর শুরু হয় এমন সময়ে, যখন গৃহস্থদের গোলা নতুন ফসলে ভরপুর থাকে এবং আর্থিকভাবেও তারা স্বচ্ছল। গ্রামবাসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য পীরদের বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। মহব্বতনগর থেকে তিন গ্রাম দূরবর্তী আউয়ালপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব মিঞার বাড়িতে আগত জনৈক পীর সম্পর্কে নানা কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভাগ্যান্বেষণে তার পূর্বপুরুষদের এদেশে আগমনকাল স্মরণে রাখতে এক পাঠান বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে মিলিয়ে সেই দিনক্ষণ স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত, পারিবারিকভাবে ময়মনসিংহে বসবাসের সূত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারে সে অভ্যস্ত হলেও ভক্তবৃন্দের নিকট হতে সমাদর লাভের জন্য উত্তর ভারত থেকে উর্দু ভাষা শিখে আসে। যৌবনে তার দুচোখে আগুন জ্বলত, সে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এবং মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে, এমনকি সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতাও তার রয়েছে – এসব কাহিনি পীর হিসেবে তার মহিমাকে লোকসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করে। কাজেই তার উপস্থিতিতে মহব্বতনগরের ধর্মান্ধ মানুষেরা যখন মোদাচ্ছের পীরের মাজার ছেড়ে সেদিকে ধাবিত হয়, এ ঘটনা মজিদকে বহুদিন পর পুনরায় অস্তিত্বসংকটে ধাবিত করে। তাই আউয়ালপুরে আগত পীরের প্রতারণা জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য সে সমাবেশে উপস্থিত হয় এবং তার বিরাট ভক্তমণ্ডলীর ভাবোন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আসরের ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়িয়ে সেই পীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নামাজকে মকরুহ করছে, যার ফলে তারা গুনাহের ভাগীদার হচ্ছে – এ অভিযোগ তুলে মজিদ অবশেষে সেই পীরের ভণ্ডামিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে। এর ফলে অচিরেই মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের সঙ্গে উক্ত পীরের কলহ বাধে। ধর্মকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতার স্বরূপ উপস্থাপনায় লেখক এ উপন্যাসে সচেষ্ট। এ ঘটনার পরিণতিতে মহব্বতনগরের মাতবর খালেক ব্যাপারী সিদ্ধান্ত জানায়, এ গ্রামের বাসিন্দারা আউয়ালপুরের পীরের কাছে যাবে না। কাজেই তার প্রথম স্ত্রী আমেনা বিবি যখন দীর্ঘ সতের বছর দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়ে আউয়ালপুরের পীরের পানিপড়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন তাকে মজিদের নির্মম আচরণের পরিণতিতে মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগ মেনে নিয়ে সংসার ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে যেতে হয়। খালেক ব্যাপারীর কাছে মজিদ স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল, কেন সে আমেনা বিবির বিরুদ্ধে কঠোর বিধান দিয়েছে –'খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার

থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?' (সৈয়দ, ১৩৯২ : ৪৫)। মজিদের প্রতি আমেনা বিবির ভক্তি ছিল না। তবু পেটে বেড়ি পড়েছে বলেই সে সন্তান ধারণে অসমর্থ – মজিদের এরূপ সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য ছিল আমেনা বিবি। এ সমস্যার সমাধানের জন্য সে মজিদের নির্দেশ অনুসারে তার পড়া পানি গোসলের আগে পেটে মেখে, শুদ্ধ হয়ে মাজারে সাতবার ঘোরে। কিন্তু তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়। কেননা, মজিদ ধর্মপতি হিসেবে তার সংসার তছনছের পরিকল্পনাকে অবশেষে কার্যকর করেছিল খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তালাক পাঠানোর মাধ্যমে। ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের উপায় হিসেবে পীরবাদ, মাজারপূজা প্রভৃতি লোকসমাজে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তা এসব ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে মজিদ গ্রামবাসীর অজ্ঞাত মোদাচ্ছের পীরের মাজারের ব্যাপারে তাদের ভর্ৎসনা করে এবং এ বিষয়টিকে ভিত্তি করেই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চায়। গ্রামবাসীর ভাবনায় মোদাচ্ছের পীরের ব্যাপারে কোনো সংশয় জাগে না। কেননা, তারা ইতোমধ্যেই আউয়ালপুরের পীরকে স্রষ্টার মতো ভক্তি প্রদর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রবণতা আরো বাড়ে, যখন মজিদ মোদাচ্ছের পীরের কবরকে লাল সালুতে মোড়ানো দরগায় রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাত্যহিক নানা প্রয়োজনে গ্রামবাসীকে এর ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। তাহের-কাদেরের বাপকে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি বিতরণের নির্দেশ, কোনো প্রয়োজনে গ্রামবাসীর মাজার জিয়ারত করে মানত হিসেবে পয়সা বিতরণ, মাজারকে ঘিরে জিকিরের আয়োজন, আমেনা বিবির ওপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের পাশাপাশি তার বন্ধ্যাত্ব মোচনের উপায় হিসেবে সাতবার মাজার জিয়ারত করা, এমনকি জিনের আসরের প্রভাবে জমিলা মজিদের মুখে থুথু ছুঁড়ে মেরেছে – এ অভিযোগে তাকে সারারাত মাজারঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা প্রভৃতি ঘটনার অন্তরালে মজিদের অভিপ্রায় ছিল মাজারের প্রতি গ্রামবাসীর ভক্তি ও সমীহ বৃদ্ধি করা। মোদাচ্ছের পীরকে গ্রামবাসীর নিকট মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ভাবমূর্তিকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মজিদের পরিকল্পনায় তার স্ত্রী রহীমার পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। মজিদের স্ত্রী হিসেবে গ্রামের নারীমহল যে তার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য, সুচতুর মজিদ বিষয়টি জানত। তাই সে রহীমাকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে অভ্যস্ত করতে তৎপর ছিল। মজিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অসম্ভব বলেই হাসুনির মা তার বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহের অবসানের বিষয়টি রহীমার কাছে জানিয়েছিল। অন্যদিকে, গ্রামবাসীর মতো রহীমার চেতনালোকেও মোদাচ্ছের পীর ও তার মাজার ক্রমশই অস্তিত্বশীল হয়ে উঠেছিল।

১.২ নারীর আচরণ ও চালচলন সম্পর্কিত

পুরুষতন্ত্রের মূল অভিপ্রায়ই হলো যে কোনোভাবে হোক – পারিবারিক ও সাংসারিক গণ্ডিতে নারীকে আবদ্ধ রাখা। সেটি কখনোবা ধর্মীয় বিধানের ছলেই হোক, অথবা স্ত্রী-জননী-পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে নারীকে নির্দিষ্ট সাংসারিক ভূমিকা পালনে বাধ্য করার মাধ্যমে হোক। নারী যেন কখনো পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে না পারে, সে ব্যাপারে পুরুষতন্ত্র অত্যন্ত সচেতন। মজিদ মহব্বতনগরে আস্তানা গড়ে তোলার পর রহীমাকে যেভাবে বশীভূত করে ধর্মীয় রীতিনীতি মান্য করিয়ে – এর দ্বারা গ্রামবাসী অচিরেই প্রভাবিত হয়। কেননা, রহীমাও এ গ্রামেরই মেয়ে। কাজেই ধূর্ত ও শঠ মজিদের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় রহীমার ভূমিকা বরাবর স্বামীকে প্রভুর মতো মর্যাদা দান, তার আদেশ-নিষেধের শৃঙ্খলে নিজেকে আটকে রেখে পারলৌকিক কল্যাণের প্রত্যাশা। রহীমার স্বাধীন, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে প্রতিনিয়ত অবদমিত করার অভিপ্রায় ধর্মান্ধ মজিদের আচরণে, সংলাপে, লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে মজিদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, মোদাচ্ছের পীরের শিষ্যত্ব ও তার অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত কিংবদন্তিতুল্য প্রচার।

> ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, ... অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা– শেষে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ। ... মজিদের কথার বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়। ... মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। ... মধুরভাবে হেসে আবার বলে, ... অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে। (সৈয়দ, ১৩৯২ : ৯-১০)

এ উদ্ধৃতিতে লোকসমাজে ভূমিসংলগ্ন আদিম সংস্কারের প্রতি ভীতিব্যঞ্জক শ্রদ্ধাবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। মানুষ মাটির সন্তান, তাই তাকে মৃত্যুর পর মাটির বুকে আশ্রয় নিতে হয়। গর্বভরে দাপটের সঙ্গে মাটিতে হাঁটলে মৃত্যুর পর কবরে তাকে শাস্তি পেতে হবে – এরূপ ভাবনা রহীমাকে স্বীয় আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারেনি। কারণ, লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রতি লোকমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই কঠোর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয়। সেকারণেই এসবের প্রতি একধরনের ঔদাসীন্য বা নিষ্ক্রিয় মনোভঙ্গি সাধারণত তাদের আচরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অথচ মজিদ যখন সে বিষয়টিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত্যুত্তর শাস্তির অনুষঙ্গে, তখন রহীমার মনোলোকে ভীতিবোধ জাগ্রত হয়। ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি লোকসমাজের ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায় মজিদকে এরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

১.৩ জিন, ভূত-প্রেত সংক্রান্ত

অশরীরী শক্তি হিসেবে জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত, অসুর, দৈত্য ও বিবিধ অনিষ্টকারী প্রাণীর অস্তিত্বের ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। অরণ্যময়, প্রকৃতিনির্ভর, নির্জন প্রতিবেশে জীবনধারণের ফলে বহুকাল থেকেই মানুষের চেতনালোকে এসবের প্রভাব বিদ্যমান। এছাড়া লোকসাহিত্য, পুরাণ ও ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এদের উপস্থিতি থাকায় লোকসমাজের বাসিন্দারা তা মেনে চলে। বিশেষত, ব্যক্তির ও পরিবারের অনিষ্ট, আসন্ন বিপদ, আকস্মিক কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্রেকের অন্তরালে এসবের ভূমিকাকে দায়ী করা হয়। কেননা মানুষ অনিষ্ট ও প্রতিবন্ধকতাকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে চায়। এ উপন্যাসেও প্রসঙ্গটির উল্লেখ লক্ষণীয়–

ক. আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝখানে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি। ... কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ... রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। (সৈয়দ, ১৩৯২ : ৪২-৪৩)

খ. আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। ... জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। ... ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে ... হে কই? ... মাজারে। ... ও ভয় পাইব না? ... কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে। (সৈয়দ, ১৩৯২ : ৮৫-৮৬)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ভূত-প্রেত সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ধলা মিঞাকে কীভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, সেই ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তেঁতুল গাছ ভূত-প্রেতদের আশ্রয়স্থল, তদুপরি

আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝখানে জন্মানো গাছটিতে ব্রহ্মদৈত্য থাকে; এরূপ গালগল্প বহুদিন থেকেই গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেকারণেই অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধলা মিঞার নিকট অবাস্তব, অযৌক্তিক বিষয়ও কীভাবে বাস্তবতুল্য বলে গণ্য হয়, তা অনুধাবনের জন্য লেখক এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মহব্বতনগরের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি মজিদের সর্বাধিপত্য ও দাপটের স্বরূপ পারস্পরিক সংলাপে প্রকাশিত। ধর্মকে হাতিয়ার করে সে যেভাবে লোকসমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তার সমকক্ষ কেউ নেই। মহব্বতনগরের গ্রামবাসীর পাশাপাশি জ্বিন, ভূত-প্রেতদের নিয়ে গড়ে ওঠা যে অশরীরী জগতের অস্তিত্ব লোকসমাজে উপস্থিত, সেখানেও মজিদের একক কর্তৃত্ব স্বীকৃত বলে সে গ্রামবাসীকে ধারণা দেয়। মজিদের প্রতারক স্বভাব জমিলার কাছে ধরা পড়লে সে তার ধর্মীয় নেতৃত্বকে লাঞ্ছিত করে। পরিণতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মজিদ রহিমার কাছে জমিলাকে জিনেধরা নারী হিসেবে জ্বিনের গালগল্প শোনায়।

১.৪ অভিশাপ দেয়া ও দিব্যি দেয়া

লোকসমাজে অভিশাপ দেয়ার মতো সংস্কারের অন্তরালে একের অমঙ্গল কামনায় অন্যের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। পারস্পরিক সম্পর্কের বৈরিতা থেকে তাদের মধ্যে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, তা তাকে উদ্বুদ্ধ করে অন্যের অকল্যাণ বা অশান্তি ত্বরান্বিত করতে। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। তবু লোকসমাজে এ ধরনের আচরণ প্রচলিত – ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এরূপ ব্যক্তির নিজেকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে। যার দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তার উদ্দেশ্যে অভিশাপ উচ্চারণ করে সেই কাজ থেকে বিরত রাখার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে রয়েছে। এছাড়া কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি সাধিত হলে এর দায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর ওপর চাপিয়ে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যও অভিশাপ উচ্চারণের অন্তরালে বিদ্যমান। এছাড়া, নিজের অনিষ্ট চেয়ে কাউকে অনুরোধ করাও লোকসমাজে অশুভ ভাবনা হিসেবে স্বীকৃত।

ক. জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মত মেয়েটি যেন এ সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। ... মজিদ হঠাৎ ডাকে–বিবি শোন। তোমার লগে কথা আছে। ... বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি? (সৈয়দ, ১৩৯২ :৭৯)

খ. একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে, ... ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়। ... হঠাৎ রহীমা রুষ্ট স্বরে বলে ... অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে। (সৈয়দ, ১৩৯২ : ২৮)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মজিদের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার বয়সের অসম ব্যবধান, ধর্মাচারের দোহাই দিয়ে জোরপূর্বক জীবনের আনন্দ-উল্লাসকে পদদলিত করে স্বামী হিসেবে তার হুকুমের দাসীতে পরিণত করার বিরুদ্ধে জমিলার প্রতিবাদ একপর্যায়ে প্রথম স্ত্রী রহিমার অভিশাপরূপে বিবেচিত হয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পিতা-মাতার দাম্পত্য কলহে অতিষ্ঠ হাসুনির মা নিজের মৃত্যু কামনা করলে রহীমা ভৎর্সনার মাধ্যমে তাকে নিরস্ত করে বিপদের শঙ্কায়।

দিব্যি দেয়ার অন্তরালে সক্রিয় থাকে উচ্চারণকারীর বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করানোর অভিপ্রায়। সেকারণেই বিশেষ কারো নামে (প্রায়শই স্রষ্টা বা ধর্মীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কারো নামে) প্রতিজ্ঞা করা বা শপথ নেয়ার রীতি লোকসমাজে প্রচলিত।

> গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না [বুড়ি] তখন শেষ অস্ত্র হানে। –ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী–হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না। (সৈয়দ, ১৩৯২ : ১৭)

এ উদ্ধৃতিতে পিতা-মাতার দাম্পত্যকলহে অতিষ্ঠ হাসুনির মা নিজের মৃত্যু কামনা করলে রহীমা ভর্ৎসনার মাধ্যমে তাকে পুনরুক্তি করে। কেননা, লোকসমাজে এরূপ ধারণা প্রচলিত, কেউ নিজের বিপদের আশঙ্কার কথা অথবা নিজের অনিষ্ট কামনা করে অন্যকে জানালে তার বা তার পরিজনের কোনো বিপদ ঘটতে পারে।

২. লোকাচার

লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেই দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আবেগ, অনুভব, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধের সম্পর্কও জড়িত থাকে। মজিদ মহব্বতনগরে আসার পূর্বে গ্রামবাসীর সামষ্টিক আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ লোকাচারের নমুনা। বিয়ের আসরে ও ধান ভানার কালে মেয়েদের সমবেত গীত পরিবেশন, বাসররাতে নবদম্পতির ঘরে লুকিয়ে থেকে ঠাট্টা-তামাসা করা, ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষকদের মাঠে নাচ-গান করা, শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালির শরণাপন্ন হওয়া, শিরালির মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নগ্ন নৃত্য পরিবেশন প্রভৃতি ঘটনা থেকে গ্রামবাসীর সাংস্কৃতিক লোকাচারের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। মজিদ মহব্বতনগরে আসার পর এসব আচারকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, লোকজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার কখনো পরিচয় ঘটেনি। ধর্মকে আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য আজীবন লড়াই করে চলা মজিদ অস্তিত্বসংকটে ভুগতে থাকায় কৃষিজ সংস্কৃতির উৎসবমুখরতাকে অস্বীকারে সচেষ্ট থেকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

মহব্বতনগর গ্রামের কৃষিজীবী লোকসমাজে ধর্মের প্রভাব এতটাই প্রবল যে, এ জনগোষ্ঠী ফসলের বীজ বপন, ফসল বেড়ে ওঠার পরিবেশ, রোগ বালাইয়ের উৎপাত, খরা-অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির দাপট প্রভৃতির সঙ্গে নিয়তি, দৈব, স্রষ্টার রহমত বা গজব প্রভৃতি বিশ্বাসকে লালন করে। ফসলের প্রাচুর্যকে স্রষ্টার রহমত বলে সন্তোষ প্রকাশ, ফসল না হওয়া বা কোনো কারণে পরিবারের প্রতিপালনের জন্য ফসল কেটে ঘরে নেয়ার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়াকে স্রষ্টার গজব হিসেবে বিবেচনা প্রাচীন সংস্কার। এসব বহুযুগ ধরে প্রচলিত বলেই এর প্রতিকারার্থে তারা শিরালির মন্ত্র, ইমাম-মোয়াজ্জিন-ধার্মিক ব্যক্তির[৮] দোয়া-দরুদের শরণাপন্ন হয়। লক্ষণীয়, মজিদ মহব্বতনগরে আসার পূর্বে এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়াতে গ্রামবাসী নানা ধরনের গান গাইত ফসলের মাঠে। মজিদ আসবার পর তারা তাকে দিয়ে কখনো কোরান খতম পড়ায়, কখনো দোয়া-দরুদ পড়িয়ে মোনাজাত করিয়ে নেয় বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে। গ্রামবাসী মজিদের নিকট থেকে এসব ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হয়। সেকারণেই সে এ গ্রামে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রসারে উদ্যোগী হয়। এক্ষেত্রে মোদাচ্ছের পীরের মাজার স্থাপন করিয়ে তার উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় বিভিন্ন ধর্মাচারের অন্তরালে সক্রিয় ছিল। যেমন– গ্রামবাসীকে কলেমা ও বিভিন্ন দোয়া-দরুদ শিখতে খালেক ব্যাপারীর মক্তবে যাবার নির্দেশ দেয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ও রোজা রাখা, জনৈক বয়স্ক পুরুষ ও তার ছেলেকে জোরপূর্বক একত্রে

খৎনা দেয়া, সন্তানদের জন্মদান সম্পর্কিত কুৎসা প্রচারের অভিযোগে তাহেরের বাপকে স্বেচ্ছাচারপূর্বক জনসমক্ষে অপমান করে মাজারে পাঁচ পয়সার সিন্নি বিতরণের আদেশ দেয়া প্রভৃতি। এছাড়া যুবক ও বয়স্ক পুরুষদের দাড়ি রাখার নির্দেশ, নারীদের পর্দাপ্রথা মেনে চলার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা, মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে রূপালি ঝালরবেষ্টিত লাল সালুতে আবৃত করা, তার মাজারকে ঘিরে জিকিরের আসর বসানো, শিরনি রান্নার বন্দোবস্ত ও এতে গ্রামবাসীর সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পাকা মসজিদ নির্মাণের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি ঘটনায় মহব্বতনগর গ্রামের বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় লোকাচারের বিপ্রতীপ অবয়বকে লেখক স্পষ্ট করেছেন।

৩. লোকযান

এ উপন্যাসে লোকযান হিসেবে নৌকা, মহিষের গাড়ি এবং পালকির উল্লেখ রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলার সর্বত্রই জালের মতো অজস্র নদী ছড়িয়ে রয়েছে। তদুপরি বর্ষাকালে নিচু জলাভূমি ও ডোবা, ধানক্ষেত বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। এ উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রবেশের দিনের যে বর্ণনা রয়েছে, সেটি ছিল শ্রাবণের শেষভাগের নিরাকপড়া এক বিকেল। এমন দিনে গ্রামবাসী কোঁচ-জুতি নিয়ে নৌকায় চড়ে ধানক্ষেতে মাছ ধরে। তাহের-কাদের যেভাবে মাছ ধরছিল, তা থেকে বোঝা যায়, নৌকা চালনা ও মাছ ধরায় তারা পটু। অন্যদিকে শস্যহীন জনবহুল খরার দেশের বাসিন্দা মজিদ যখন কোরান মুখস্থ করে হাফেজ হয়ে পরিচিত কোনো মসজিদে ইমামতির সুযোগ না পেয়ে অবশেষে পরিবার-পরিজন ছেড়ে গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছায়, তাকে মহিষের গাড়িতে খড়ের গাদায় কয়েক রাত ঘুমিয়ে সেখানে যেতে হয়। লোকযান হিসেবে পালকির ব্যবহার অতীতে গ্রামে প্রচলিত ছিল, যার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। তবে মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষের পক্ষে পালকি চড়ার সামর্থ্য ছিল না। গ্রামের মাতবর খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী হিসেবে আমেনা বিবি পালকি ব্যবহারে বাধ্য। পালকি বৈষয়িক সমৃদ্ধি, সম্ভ্রম ও আভিজাত্যের প্রতীক। একারণেই ব্যাপারীর বাড়ি থেকে মজিদের বাড়ির দূরত্ব এক ঢিলের পথ হলেও আমেনা বিবি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারে না। পরপুরুষের সামনে পর্দাপ্রথা বজায় রাখতে খালেক ব্যাপারীর ইচ্ছা অনুযায়ী আমেনা বিবিকে পালকিতে চড়তে হয়। বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এলে, কখনো বা নাইয়রে বাপের বাড়ি যেতে আমেনা বিবি পালকি ব্যবহার করত। এমনকি সে যখন স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়, তখনও পালকিতে চড়েই বাপের বাড়িতে ফিরে যায়।

৪. লোকজ সংস্কৃতির রূপায়ণ

এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের লোকসংস্কৃতির পরিচয় উপস্থাপন লেখকের অভীষ্ট ছিল না। বরং ধর্মের মতো প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের চাপে তারা কীভাবে নিজেদের কৃষিজ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পথ থেকে সরে আসে, সেই ভাষ্য রূপায়ণে তিনি আগ্রহী। তবু মজিদ মহব্বতনগরে আসার আগে তাদের লোকসংস্কৃতির আভাস উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যে সংক্ষেপে আভাসিত। যেমন– কৃষকরা ফসলের মাঠে গলা ছেড়ে গান গায়। এতে মজিদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়। ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে সে প্রকারান্তরে নিজের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসেই মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। হাসুনির মা দ্বিতীয়বার নিকা করতে গিয়ে প্রতিবেশী মানুকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয় কারণ সে 'গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে' (সৈয়দ, ১৩৯২ : ১৮)। ফসলের মাঠে শিলাবৃষ্টি নামলে তারা

শিরালির ওপর নির্ভর করে। রহীমা ও জমিলা সূচিশিল্পে আগ্রহী। তারা ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করে, পাটি বোনে। গ্রামীণ নারীর পোশাক হিসেবে শাড়ির উল্লেখ থাকলেও অবস্থাপন্ন পরিবারের নারী আমেনা বিবি শাড়ির ওপর চাদরও পরিধান করে। জমিলা মেহেদি দিয়ে হাত রাঙায়, আয়নার সামনে বসে চুলে তেল দেয়, হাতে চুড়ি পরে। তানুবিবির নাকে নাকছাবি এবং রহীমার বালিকাবয়সে হলুদ শাড়ি ও নাকে নোলক পরে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি ছোটাছুটির প্রসঙ্গও উপন্যাসে রয়েছে। পুরুষদের নিত্যদিনের পরনের পোশাক হিসেবে লুঙ্গি ও জামার উল্লেখ থাকলেও মজিদ জুম্মার দিন বা জিকিরের সময় সাদা আলখাল্লা বা কোর্তার সঙ্গে পাগড়ি পরিধান করে। এছাড়া সে আতরও ব্যবহার করে। লোকখাদ্য হিসেবে এ উপন্যাসে চিড়া, গুড়, শিরনি, ফিরনি, খিচুড়ি প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এর পাশাপাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পান-সুপারি খাওয়ার প্রসঙ্গও লক্ষণীয়। গ্রামীণ সমাজে হুঁকায় ধূমপানের রীতি প্রচলিত থাকলেও এ উপন্যাসে শুধু মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর ধূমপানের একাধিক উল্লেখ রয়েছে।

৫. লোকভাষা

এ উপন্যাসের লোকভাষা চিহ্নিত করার প্রধান সমস্যা হলো, লেখক তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে এতে প্রতিপাদ্য করেননি। শস্যহীন জনবহুল খরাপীড়িত দরিদ্র অঞ্চল হিসেবে মহব্বতনগর গ্রামকে কোনো স্থানিক ভূগোলের গণ্ডিতে চিহ্নিত করা যায় না।[৯] সেদিক থেকে বলা চলে, মহব্বতনগর সমগ্র পূর্ব-বাংলারই প্রতিনিধি। তবু, গ্রামীণ লোকজ জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গিতে আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট। এ উপন্যাসের কুশীলবদের মুখের ভাষায় এমন কিছু শব্দের সমাহারও লক্ষণীয়, যা কালের প্রবাহে তাল মেলাতে না পেরে বর্তমানে অচল। পাশাপাশি, উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিবেচনায় রেখে লেখক নির্দ্বিধায় বিভিন্ন আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি মহব্বতনগর গ্রামের যে মুসলমান কৃষিজীবী লোকগোষ্ঠীকে রূপায়িত করেছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রভাব বরাবর লক্ষণীয়। তাই তারা নিজেদের আলাপচারিতায়, কথোপকথনে এসব আরবি-ফারসি শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করে। লোকজ সংস্কৃতির অন্তর্গত বিধায় ভাষিক উত্তরাধিকারের পরম্পরায় এসব শব্দ তাদের প্রাত্যহিক বাগভঙ্গিতে ঠাঁই পেয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনা ও কুশীলবদের অন্তর্লৌকিক সংবেদনারাশির ভাষ্য উপস্থাপনে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে শিক্ষিত ভদ্র নাগরিক সমাজে প্রচলিত কথ্য চলিত রীতির সঙ্গে ভাবগম্ভীর, ওজস্বী তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদকে ব্যবহার করলেও সংগত কারণেই গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে এর রয়েছে মেরুদূর ব্যবধান। এ উপন্যাসে পরিচর্যিত লোকভাষার উপাদান হিসেবে শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা উল্লেখযোগ্য–

৫.১ শব্দভাণ্ডার

দেশজ শব্দভাণ্ডার– টাল, ঢিমেতেতালা, উচক্কা, ঠাট, ধপাস, ঠায়, ল্যাট, ঢিলা, গতর, বালা, টক্কর, ঝাপটা, টেপা, ঢঙ, ভাতার, ঝাঁকুনি, লোহালক্কড়, হলকা, খুপরি, আচমকা, ছোকরা, গিরে, প্রভৃতি।

ক্রিয়া– লুটালুটি, ছুটোছুটি, দুমড়ে, ছাপিয়ে, ঝাড়ে, গোঙানি, হুনছস্, ঠ্যাঙা, জিরুচ্ছে, ডরায়, ছাপাইবার, আছড়াতে, গুমরায়, ভানা, টিপা, সটকাইছে, কুচকে, ঝেঁকে, ফাড়ে, প্রভৃতি।

বিশেষণ– ঝিম, জানপছান, নিশুতি, বিরাণ, নাচুনি, নুলা, ন্যাংটা, ফিরে, চড়া-পড়া, নিরাক, আলগোছে, টালখাওয়া, চিকনাই, স্যাঁতসেঁতে, খটখটে, ভাঁপসা, বতোর, আলি-ঝালি, প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়– ছলছল, খিলখিল, পিটপিট, কড়মড়, ঘেউঘেউ, ঠাস্ঠাস, চড়চড়, কুর-কুর, সপসপ, ঢকঢক, ধপধপ, গনগনে, সিরসির, জলজল, খচখচ, ট্যাঁ-ট্যাঁ, প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– বেটি>বিটি, ছেলে>পুত, মুছিবত>মছিবৎ, , সবাই>ব্যাক্ক, কেন>ক্যান, সেই>হেই, তাকে>তানারে>, মৃত্যু> মওত, খেয়েছিস>খাইছস, ছোঁয়া>ছোঁয়াচ, লুকাতে>লুকাইবার, চারটা>চাইরডা, প্রভৃতি।

৫.২ বাগধারা

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। (পৃ. ১৮)

সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। (পৃ. ১৯)

যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের। (পৃ. ৩২)

মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এদিকে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। (পৃ. ৩৯)

ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মত। (পৃ. ৪৪)

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার কৃষিজীবী লোকসমাজের চালচিত্র উপস্থাপনায় *লালসালু* বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। বাঙালি মুসলমানের ধর্মচেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্বরূপ অনুধাবনে এর গুরত্ব অপরিসীম। লোকসমাজের বহমান ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারার সঙ্গে বহিরাগত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা মিলেমিশে এতদঞ্চলের গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে নবতর রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল, এর শিল্পায়নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পক্ষপাতশূন্য-নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের পথিকৃৎ কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় এ উপন্যাসে প্রতিফলিত লোকজ সংস্কৃতির রূপরেখা গ্রন্থনায় স্বকীয় মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

টীকা

১. উদ্ধৃত, আবদুল আন্নান সৈয়দ, (২০০১) *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*, ঢাকা, অবসর, পৃ. ৩

২. সৈয়দ আকরম হোসেন, (১৯৯৭) 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা', *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৯১

৩. সমরেশ মজুমদার, (২০১০) "'লালসালু'-র পুরুষ চরিত্রানুসন্ধান", *লালসালু : নানা প্রসঙ্গ*, রবিন পাল (সম্পাদিত), কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ৪৫

৪. এ উপন্যাসের প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পর্কে দুজন সমালোচক জানিয়েছেন–

ক. ওয়ালীউল্লাহ্‌-র প্রথম উপন্যাস 'লাল সালু' লেখা শুরু হয় কলকাতায় ১৯৪৭ এর আগে, শেষ হয় ঢাকায়। কমরেড পাবলিশার্স থেকে লেখক নিজেই বার করেন ১৯৪৮-এ। প্রথম সংস্করণ সমাদৃত হয়নি। সৈয়দ আবদুল মকসুদ-এর মতে কারণ চারটি–বইটির প্রচ্ছদ জয়নুল আবেদীন-এর হলেও অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয় ছিল না, প্রকাশের পর পরই লেখক করাচি, তারপর নয়াদিল্লি চলে যাওয়ায় প্রচার হয়নি, উল্লেখযোগ্য কোনো সমালোচনা হয়নি, উপন্যাসটি কাহিনি ও বিষয়বস্তুতে ছিল ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারকে কটাক্ষ যা সে সময় লোকে পছন্দ করেনি। যাহোক বারো বছর পর ১৯৬০-এ ঢাকার 'কথাবিতান' থেকে 'লাল সালু'-র দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় এবং ১৯৬১-এ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ... বইটি উর্দুতে অনুদিত হয় ১৯৬০-এ, অনুবাদক কলিমুল্লাহ, প্রকাশক পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ। ফরাসীতে অনূদিত হয় ও প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-এ, প্যারিসের বিশিষ্ট প্রকাশনী – 'এদিশিও দ্যা সই' থেকে, L'arbre sans racines নামে, অনুবাদ করেন লেখকের স্ত্রী অ্যান-মারি থিবো। ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৯৬৭-তে ইউনেস্কোর উদ্যোগে, লেখকের অনুবাদ, Tree Without Roots নামে প্রকাশ লন্ডনের চ্যাটু অ্যান্ড উইনডাস থেকে। একই সময়ে অনুবাদ হল জার্মান ও চেক ভাষার (দুশান য্বাভিতাল-এর অনুবাদ), অল্প কিছুদিন পরে চেক ভাষায়, তার পর পূর্ব বার্লিন থেকে Baum Ohne Warzhein নামে। লেখকের মৃত্যুর পর অনুবাদ হয় ইন্দোনেশীয় এবং জাপানীতে। ফরাসী অনুবাদ

ফরাসী দেশ, সুইৎজারল্যান্ড, বেলজিয়ামে আগ্রহ তৈরি করে, অপরিচিত জীবনের এই উপন্যাস তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিন হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। ওই সব পত্র পত্রিকায় (বিদেশী) বইটির আলোচনা সমালোচনা বার হয়। তাছাড়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, সেনেগাল-এ এটি প্রশংসা পায়, বিক্রি হতে থাকে। ... 'লালসালু' এবং তাঁর ইংরেজি অনুবাদ Tree Without Roots কিন্তু হুবহু এক নয়। (রবিন পাল, (২০১০) রবিন পাল সম্পাদিত *লালসালু : নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ৮-৯)

খ. 'লালসালু' প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য– জুলাই ১৯৪৮। কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬০, কথা-বিতান, ঢাকা। তৃতীয় থেকে সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পর্যন্ত। অষ্টম সংস্করণ : নওরোজ কিতাবিস্তন, ঢাকা। (আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, অবসর, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৩)

৫. চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন–

সাহিত্যিক হতে হবে ব'লে লেখা ... সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেরবে তা-ই খাঁটি। "I want to write" মুসলমান সমাজ নিয়ে–আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সে দিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা–এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই। আমি আমার আঁকা ছবিতে সে-সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায়। [সৈয়দ আবদুল মকসুদ, (১৯৮১) *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র জীবন ও সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, মিনার্ভা বুকস, পৃ. ১৬৫]

৬. এ উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন–

একটি উপন্যাসের বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাবছি। একজন গ্রামের সাধারণ মানুষ যার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সে ব্যবসা হিসেবে বেছে নিল কবরপূজা। এ লোকটি কি রকম আচরণ করে তা আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোক হঠাৎ উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপর চুনকাম করে তার ওপর লালসালু বিছিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল। সরল বিশ্বাসী পথচারীরা চিরন্তন বিশ্বাসের ভারে এতই অভিভূত যে তারা নানাবিধ কামনায় সেখানে টাকা পয়সা দিতে লাগল। আমাদের দেশে এরকম দরগা কিন্তু অনেক গড়ে উঠেছে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না জানি, তবুও এ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে প্রসারের পথে। এইরকম একজন ব্যবসায়ীর চাতুর্যকে আমি আবিষ্কার করতে চাই, আবার মমতার মধ্যেও তাতে পেতে চাই। এটা কি করে সম্ভব হবে আমি জানি না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। (তানভীর মোকাম্মেল, (২০০০) *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, পৃ. ২৪)

৭. এ উপন্যাস সম্পর্কে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী মনের প্রবণতা জীবন-বাস্তবতার ভেতরের দিকে চ'লে যাবার। ... লালসালুতে প্রত্যক্ষ বাস্তবতাই প্রধান। লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান যেখানে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের চারিদিক ঘিরে অসম্ভব শক্ত অথচ অদৃশ্য একটি বেষ্টনী : মানুষ যেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নেয়, অলৌকিকত্বে যেখানে তার অগাধ বিশ্বাস। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই দৈবশক্তির লীলা দেখতে পায় সে, আর তাতে ভয় পায়, শ্রদ্ধা করে এবং কখনো কখনো ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। কাহিনী যতোই উন্মোচিত হতে থাকে ততোই দেখা যায় শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি। কেবলি কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস–সেই সঙ্গে তার অনিবার্য পরিণতি ভয় এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ–গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। ... বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতরকার চেহারা এরকমই। (শওকত আলী, (২০০৩) "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস", *শওকত আলীর প্রবন্ধ*, ঢাকা, শ্রাবণ, পৃ. ৩১)

খ. চারের দশক ও পাঁচের দশকের প্রথমদিকের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলোর ... ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সবচেয়ে প্রতিভাবান, সচেতন ও শক্তিশালী শিল্পী। সম্ভবত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এখনো (আটের দশক) তিনি তাই। ... জীবননিষ্ঠা ও আধুনিক শিল্প-প্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা ও দক্ষতা, স্নায়ু-ছেঁড়া সংযম ও পরিমিতিবোধ, নিচু ও নির্বিকার উচ্চারণ–আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌তে পাওয়া যায়। 'লাল সালু' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাস আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রবেশ করে। ... 'লাল সালু'ই সম্ভবত গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে দুর্মর, কুসংস্কার এবং ধর্মব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা। আমাদের বাঙালি মুসলমান গ্রামসমাজ এই প্রথম একজন নির্মম পর্যবেক্ষকের ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের হাতে বিশ্লেষিত হলো। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব একজন সমাজবিজ্ঞানীর কিন্তু ততোধিক বোধহয় একজন বড়ো

শিল্পীর। (হাসান আজিজুল হক, (২০০৩) 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা', *হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ-৪*, ঢাকা, সাহিত্যিকা, পৃ. ২১-২২)

গ. বাংলার মুসলমান ধর্মভীরু, এবং এক শ্রেণির মোল্লা, মোতাওয়াল্লি, ভণ্ডপীর এই জিনিসটাকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম -ব্যবসা করে। এই সমাজ-সত্যটাকে অবলম্বন করে আলোচ্য উপন্যাস লেখা হয়েছে। ... লাল সালু' উপন্যাসে দেখা যায়, ধর্ম সম্পর্কে এর লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোনো মোহ নাই। তবে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব কত গভীর সেটি তিনি দেখিয়েছেন। ... ধর্ম ও সমাজ এই উপন্যাসে জড়াজড়ি ও মাখামাখি হয়ে আছে। ... আমাদের গ্রামীণ সমাজ লৌকিক সমাজ। সেখানে ধর্ম আর লোকাচার, প্রথা, সংস্কার, লোক-বিশ্বাস একাকার হয়ে যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে এই জিনিসগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই সমাজদৃশ্যগুলি বড় বাস্তব মহিমায় উজ্জ্বল আর জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। [বশীর আল হেলাল, (১৯৮৯) "'লাল সালু' উপন্যাসে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ-বিশ্লেষণ", *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ*, মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত), ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশন, পৃ. ৩৮]

৮. সমালোচকের অভিমত–

সম্প্রদায়ে একজন ম্যাজিকম্যান থাকবে যে অশুভ শক্তিসমূহকে রুখবে, প্রায় প্রতিটি প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়েরই এ এক আদিম প্রথা। ভুঁয়ো মাজারের খাদেম মজিদ আদিম ম্যাজিকম্যানদের সেরকমই এক আর্কিটাইপ যেন। ... মোহব্বতনগর কৃষিভিত্তিক গ্রাম, তবে অধিবাসীরা আরো কৃষিজ। কৃষি ও জমির ভূমিকা নিয়ামক ও সর্বত্র অনুভূত। ধর্ম, খোদা ও (সামাজিক) উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিই তাদের উৎপাদন-প্রক্রিয়া, কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত ... "লালসালু"-তে আমরা দেখি ধর্ম ক্রমশই অবস্থান নিচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিপ্রতীপে। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সনাতন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই কৃষিজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। কিন্তু এদেশে উন্মূল, ও মূলত পণ্যবাণিজ্যভিত্তিক ইসলাম ধর্মের, একটা স্ববিরোধিতা রয়েই গেছে কৃষিভিত্তিক পূর্ববঙ্গের মুসলমান গ্রামীণ সমাজের স্বাভাবিক জীবনাচরণের সঙ্গে। কৃষিনির্ভর বাঙালি মুসলমানের পরিচয়-সঙ্কটের এটাও অন্যতম মূল অবজেকটিভ কারণ। যে সঙ্কট হয়তো আরো তীব্র হয় মজিদের আর্কিটাইপ-রূপী-পেশাদার-ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা ধর্মের লোকজ উপাদানগুলিকে অস্বীকৃতির চেষ্টায়। (তানভীর মোকাম্মেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬)

৯. এ উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শুধু কথা-শিল্পী ছিলেন না, ভাষা-শিল্পীও ছিলেন। ভাষা পরিচর্যায় তাঁর আগ্রহ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ করার সময় লালসালুর প্রথম সংস্করণের প্রকাশভঙ্গী, বাক্যগঠন ও বানানরীতিতে তিনি উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। লালসালুর ভাষার অন্য এক তাৎপর্য আছে–ভাষা প্রয়োগে যাথার্থ্য ও শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কারের প্রশ্নে লালসালুর শিল্পী যাথার্থ্যের দিকে ঝুঁকেছেন জীবন সংলগ্নতার কারণে। ভাষা-শিল্পী হিসেবে এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব। [মনসুর মুসা, (১৯৮৯) 'লালসালু : ভাষারীতি', *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ*, মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত), ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশন, পৃ. ৭৩]

খ. *লালসালু*-র শিল্পগৌরবের একটি প্রান্তবিন্দু এর ভাষা যা আরবি-ফারসি শব্দ, আঞ্চলিক বুলির ব্যবহার কিংবা ক্রিয়াপদ, নাম-প্রতিনাম পদের ব্যবহার- নৈপুণ্যের মধ্যেই কেবল সীমায়িত নয়। ... *লালসালু*-র ভাষা এ উপন্যাসের চরিত্রাবলির অভিজ্ঞতারই ভাষা; ঔপন্যাসিকের দেশকাল-সমাজ ও সময়-সচেতনতার শব্দরূপ (জীনাত ইমতিয়াজ আলী, (২০০১) *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, পৃ. ১১৩-১১৫)

গ. উপন্যাস হিসেবে লাল সালু'র যে পার্থক্য লেখকের অন্য দুই উপন্যাস থেকে আলাদা হয়ে ধরা পড়ে তা হলো সংলাপের পর্যাপ্ত ও যথাযথ ব্যবহার। কথোপকথন সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় হলেও কোন ধরনের পাঠকেরই তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। পরিমিত সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রায়ণে যে বৈচিত্র্য এসেছে তা 'লাল সালু'র এক লক্ষ্যযোগ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও সফলতা। (আবু রুশ্‌দ, (২০০৩) *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস*, ঢাকা, বাতায়ন প্রকাশন, পৃ. ৫৬)

ঘ. 'লালসালু উপন্যাসের ভাষা এর শিল্পরূপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ... আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের ফলে পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ অধিক সজীব হয়ে উঠেছে এখানে। সচেতন শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ভাষা ও শব্দ চয়ন করেছেন। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো সময়ে মজিদ বক্তৃতা দেয় সংস্কৃতগন্ধী পোশাকী ভাষায়। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে সে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার আরবি-ফারসি শব্দমালার ব্যবহারও লক্ষণীয়। (শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬)

উল্লেখপঞ্জি

আবদুল আন্নান সৈয়দ (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*। ঢাকা: অবসর

আবু রুশ্‌দ (২০০৩)। *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস*। ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন

জীনাত ইমতিয়াজ আলী (২০০১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

তানভীর মোকাম্মেল (২০০০)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

মমতাজউদদীন আহমদ [(সম্পা.] ১৯৮৯। *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশন

রবিন পাল [সম্পা.] ২০১০। *লালসালু : নানা প্রসঙ্গ*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা

শওকত আলী (২০০৩)। *শওকত আলীর প্রবন্ধ*, ঢাকা: শ্রাবণ

শিরীণ আখতার (২০০৪)। *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সৈয়দ আকরম হোসেন [সম্পা.] (১৩৯২)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

সৈয়দ আবদুল মকসুদ (১৯৮১)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র জীবন ও সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: মিনার্ভা বুকস

হাসান আজিজুল হক (২০০৩)। *হাসান আজিজুল হক রচনাসংগ্রহ-৪*। ঢাকা: সাহিত্যিকা

বাংলা ভাষায় লিখিত দাওয়াতপত্রের বাককৃতি ও বিনম্রতা বিশ্লেষণ

খন্দকার খায়রুন্নাহার*

Abstract : Speech act and politeness are notable among the practiced subject matters of pragmatics. In case of our daily communication, the quotes that we use, are assertive as well as one kind of functionality, which mainly indicates speech act. Politeness is expressed through a variety of expressions. From ancient time, politeness was common practice in human society. In every society, there are fixed rituals to express politeness, which is followed by the members of the society. In a civilised society, invitation letter is usually applied to invite someone. In light of speech act, the paper investigates how politeness is expressed in the invitation letter.

১. ভূমিকা

প্রসঙ্গ অনুসারে ভাষার ব্যবহার প্রয়োগবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। প্রয়োগবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম বাককৃতি (Speech act) এবং বিনম্রতা (Politeness)। সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বিনম্রতা (Politeness)। বিনম্রতার মাধ্যমেই সমাাজের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করা যায়। এটি এক ধরনের সামাজিক দক্ষতা। এই সামাজিক দক্ষতা প্রকাশ পায় মূলত বাককৃতির (Speech act) মাধ্যমে। যেকোনো ভাষিক সমাজে কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর অন্যতম মাধ্যম দাওয়াতপত্র। দাওয়াতপত্রের বাককৃতি (Speech act) এবং বিনম্রতার (Politeness) মধ্যকার সম্পর্ক এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

২. বাককৃতি কী?

ইংরেজি Speech act-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বাককৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানব সমাজে ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং রক্ষা করা। এখানে যোগাযোগ বলতে মূলত ভাববিনিময় যোগ্যতাকে বোঝাচ্ছে (Arif, 2011)। আমাদের দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করি। এই সব উক্তি বিবৃতি প্রকাশের পাশাপাশি এক ধরনের ক্রিয়াশীলতাও নির্দেশ করে, যেমন-আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, শুভেচ্ছা জানানো ইত্যাদি।

ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তাতে বাক্য বা উক্তির ক্রিয়াধর্মিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাষণগুলি একত্র করে *How to Do things with Words* (Austin, 1962) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়।

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অস্টিনের বাককৃতি তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে পরবর্তীকালে আরো গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তৃতভাবে বাককৃতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন জন সার্ল (Searle, 1969)। সাল-এর মতে, বাককৃতি মানব ভাষায় ব্যাপক বিস্তৃত এবং প্রভাবশালী বিষয়। বাককৃতিকে সার্লই প্রথম মানুষের মনোগত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ শুধু কিছু শব্দ বা বাক্যের সমন্বয়ে উক্তিই উচ্চারণ করে না, এগুলি দিয়ে শ্রোতাকে প্রভাবিতও করে। তাই তিনি বলেছেন, 'ভাষা বলার অর্থই বাককৃতি' (Searle, 1969:16)।

৩. বিনম্রতা ও ভাষাগত দিক

Politeness-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে শিষ্টতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য, ভদ্রতা, বিনম্রতা প্রভৃতি শব্দসমূহ অভিধানে পাওয়া যায়। শিষ্টতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য, ভদ্রতা প্রভৃতি শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। দ্ব্যর্থবোধকতা এড়িয়ে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের আলোচ্য প্রবন্ধে Politeness অর্থে 'বিনম্রতা' প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিটি ভাষিক সমাজে বিনম্রতার প্রয়োগ থাকলেও সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশ ভিন্নতর। বিনম্রতা অচিহ্নিত আচরণ, কারণ এটি প্রত্যাশিত বরং অতিবিনম্রতা বা অবিনয় চিহ্নিত আচরণ (Escandell, 1996:13)। পারিবারিকভাবেই এই সদগুণাবলির চর্চা করা হয় এবং ছোটদেরকেও শেখানো হয়। তবে বিনম্রতা প্রকাশেরও কিছু সমাজভাষাতাত্ত্বিক স্থিতিমাপ (Sociolinguistic Parameter) রয়েছে, যেমন: বক্তার বয়স, শিক্ষা, সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান প্রভৃতি (Kerbrat & Orecchioni, 2005)। এই স্থিতিমাপ অনুসারে বিনম্রতার ব্যবহার অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। আমাদের সংস্কৃতিতে পরিচিত বা অপরিচিত কারো সাথে দেখা হলে সালাম বা আদাব জানানো হয়, একে বিনম্রতা হিসেবে দেখা হয়। পশ্চিমাসমাজে কোনো কোনো অঞ্চলে অপরিচিত কারো সাথে সাধারণত আবহাওয়া নিয়ে কথা বলা বিনম্রতা মনে করা হয়। আসলে বিনয়ী হবার অর্থ মূলত একটি সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (Huang, 1997)। ভাষিক বিনম্রতা বিষয়ক তত্ত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম রবিন ল্যাকফ (Robin Lakoff), পেনেলোপ ব্রাউন (Penelope Brown), স্টিভেন লেভিনসন (Steven Levinson), জিওফ্রে লিচ (Geoffrey Leech) প্রমুখ। বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি, যেমন: অনুরোধ জানানো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অভিনন্দন জানানো, ক্ষমা প্রার্থনা, প্রশংসা করা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনম্রতা পরিলক্ষিত হয়।

৪. তত্ত্বগত বিবেচনা

এই প্রবন্ধে দাওয়াতপত্রের প্রায়োগিক বা প্রসঙ্গগত অর্থ পর্যালোচনায় দুই ধরনের তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে, প্রথমত, বাককৃতি (Speech act) তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত, বিনম্রতার (Politenes) তত্ত্ব।

৪.১ বাককৃতি তত্ত্ব সার্লের বাককৃতি তত্ত্বের আলোকে দাওয়াতপত্রের বাককৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পন্ন করা এবং এজন্য উচ্চারিত প্রতিটি উক্তির পেছনেই কোন না কোন অভিপ্রায় (Intention) থাকে। বাককৃতি সম্পন্ন করার জন্য সার্ল তিনটি সহকৃতির কথা বলেছেন (১৯৬৯), যেমন: প্রস্তাব কৃতি (Propositional act), নিবেদন কৃতি (Illocutionary act) এবং প্রতিক্রিয়া কৃতি (Perlucationary act)|

৪.১.১ প্রস্তাব কৃতি : যেকোনো উক্তি বা বাক্য যার মাধ্যমে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংজ্ঞাপন শুরু হয় তাই প্রস্তাব কৃতি। অর্থাৎ ভাষিক উপাদানকেই বলা হচ্ছে প্রস্তাব কৃতি। প্রস্তাব কৃতি কোনো নিহিত অভিপ্রায় ব্যতীত একা সংঘটিত হতে পারে না। তাই বলা চলে, নিবেদন কৃতির অভিপ্রায় (Intention) প্রস্তাব কৃতির মূল বিষয় হিসেবে কাজ করে।

৪.১.২ নিবেদন কৃতি : সার্ল এর সহকৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন কৃতি (Illocutionary act)। কোনো উক্তির মাধ্যমে আমরা যেসব কাজের ধারণা প্রকাশ করি , যেমন-আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদির পেছনে আমাদের অভিপ্রায় থাকে। উক্তির অন্তরালের এই অভিপ্রায় (Intention) হলো নিবেদন কৃতি যা সার্লের ভাষিক দর্শনের মূল উপাদান।

৪.১.২.১ নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাস : অস্টিনকৃত (Austin, 1962) নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিন্যাসের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে সার্ল (Searle, 1969) নিবেদন কৃতিকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা-বর্ণনামূলক (Representatives), আদেশমূলক (Directives), অঙ্গীকারমূলক (Commissives), প্রকাশমূলক (Expressives) এবং ঘোষণামূলক (Declaratives)। বর্ণনামূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে বক্তা সাধারণত প্রচলিত কোনো তথ্য শ্রোতাকে বলে থাকেন। আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তা শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করেন কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে। আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, প্রশ্ন, অনুরোধ, আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। অঙ্গীকারমূলক নিবেদন কৃতির মাধ্যমে বক্তা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার জন্য শ্রোতার কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। প্রতিজ্ঞা করা, কিছু প্রদান করা, প্রত্যাখ্যান করা, হুমকি দেওয়া এই শ্রেণির অর্ন্তগত। প্রকাশমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তার মানসিক অবস্থা, যেমন-আনন্দ, দুঃখ, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অভিনন্দন জ্ঞাপন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ, প্রশংসা করা এই শ্রেণির অর্ন্তগত। ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতির ক্ষেত্রে বক্তার অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক যোগ্যতা প্রয়োজন। কেননা ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতি উচ্চারণের সাথে সাথে পূর্বের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাউকে সমাজচ্যুত করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা, কাউকে মনোনীত করা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি ঘোষণামূলক নিবেদন কৃতির মধ্যে পড়ে।

৪.১.৩ প্রতিক্রিয়া কৃতি : শ্রোতা যদি বক্তার নিবেদন কৃতি শুনে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাহলে তাকে প্রতিক্রিয়া কৃতি বলে। সার্ল (Searle, 1969) প্রতিক্রিয়া কৃতিকে মানবীয় যোগাযোগের সর্বশেষ ধাপ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রতিক্রিয়া কৃতিকে লিচ (Lecch, 1999) নিবেদন কৃতির অভিপ্রায়গত ফল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪.২ বিনম্রতার তত্ত্ব

ভাষিক বিনম্রতার তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রদান করেন ব্রাউন এবং লেভিনসন (Brown & Levinson, 1978)। তাঁদের তত্ত্বের মূল বিষয় ছিল অভিব্যক্তি (Face), ইতিবাচক বিনম্রতা (Positive Politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (Negative politeness)। Face এর বাংলা 'মুখ', 'মুখমণ্ডল' হলেও এখানে 'অভিব্যক্তি' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে ব্যক্তির নিজস্বতা বোঝানোর জন্য। ব্যক্তির ব্যবহারগত এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা 'অভিব্যক্তি' ধারনার মধ্য দিয়ে ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। 'মুখ' 'মুখমণ্ডল' দিয়ে Face এর ঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না কারণ, 'মুখ',

'মুখমণ্ডল' নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করে। সুস্পষ্ট অর্থের জন্য 'অভিব্যক্তি' শব্দটি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রাউন এবং লেভিনসনের মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব অভিব্যক্তি (Face) রয়েছে। একে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা হিসেবে (Brown & Levinson, 1978)। চীনা ভাষাবিজ্ঞানী গু (Gu, 1990:238)-র মতে, অভিব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করাকে ব্যক্তিগত বিষয় অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তির নিজস্বতা বোঝালেও এর মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক বা আন্তঃসামাজিক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়। ইডি (Ide, 1993)-র মতে বিনম্রতা ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যমূলক চাওয়া এবং সমাজে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির দায়িত্ববোধের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ব্রাউন এবং লেভিনসন দুই ধরনের বিনম্রতার কথা উল্লেখ করেছেন (Brown & Levinson, 1978)। যেকোনো ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বা সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন নেতিবাচক বিনম্রতা, যেমন- দুঃখ প্রকাশ করা, অনুরোধ করা, ভুল স্বীকার করা, ধন্যবাদ জানানো প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, ইতিবাচক বিনম্রতা বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ড, যেমন-আমন্ত্রণ জানানো, অভিনন্দন জানানো, প্রশংসা করা, কিছু প্রদান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ব্রাউন এবং লেভিনসনের তত্ত্বে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অভিব্যক্তির হুমকি বা FTA (Face Threatening Act)। যেমন: কাউকে সরাসরি আদেশ করা FTA। কারণ এখানে শ্রোতার উপর বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যদি অপ্রত্যক্ষভাবে বলা হয় তাহলে FTA হ্রাস পায়। দেখা যাচ্ছে, ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব মতে, বিনম্রতার সাথে দুটি বিষয় জড়িত। একদিকে FTA হ্রাস করা, অন্যদিকে অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি করা। নেতিবাচক বিনম্রতায় FTA হ্রাস পায় কারণ বক্তা এক্ষেত্রে শ্রোতাকে কোনো বিষয়ে জোর করেন না বা সরাসরি আদেশ করেন না। বক্তা নেতিবাচক বিনম্রতার ক্ষেত্রে অনুরোধ বা পরোক্ষভাবে শ্রোতাকে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে বলে থাকেন। ইতিবাচক বিনম্রতায় বক্তার অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি পায়। কারণ বক্তা চান, তার সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা শ্রোতার মনে আছে তা যেন আরও বৃদ্ধি পায়।

জিওফ্রে লিচ (Lecch, 1983:58) ভাষিক বিনম্রতার ক্ষেত্রে ৬টি রীতি উল্লেখ করেছেন—বিচক্ষণ রীতি (Tact maxim), উদারতা রীতি (Generosity maxim), অনুমোদিত রীতি (Approbation maxim), মিতচারিতা রীতি (Modesty Maxim), চুক্তিবদ্ধ রীতি (Agreement Maxim) এবং সহানুভূতিগত রীতি (Sympathy Maxim)।

উল্লেখিত রীতিসমূহে বক্তা নিজেদের পছন্দ বা চাওয়াকে হ্রাস করে অন্যের পছন্দ বা চাওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্লাম এবং কুলকা (Blum & Kulka, 1982, 1985, 1989) বিনম্রতার তাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা প্রায়োগিক দিক নিয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বিনম্রতা ব্যাখ্যায় CCSARP (Cross Cultural Speech Act Realization) বা মিশ্র সাংস্কৃতিক বাককৃতি অনুধাবন প্রকল্প তৈরি করেছিলেন। বিনম্রতার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয় এমন দুটি বাককৃতির কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো, ক্ষমা প্রার্থনা (Apology) এবং অনুরোধ (Request)।

CCSARP এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিবেদন কৃতি একক উক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। বাস্তব জীবনে ক্রমবাচনের বা একাধিক উক্তির মাধ্যমে (Sequence of utterences) নিবেদন কৃতি সম্পন্ন হয়।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

উপরে বিশ্লেষিত তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ বাংলা ভাষার দাওয়াতপত্রে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য বাংলায় লিখিত একটি দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। দাওয়াতপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সর্বাধিক প্রচলিত দাওয়াতপত্র বিয়ের দাওয়াতপত্র। এই অঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অনুসারে দাওয়াতপত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়, যেমন— গায়ে হলুদের দাওয়াতপত্র, বিয়ের দাওয়াতপত্র, বিবাহোত্তর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্র ইত্যাদি। তবে ধর্মীয় রীতি অনুসারে দাওয়াতপত্রের ভাষাও ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মুসলিম রীতির দাওয়াতপত্র সর্বাধিক প্রচলিত। এক্ষেত্রে বিনম্রতা ও বাককৃতি বিশ্লেষনের জন্য একটি মুসলিম বিবাহোত্তর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে।

এ গবেষণায় উপাত্ত হিসেবে বিবাহোত্তর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্র নেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে লিখিত পত্রটি হুবহু উল্লেখ করা হলো।

চিত্র ১ : এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত নমুনা-দাওয়াতপত্র

বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় আমন্ত্রণকারী, আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি এক ধরনের নিবেদন বা অনুরোধ জ্ঞাপন করে থাকেন কাজেই এটি এক ধরনের বাককৃতি এবং আমন্ত্রণকারী হিসেবে তিনি দাওয়াতপত্রের শব্দ চয়নেও বিনম্রতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নির্বাচিত দাওয়াতপত্রে বাককৃতি এবং বিনম্রতা একই সাথে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে বাককৃতির প্রকৃতি এবং বিনম্রতার মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য এই দাওয়াতপত্র নির্বাচন করা হয়েছে এবং গৃহীত তত্ত্ব দুটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দাওয়াতপত্রের ভাষাগত, অনুষঙ্গগত এবং প্রায়োগিক দিককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এখানে মূলত বিবাহোত্তর সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে লিখিত দাওয়াতপত্রের উপাদান পর্যালোচনা তথা এক ধরনের নথি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাই এটি গুণগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কৌশল বলে বিবেচনা করা যায়।

৬. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

উল্লেখিত দাওয়াতপত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ও এখানে মোট আটটি অংশ রয়েছে, যথা- সম্বোধন, সামাজিক শিষ্টতা, তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা, আমন্ত্রণ জানানো, বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ, সাদর সম্ভাষণ এবং পরিশেষে রয়েছে আমন্ত্রণকারীর নাম। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হল।

সারণি ১ : দাওয়াতপত্রের কাঠামোগত অংশ বা পর্যায়

ক্রমিক নম্বর	টেক্সট	নিহিত অভিপ্রায়
১	জনাব	সম্ভোধন
২	আসসালামু আলাইকুম	সামাজিক শিষ্টতা
৩	তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা	তারিখ, সময়, অনুষ্ঠানের স্থান, বর-কনের পরিচয়
৪	বিনীত অনুরোধ	আমন্ত্রণ জানানো
৫	শুভেচ্ছান্তে	বিদায়ী শুভকামনা জ্ঞাপন
৬	প্রয়োজনে	কোনো দরকারে যোগাযোগ
৭	অভ্যর্থনা	সাদর সম্ভাষণ
৮	নাম	আমন্ত্রণকারীর পরিচয়

উল্লেখিত দাওয়াতপত্রের লিখিত ভাষিক উপাদানকে সার্ল (সারণি ১ এ উল্লেখিত টেক্সট) অনুসারে বলা হয় প্রস্তাব কৃতি। এই প্রস্তাব কৃতির অন্তরালে যে অভিপ্রায় রয়েছে সেটি নিবেদন কৃতি। প্রস্তাব কৃতির বর্ণনায় দেখা যায় শুরুতেই রয়েছে 'জনাব', এ টেক্সটটি সম্বোধন অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষিক রীতিতে শ্রদ্ধেয় কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে মুসলিম হলে 'জনাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যা এই দাওয়াতপত্রে উল্লেখিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সামাজিক শিষ্টতা। আমন্ত্রণকারী মুসলিম বলে ধর্মীয় কারণে 'আসসালামু আলাইকুম' ব্যবহার করেছেন। আমন্ত্রণকারী হিন্দু হলে এক্ষেত্রে 'আদাব' বা 'নমস্কার' ব্যবহার করতেন। পরের অংশে দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণকারী শ্রোতাকে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছেন কারণ এ তথ্যের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহীতাকে দাওয়াতপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন। তথ্যের মধ্যে রয়েছে তারিখ, সময়, কোথায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে প্রভৃতি। তারিখের ক্ষেত্রে রীতি অনুসারে একই সাথে বাংলা এবং ইংরেজি দিন, বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া যাদের উপলক্ষ্যে এ আয়োজন তাদের সম্পর্কেও পরিচিতিমূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রদান শেষে আমন্ত্রণকারী অনুরোধের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দাওয়াতপত্র বয়োজ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, সমবয়সী সবাইকে প্রদান করা হয় এ কারণে বিনম্রতাসূচক শব্দের মাধ্যমে আমন্ত্রণ

জানানোর রীতি প্রচলিত। পরবর্তী অংশে আমন্ত্রণকারী 'প্রয়োজনে' লিখে কয়েকটি ফোন নাম্বার প্রদান করেছেন, কোনো দরকারে আমন্ত্রণগ্রহীতা যেন প্রদত্ত নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন। দাওয়াতপত্রে 'অভ্যর্থনায়' ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা আছে, যাঁরা আমন্ত্রণগ্রহীতাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা জানাবেন। সামাজিক রীতি অনুসারে আমন্ত্রণগ্রহীতাকে 'শুভেচ্ছান্তে' টেক্সট এর মাধ্যমে শুভকামনা জানিয়েছেন এবং সব শেষে তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতপত্রের আটটি অংশের প্রধান অংশ তথ্য বা বিষয়ের বর্ণনা, কারণ-এর মাধ্যমে আমন্ত্রণগ্রহীতা পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

আমরা জানি যে, বক্তা যখন কিছু বলেন সার্লের তত্ত্বানুসারে তা দিয়ে কাজও নির্দেশিত হয়। এটি মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য লিখিত ভাষাতেও একইভাবে প্রযোজ্য। দাওয়াতপত্র মূলত লিখিত ভাষা, কাজেই এর মধ্য দিয়েও আমন্ত্রণকারী কোনো একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন এবং এই অভিপ্রায় হলো নিবেদন কৃতি। এই দাওয়াতপত্রে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় আমন্ত্রণগ্রহীতাকে আমন্ত্রণ জানানো। তারা একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন এবং অনুষ্ঠানে সবাই যেন উপস্থিত হয় সেজন্য এক ধরনের নিবেদন করছেন। এক্ষেত্রে নিবেদনটি অনুরোধসূচক। কারণ বিনীত অনুরোধের মাধ্যমে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হলে সাধারণত আমন্ত্রণগ্রহীতা সেটা উপেক্ষা করেন না।

দাওয়াতপত্রের প্রধান অংশ, যার মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়েছে (পরম করুণাময় .... আয়োজন করেছি), সার্লের নিবেদন কৃতির শ্রেণিবিভাগ অনুসারে এটি বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতি। কারণ বিবৃতিমূলক নিবেদন কৃতিতে বক্তা শ্রোতাকে যেকোন ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ কিছু তথ্য প্রদান করে থাকেন। কিন্তু শেষের অংশ (অনুষ্ঠানে উপস্থিত .... অনুরোধ জানাচ্ছি), যেখানে আমন্ত্রণকারীর মনোগত অভিপ্রায় 'অনুরোধ' প্রকাশ পেয়েছে তা সার্লের তত্ত্ব অনুসারে আদেশমূলক নিবেদন কৃতি। কেননা আদেশমূলক নিবেদন কৃতিতে আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, অনুরোধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সুতরাং সার্বিকভাবে এই দাওয়াতপত্রটি একটি অনুরোধমূলক নিবেদন কৃতির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আমন্ত্রণকারী দাওয়াতপত্রের প্রস্তাব কৃতি উপস্থাপন করেছেন মূলত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে। অভিপ্রায়টি বাস্তবসম্মত করতে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন কিন্তু আমন্ত্রণকারীর মূল অভিপ্রায় আমন্ত্রণগ্রহীতা যেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

আমন্ত্রণপত্রটি পাবার পর আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বা কোনো কারণে অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলেই প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হবে বলে ধরা হয়। আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণত দেখা যায়, আমন্ত্রণ পাওয়ার পর আমন্ত্রিত ব্যক্তি আমন্ত্রণ রক্ষা করে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন করে থাকেন।

বিনম্রতা তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, আমন্ত্রণকারী তার মেয়ের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় দাওয়াত দিচ্ছেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে সবাইকে সেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন। ব্রাউন এবং লেভিনসনের বিনম্রতা তত্ত্ব অনুসারে আমন্ত্রণকারীর যে গ্রহণযোগ্য অভিব্যক্তি (Face) রয়েছে তা সবার কাছে ধরে রাখতে চাচ্ছেন তার বিনম্র আচরণের মাধ্যমে। দাওয়াতপত্রটিতে বিভিন্ন ধরনের বিনম্রতাসূচক শব্দাবলির ব্যবহার রয়েছে, যেমন-'জনাব', 'আসসালামু আলাইকুম',

'বিনীত অনুরোধ', 'শুভেচ্ছান্তে' 'অভ্যর্থনা' প্রভৃতি। বাঙালি সমাজে সম্মানজনকভাবে কাউকে সম্বোধনের জন্য জনাব শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পরিচিত/ অপরিচিত কারো সাথে দেখা হলে ধর্মীয় রীতি অনুসারে সালাম বা আদাবের ব্যবহার রয়েছে আমাদের সমাজে প্রচলিত। কাউকে শুভেচ্ছা বা শুভকামনা জানানোও সামাজিক বিনম্রতার অংশ।'জনাব', 'আসসালামু আলাইকুম', 'শুভেচ্ছান্তে' 'অভ্যর্থনায়' শব্দগুলি ব্রাউন ও লেভিনসনের তত্ত্ব মতে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। কারণ এ শব্দগুলি ইতিবাচক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন: সম্ভাষণ, সৌজন্য, শুভকামনা জ্ঞাপন, অভিনন্দন জানানো প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে, 'বিনীত অনুরোধ' শব্দটি নেতিবাচক বিনম্রতার অন্তর্গত। কেননা আমন্ত্রণগ্রহণকারী যেন মনে না করেন তাকে যথেষ্ট সম্মান জানানো হয় নাই সে কারণে 'বিনীত অনুরোধ' শব্দটি আমন্ত্রণকারী ব্যবহার করেছেন। দাওয়াতপত্রটিতে দেখা যায় আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহীতাকে অনুরোধ করছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অর্থাৎ তিনি শ্রোতাকে জোর করছেন না। এখানে অপ্রত্যক্ষরূপ ব্যবহারের কারণে বক্তার FTA বা অভিব্যক্তির হুমকি যেমন হ্রাস পেয়েছে, একই সাথে 'জনাব', 'আসসালামু আলাইকুম', 'শুভেচ্ছান্তে' 'অভ্যর্থনায়' প্রভৃতি ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তার অভিব্যক্তিও (Face) বৃদ্ধি পেয়েছে।

লিচ ভাষিক বিনম্রতার যে ছয়টি রীতির উল্লেখ করেছেন দাওয়াতপত্রটি তার মধ্যে অনুমোদিত রীতির অন্তর্গত, কেননা অনুমোদিত রীতিতে বক্তা নিজে ছোট হয়ে শ্রোতাকে সম্মানিত করেন। এখানে বিনীতভাবে অনুরোধ করে আমন্ত্রণকারী আমন্ত্রণগ্রহিতার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। ব্লাম-কুলকা ও ওলশ্‌টেইনের (Blue-Kulka and Oishtain, 1984) CCSARP অনুসারে দাওয়াত পত্রের ডিসকোর্সে 'অনুরোধ' বাককৃতি পাওয়া যায়।

৭. পর্যালোচনা

অন্যান্য সমাজের মতো বাঙালি সমাজেও দাওয়াতপত্র প্রদান করা এক ধরনের সামাজিক সৌজন্য। এই সৌজন্য প্রকাশের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী এবং আমন্ত্রণগ্রহিতার মধ্যে এক ধরনের ভাষিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। এখানে ভাষিক যোগাযোগের পাশাপাশি সামাজিকতার চিত্রও ফুটে ওঠে। সামাজিক প্রাণী হিসেবে আমরা এক ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি, পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলি। এই রীতি-নীতির মধ্যেই রয়েছে আমন্ত্রণ বা দাওয়াত করা। আমরা যখন কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তা এককভাবে করি না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, সবাইকে একত্র করে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে সবার প্রতি সামাজিক দায়িত্ব যেমন পালন করা হয় আবার সবার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতৎও হয়। বিয়ে সংক্রান্ত যেকোনো অনুষ্ঠানে মনে করা হয় সবার উপস্থিতি বর-কনের নতুন জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনবে। সুদীর্ঘকাল থেকেই এই সামাজিক রীতি প্রচলিত। এই রীতির অংশ হিসেবে দাওয়াতপত্রের প্রচলনও অনেক আগে থেকেই রয়েছে।

দাওয়াতপত্রের প্রকাশ কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর লিখিত অংশটুকু বা প্রস্তাব কৃতি মূলত ডিসকোর্স। কেননা একাধিক উক্তি/বাক্যের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী তার আবেগ, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা আমন্ত্রণগ্রহীতার কাছে উপস্থাপন করেছেন। এই ডিসকোর্সে বেশ কিছু নির্বাচিত শব্দ

রয়েছে যা দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক শব্দ ব্যবহার করেন না অর্থাৎ তিনি লক্ষ রাখেন কেউ যেন তার শব্দচয়নে অসন্তুষ্ট না হয়। এজন্য বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণে আমন্ত্রণকারীর FTA বা অভিব্যক্তির হুমকি যেমন হ্রাস পায় একাই সাথে তার অভিব্যক্তিও (Face) বৃদ্ধি পায়। কারণ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে বক্তার FTA বা অভিব্যক্তির হুমকি যেমন হ্রাস পায়, একই সাথে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে ব্যবহারকারীর অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি পায়। ঠিক বিনম্রতাসূচক যোগাযোগের জন্য অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি এবং FTA হ্রাস দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিব্যক্তি দিয়ে ব্যক্তির নিজস্বতা বোঝালেও আন্তঃসামাজিক সম্পর্ক রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এটি প্রয়োজন।

সার্লের বাককৃতি তত্ত্ব অনুসারে নিবেদন কৃতি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয় তার একটি বাহ্যিক প্রকাশ রয়েছে,একে বলা হয় IFID (Illocutionary Force Indicating Device)। দাওয়াত পত্রের শেষের বাক্যে যেখানে আমন্ত্রণকারী অনুরোধ করেছেন সে বাক্যটির গভীর তল (Deep Structure) সংগঠন এমন ,

'আমরা আশা করছি যে/আমরা অনুরোধ করছি যে আপনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে শুভ কামনা জানাবেন।'

কিন্তু উপরিতল সংগঠনে (Surface Structure) বাক্যটি এমন না। কারণ বাংলা ভাষায় আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে ভাষিক প্রকাশ দাওয়াতপত্রের অনুরূপ হয়ে থাকে।

লিচ বিনম্রতার ক্ষেত্রে যে রীতিসমূহ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রতিটিতেই বক্তা নিজের পছন্দ/চাওয়াকে কম গুরুত্ব দিয়ে শ্রোতার পছন্দ/চাওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উল্লেখিত দাওয়াতপত্রের ক্ষেত্রে আমন্ত্রণকারী বিনীত অনুরোধের মাধ্যমে নিজে ছোট হয়ে আমন্ত্রণগ্রহিতাকে অধিক সম্মানিত করেছেন। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বিনম্রতা প্রকাশের জন্য কিছু সমাজভাষিক স্থিতিমাপ রয়েছে, যা বয়স, শিক্ষা, সংস্কৃতি অনুসারে ভিন্ন হয় অর্থাৎ সংস্কৃতি অনুসারে দাওয়াতপত্রের লিখনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত বিবাহোত্তর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্রে সার্ল এর বাককৃতি তত্ত্ব, ব্রাউন-লেভিলসন, লিচ, ব্লাম ও কুলকার বিনম্রতার তত্ত্বের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ বা পূর্বদেশীয় সংস্কৃতি অনুসারে আমাদের বাককৃতির মাধ্যমেই বিনম্রতার পরিস্ফূটন ঘটে।

৮. উপসংহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উক্তি বা উক্তি পরম্পরা ব্যবহার করি ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। উক্তি বা উক্তি পরম্পরার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করি ও বাককৃতি সম্পন্ন করি। একই সাথে সামাজিক জীব হিসেবে সংস্কৃতির ধারক বিভিন্ন বিনম্রতাসূচক শব্দও উক্তিতে ব্যবহৃত হয়। এসবের মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। দাওয়াতপত্র যেহেতু সামাজিক যোগাযোগের অংশ, এ কারণে এক্ষেত্রেও বাককৃতি ও বিনম্রতার সফল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

Arif, Hakim. (2011). *Bengali everyday emblematic (BEF) hand gestures: A Pragmatic approach*. Berlin. Berlin Technical University. An unpublished PhD Thesis.

Austin, John Langshaw. (1962). *How to Do thing with Words*. Oxford: Oxford University Press.

Blum- Kulka and Olshtain, E. (1984). Request and apologies: A cross Cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). *Applied Linguistics*. 5 (3) : 196-213

Brown. P and Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage* : Cambridge : Cambridge University Press.

Gu. Y. (1990). Politeness Phenomena in modern Chinese. *Journal of Pragmatics3* : 237-257.

Huang. Y. (2008). Politeness Principle in cross cultural communication. *English Language Teaching*. Vol. 1, No. 1, 96-101

Ide, S. (1993). *Formal Forms and Discernment : Two Neglected Aspects of Universals of linguistics* politeness. Multilingua : 8 : 223-248

Karbrat, C & Orecchioni. (2004). Politeness in France: How To Buy Bread Politely.In Icky, Hicky, L& Stewart, M(eds). *Politeness in Europe*, 29-44, Great Britain: The Cromwell Press Ltd.

Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.

Searle, John R. (1969). *Speech Acts. An easy in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press

Vidal, Escandell. (1996). Politeness in Germany : Politeness in Germany? Hicky, L &Stewart, M (eds). *Politeness in Europe*, 13-27. Great Britain: The Cromwell Press Ltd.

বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা অর্জনের প্রারম্ভিক পর্বের বাক্য গঠনের রূপ বিশ্লেষণ

মিথুন ব্যানার্জী*

Abstract : This study aims to investigate the syntactic structures of 18 months to 24 months old Bengali children by focusing on the verb morphology that plays a vital role in syntactic acquisition. Bengali children start acquiring the verb at their two-word utterance stage and, in course of time, they become fully equiped with Bangla verb morphology. This research has attempted to analyse the morphosyntactic features of Bangla verb found in their speech and has identified their relevant theta roles and argument structures. Along with this, the present study also includes the overt and covert forms of Bangla verbs used by the Bengali children to identify the acquisition gaps of learning the sentence structures.

ভূমিকা

মানুষ জন্মের পর সহজাতভাবেই ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। ভাষা আয়ত্তীকরণ একটি ক্রমধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানব শিশুর ভাষা অর্জন এতই প্রাকৃতিক যে মানব শিশু নিজের মাতৃভাষার প্রতিটি ব্যাকরণিক উপাদান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে থাকে। অন্যান্য ব্যাকরণিক উপাদানের মধ্যে মানব শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ভাষার ক্রিয়ারূপ আয়ত্তীকরণ। সাধারণভাবে, শিশুরা তাদের ১৫ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম ভাষার (first language) ক্রিয়ারূপ আয়ত্তীকরণ শুরু করে এবং শিশুর ২৪ থেকে ২৬ মাস বয়স পর্যন্ত সময়কে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণিক উপাদান অর্জনের প্রারম্ভপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে (Brown, 1973; Clark, 1992)। প্রত্যেক শিশুর ভাষা অর্জনই যেহেতু প্রকৃতপক্ষে অনন্য এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, সেহেতু বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুর বয়স পরিসর নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সংকীর্ণ সময়পর্বকে বেছে নেওয়া হয়েছে; যেখানে নিশ্চিতভাবেই অংশগ্রহণকারী শিশুর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যতাত্ত্বিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, অংশগ্রহণকারীর বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৮ মাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারীর বাক্যিক প্রকাশ নিশ্চিত করা যায়। অপরদিকে, অংশগ্রহণকারীর বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যাপ্তির বয়স তথা ২৪ মাসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়পর্বে বাঙালি শিশুদের অর্জিত ভাষার বাক্যসমূহের গঠনগত বিশ্লেষণকে সমন্বয় করা হয়েছে। সুতরাং, বলা যায় যে, বর্তমান প্রবন্ধে প্রথম ভাষা অর্জন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্বকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং বাক্যের আর্গুমেন্ট বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে ন্যূনতাসূচক কাঠামো (minimalist framework) ব্যবহার করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. শিশুভাষার বাক্যতাত্ত্বিক স্তরের প্রারম্ভ পর্যায়

শিশু ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক স্তরের সূচনাপর্বে ক্রিয়ারূপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু শিশুরা বাক্য আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক ধাপে অর্থাৎ বহুশাব্দিক স্তরে নামবাচক শব্দের সঙ্গে ক্রিয়াররূপের সমাবেশ ঘটিয়ে সরল ও নাতিদীর্ঘ বাক্য তৈরি করে। আবার একইসঙ্গে শাব্দিক ক্যাটেগরি (category) ও ফাংশনগত (function) কারণে ভাষায় যে কোনো দৈর্ঘ্যের বাক্যের ক্রিয়ারূপেরই রূপবাক্যতাত্ত্বিক (morphosyntactic) নির্দেশনাকে মেনে চলতে হয়। যা বাংলা ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাই যেকোনো মানবভাষার শিশুর বাক্যিক উন্নয়ন আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ারূপসমূহের রূপবাক্যতাত্ত্বিক বিবেচনা একইসঙ্গে ভাষিক উপাদানগত এবং ভাষাবৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বাঙালি শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাক্যিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্বে বাঙালি শিশুরা multi-word utterance তথা বহুশাব্দিক উচ্চারণ শুরু করে যা দুই শাব্দিক স্তর হিসেবে পরিচিত। এই সময় শিশুরা শব্দ সমন্বয় (word combination) করতে শুরু করে। শিশু এই দ্বি-শাব্দিক স্তর থেকেই শব্দগুলো নিয়ে বাক্য তৈরির চেষ্টা করে। এই স্তরটিকে শিশুদের পরবর্তী ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এই পর্বে শিশুদের কথায় অনেক ব্যাকরণিক চিহ্নই (grammatical marker) অনুপস্থিত থাকতে পারে। শিশুদের এই স্তরে ব্যাকরণিক চিহ্ন ব্যতীত বাক্য গঠনকে ব্রাউন (Brown, 1973) এবং ফ্রেজার (Fraser, 1963) 'telegraphic speech'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, টেলিগ্রাম বার্তার মতো যে সকল ভাষিক উপাদানের অনিবার্যতা অপেক্ষাকৃত গৌণ, সেগুলো শিশুরা উহ্য রাখে। তারবার্তা সদৃশ শুধু নির্যাসটুকু তারা সংজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। শিশুরা সাধারণত এই সময়ে বদ্ধ-শ্রেণির (closed-class) শব্দসমূহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। যেমন : পদাশ্রিত নির্দেশক, সহায়ক ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি; অন্যদিকে মুক্ত শ্রেণির (open class) শব্দ যেমন: বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং বিশেষণ– শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাউন (Brown, 1973,pp. 78-79) এক গবেষণায় উল্লেখ করেন, একজন ইংরেজি ভাষী শিশু ইভা এই পর্যায়ে বলছে: 'chair broken'। আবার যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাকে ভাষার আদর্শ রূপ শেখানোর জন্য বলছেন 'The chair is broken'। ইভা তা সমর্থন করে নিজে বলার সময় আবারও বলছে 'chair broken'। ইভার এই প্রবণতা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভাবপ্রকাশের জন্য বদ্ধ শ্রেণির (closed class) শব্দকে সে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছে না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ইভার উচ্চারিত বাক্যে সবগুলো উপাদান উপস্থিত না থাকার কারণ হিসেবে বিশেষ প্রকৃতির বাক্যিক ফাংশনাল উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা যায়। এটা ইভার যত না উচ্চারণ সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত তার চেয়ে বাক্যের ফাংশনাল শব্দ ব্যবহার না করার প্রবণতা সঙ্গে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। অতএব, যে ফ্যাক্টরসগুলো শিশুর প্রাথমিক বাচনে অনুপস্থিত থাকছে তার ব্যাকরণিক প্রকৃতি কেমন হতে পারে? ব্রাউন নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফ্যাক্টর ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংরেজি ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ায় গণনাবাচক বিশেষ্যকে অনুসরণ করে তখন তার জন্য একটি পদার্শ্রিত নির্দেশক নির্বিকল্প (*see ball/ see the ball*)। এই গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, ব্রাউন (1973) যে তিনজন শিশু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের ভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফ্যাক্টরসের অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে— আদমের ভাষার ৯৪%; সারার ভাষায় ৮৪%; ইভার ভাষায় ৮৭%। তিনি মোট ১১টি প্রতিবেশ থেকে এই অনুপস্থিতিকে শনাক্ত করেছেন (1973; p.79)। সুতরাং, বাক্যিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুভাষায় ফ্যাক্টরস-এর অনুপস্থিতি একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য।

শিশুভাষার উপরিউক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মাইকেল টমাসেল্লোর ভার্ব আইল্যান্ড হাইপোথিসিস (verb island hypothesis, 1992) অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মডেল। এই মডেল অনুযায়ী, শিশুভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ গঠিত হয় একরাশ শব্দভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রেডিকেট গঠনের মধ্য দিয়ে। এই মডেলের আলোকে বলা যায় যে, শিশুরা তাদের ভাষার বহুশব্দস্তর শুরু করে পর্যাপ্ত বাক্যিক জ্ঞান ছাড়াই; এমনকি শব্দ ক্যাটেগরি; যেমন: বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক শব্দ সম্পর্কেও যথেষ্ট ধারণা অর্জনের পূর্বেই তাদের ভাষায় এই সকল উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। টমাসেল্লো এ পর্যায়ে ভাষার ফাংশনাল বিন্যাসকৌশলকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন, শিশুর ভাষায় শুরুর দিকে ভাষিক শব্দসমূহের ব্যাকরণিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষিত না হয়ে বরং সংযুক্ত হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে, তারা শব্দগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। টমাসেল্লো তাঁর গবেষণায় (Tomasello, 1992) দেখিয়েছেন যে, তাঁর তথ্যদাতা শিশু-অংশগ্রহণকারী ট্রাভিস প্রাথমিক পর্যায়ে এই শব্দগুলোর ধারণাকে সংযুক্ত করতে প্রতীকী সমন্বয়ক্রিয়া (symbolic-integration operations) প্রয়োগ করতে শুরু করে যা ক্রমে জটিল বিন্যাস আয়ত্তীকরণে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে টমাসেল্লোর ভার্ব আইল্যান্ড হাইপোথিসিস-এর ধারণা বিকশিত হয়। এখানে শিশুরা সরল শব্দগুলো সাধারণ অনুকৃতি দ্বারা আয়ত্ত করলেও জটিল শব্দগুলোর প্রত্নরূপ (archetypal form) প্রথমে শিখে থাকে। এ তত্ত্ব অনুয়ায়ী শিশুরা সমাবেশ সম্ভাব্যতা এ প্রত্যেক ক্রিয়ারূপে বিভিন্ন সমাবেশের উপাদানের উপস্থিতি আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ক্রিয়ারূপ চিনতে শেখে (p.238)। এই অনুকল্পটির প্রধান দিক হলো, শিশুরা তাদের শেখা সবগুলো ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের পরিবর্তে শুধু কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ারূপ পুনঃপুনঃ ব্যবহার করে ভাষা গঠন করে। অন্যভাবে বলা যায়, শিশুদের ভাষিক উপাত্তে, শিশুরা তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ক্রিয়ারূপগুলোর একটি বিশেষ রীতিতে ব্যবহার করে। একইসঙ্গে শিশুরা বিভিন্ন বাক্যিক ধরন অবলম্বন করে তাদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ক্রিয়ারূপের জন্য সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কাঠামো গঠন করে নেয়। এভাবে শিশুরা ক্রমান্বয়ে এক ক্রিয়ারূপ থেকে আরেক ক্রিয়ারূপের ব্যবহার সাধারণ এবং সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলতে শুরু করে।

যদিও শিশুভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা শণাক্ত করেছেন; তবুও শিশুভাষায় প্রাপ্ত ক্রিয়ারূপের বাক্যিক স্তর ব্যাখ্যায় এই মডেলটি কার্যকর। পাইন, লাইভেন ও রাওল্যান্ড (Pine, Lieven & Rowland, 1998) ভার্ব আইল্যান্ড হাইপোথিসিস-এর প্রাক্-বাক্যিক সংগঠন সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। গবেষকদের মতে শুধু ক্রিয়ারূপ-ই নয়, শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের ভাষায় অন্যান্য প্রকারের শব্দও উপস্থিত থাকে। পাইন এবং লিভেন (Pine & Lieven, 1997) তাঁদের পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যে, ইংরেজি ভাষায় বিশেষ্য ও নির্দেশক (determiner)-এর মাধ্যমে বিশেষ্য পদগুচ্ছ (NPs) গঠন করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে (যেমন; ('a/an+N' vs. 'the+N')), প্রত্যেক বিশেষ্যের এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে সুনির্দিষ্টভাবে (a/an' vs 'the') গ্রহণ করতেই হয়। এই গ্রহণের প্রবণতাটির স্বরূপ কেমন, তা তাঁরা ১২ জন ইংরেজি ভাষী শিশুর মধ্যে দেখিয়েছেন। আলোচ্য গবেষণার ফল বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় যে, এতে অংশগ্রহণকারী শিশুরা ক্রিয়ারূপ, সহায়ক ক্রিয়ার গঠন, সর্বনাম ও কারক নির্দেশনা এবং পদক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের যথাযথ ব্যবহার ভাষা উন্নয়নের প্রারম্ভ পর্যায় থেকে শুরু করে।

শিশুদের রূপতাত্ত্বিক স্তর আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে রূপমূল উন্নয়নের এই প্রক্রিয়া বেল্লুগি এবং ব্রাউন (Bellugi & Brown, 1964), ব্রাউন (Brown, 1973) এবং মিলার (Miller, 1981) স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের গবেষণায় তুলে ধরেছেন; যা পরবর্তীকালে ওয়েন্স তাঁর গবেষণায় সেগুলোর একটি সমন্বিত রূপরেখা (outline) প্রদান করেন। নিচে ওয়েন্সের (Owens, 2005; p. 296) অনুসরণে ইংরেজি ভাষার ১৪টি ব্যাকরণিক রূপমূলের উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেখান; যা যেকোনো ভাষার বাক্যিক সংগঠন অর্জন প্রক্রিয়া অনুধাবনেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে:

Morpheme	**Example**	**Age of Margery (In Months)**
Present Progressive –ing	Mommy driving	19-28
In	Ball in Cup	27-30
On	Doggie on Sofa	27-33
Regular plural-s	kittes eat my ice-cream from : /s/, /z/, and /ɪz/	27-33
irregular past	Came, fell, broke, sat, went	25-45
Possessive's	Momm's balloon broke Forms: /s/, /s/and /ɪz/aisin	26-40
Uncontactable copula (Verb to be as ..... verb	He is (Respons to `who is sick')	28-46
Articles	I see a kitty	28-46
Regular past-ed	Mommy pulled the wagon Forms : /d/, /t/ and /ɪd/	26-48
Regular third person-S	Kathy hits Forms : /s/, /z/ and /ɪz/	28-50
Irregular 3rd person	Does, has	28-50
Uncontactable auxiliary	He is (Response to `who is wearing your hat?')	29-48
Contractible copula	Man's big Man is big	29-49
Contractible auxiliary	Daddy's eating Daddy is eating	

১. সারণি: রূপমূল উন্নয়ন প্রক্রিয়া

প্রায় ১৮ মাস বয়সেই উল্লিখিত এই স্তরটি শুরু হয়ে যায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই সময়টিকে সন্ধিক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন (Brown, 1973); যেখানে শিশুরা একের অধিক শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু বাক্য তৈরি হয় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা ভাষা (দানীউল, ২০০৭, পৃ. ২৯) থেকে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যায়:

ক) অধিকার: আব্বু চেয়ার = আব্বুর চেয়ার এটা
বেবি চেয়ার = এটা বেবির চেয়ার

খ) বিবৃতি: আব্বু চেয়ার = আব্বু চেয়ারে বসে আছে
বেবি চেয়ার = বেবি চেয়ারে বসে আছে
বিলাই (বিড়াল) চেয়ার= বিড়ালটা চেয়ারে বসে আছে

গ) অনুজ্ঞা: আব্বু চেয়ার = আব্বু চেয়ারে বসো
বেবি চেয়ার = বেবি চেয়ারে বসো
বেবিকে চেয়ারে বসাও
বিলাই (বিড়াল) চেয়ার= বিড়ালটাকে চেয়ারে বসাও

এরই ধারাবাহিকতায় শিশুরা বাক্যের গঠন আয়ত্ত করে। এই সময় শিশুরা নিজেরাই বাক্যের কাঠামো সৃষ্টি করে। শিশুভাষার ক্রিয়ারূপ আয়ত্ত করা নিয়ে যেসব পূর্ববর্তী গবেষণা রয়েছে, তার মধ্যে আসিফা সুলতানার (Sultana, 2021)-এর গবেষণাটি উল্লেখযোগ্য। উক্ত গবেষণায় গবেষক যথাক্রমে ১৫ মাস বয়সে ৫১.০২% উচ্চারণে ওভার্ট তথা প্রকাশিত ক্রিয়ারূপ পেয়েছেন; ১৬ মাস বয়সে শিশুরা ৩৪.০৯%; ১৭ মাস বয়সে ৩৬.১৭%; ১৮ মাস বয়সে প্রধান ভুলের ধরন হিসেবে তিনি পুরুষবাচক চিহ্নের ব্যবহারের কথা বলেছেন; ১৯ মাস বয়সে ২৭.৫৯% ভুলের ধরন হলো সম্প্রসারিত ক্রিয়ারূপের পুরুষবাচক চিহ্নের ব্যবহার এবং ৬.৯% ভুলের ধরন অনুজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ২০ মাস বয়সী একজন বাঙালি শিশুর উচ্চারণে গবেষক ৫৬.১২% পুরুষবাচক চিহ্নের ভুল ব্যবহার শনাক্ত করেছেন। আসিফা সুলতানা মূলত রূপতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে বাঙালি শিশুভাষায় প্রাপ্ত ক্রিয়ারূপের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বাক্য বিশ্লেষণের বিষয়টি আলোচনা না করেও ক্রিয়ায় কাল ও বিধা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভাষার ক্রিয়ারূপ ঠিক যতখানি রূপতত্ত্বে অধীত; ঠিক ততখানি বাক্যিক উন্নয়ন সূচনার অন্যতম উপাদান। উক্ত গবেষকের অপর একটি প্রাপ্ত গবেষণায়ও (Sultana, 2016) বাঙালি টিপিক্যাল ও এটিপিক্যাল শিশুদের যে রূপবাক্যিক উন্নয়ন দেখানো হয়েছে সেখানেও বাংলা ক্রিয়ার মূলত রূপতাত্ত্বিক আলোচনা প্রাধন্য পেয়েছে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে বাঙালি শিশুদের বাক্যিক উন্নয়নের সূচনাপর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

২.১ শিশুভাষার বাক্য গঠন পক্রিয়া

শিশুরা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয় ধারাবাহিকভাবে আয়ত্ত করে থাকে। শিশু প্রথমে যখন একটি শব্দ উচ্চারণ করে তখন তা দিয়েই সে বাক্যিক অভিব্যক্তি বোঝাতে চেষ্টা করে। ক্রমান্বয়ে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু বাক্যিক উপাদানগুলো আয়ত্ত করে নেয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। শিশুর বাক্যিক অবয়ব (form) উন্নয়ন শুরু হয় ১২ মাস বয়সে। বাক্যের বিভিন্ন ধরন: বর্ণনামূলক, না-বোধক, প্রশ্নবাচক, জটিল এবং যৌগিক তথা declarative, negative, introgative, embedded and conjoined আয়ত্তীকরণের সময়পর্ব নিচে একটি সারণির সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো (দ্র. Miller, 1981, p.19):

Stage	Age (In Months)	Declarative	Negetive	Interogative	Embedded	Conjoined
Early I (MLU: 1-1.5)	12-22	Agent + Action Action + Object	Single word no-all gone, gone	Yes/no question asked with rising intonation on single word; who and where		serial naming without and
Late I (MLU : 1.5-2)	22-26	Subj+ Verb+Obje	No and Not used interchangely	What doing?	prepositons in and on appear	and appears
Early II (MLU : 2.-2.25	27-28	Subj+ Copula+Compl.		where going	Gonna, wanna, gotta	

২ সারণি: বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর বাক্যিক উপাদান আয়ত্তীকরণ

এভাবে শিশুরা বিভিন্ন বয়ানে বাক্যে বিভিন্ন ফাংশন আয়ত্তীকরণ করে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কিছু বৈশিষ্ট্য বা ফিচার নির্ধারণ করা হয়। এগুলোকে প্রধানত মূখ্যশ্রেণি-বৈশিষ্ট্য (major class features) ও গৌণশ্রেণি-বৈশিষ্ট্য (minor class features) ফিচার হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণ শাব্দিক শ্রেণিকে ভাষার মুখ্যশ্রেণি-বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি। শাব্দিক ক্যাটেগরির বাইরে আর অন্য সব বৈশিষ্ট্যই গৌণশ্রেণি-বৈশিষ্ট্য যেমন, পুরুষবাচক চিহ্ন, কালবাচক চিহ্ন ইত্যাদি; যেগুলো সাধারণভাবে ফাই ফিচার হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অ্যাডজারের (Adger, 2002) মতে, মানবভাষায় প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য তথা ফিচারগুলো হলো:

Kind of Feature	features	comments
tense	[past]	need [future] as well, for Irish
number	[singular][plural]	feature bundle [singular, plural] for dual number
person	[1], [2]	[1,2] gives 'Fourth' person
gender	[masc], [fem]	need others for different languages
case	[nom], [acc], [gen]	again, may need others
category	[N], [V], [A], [P]	may be reducible to just [N], [V]
others	[part], [inf]	appear on verbs

৩ সারণি: ভাষার ফাই ফিচারসমূহ (Adger, 2002, p.41)

এই ফিচারগুলো অন্য ফিচারের সঙ্গে বসে ভাষার শাব্দিক কাঠামো তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *বালকেরা* শব্দটিতে রয়েছে একরাশ বাগার্থিক ফিচার; [+মানব, +পুরুষ, +অপ্রাপ্তবয়স্ক, +বহুবচন]। এই ফিচারসমূহ মূলত মানব ভাষার রূপ-বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থ বিশ্লেষণ করে। এভাবে রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক ফিচারগুলো রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে সূত্র আকারে স্থান পায়। একইভাবে বাক্যিক ফিচারগুলো; যেমন, [N], [Pl], [ACC] বাক্যিক বর্ণণায় সক্রিয় থাকে এবং শব্দকে একটি নির্দিষ্ট ধরণ দেয় যা ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে পরিচিত। শিশুভাষার বাক্যিক সংগঠন উন্নয়নে ক্রিয়ারূপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা, ওপরের নির্দেশিত সারণির অনেক ফিচারের সঙ্গে ক্রিয়ারূপ সম্পর্কিত। তাই বাক্যে ক্রিয়ার কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার সহসম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করতে হয়। কেননা, একটি বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার চাহিদা কীরূপ তা একদিক থেকে যেমন ক্রিয়ার কর্মগ্রহণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে অপরদিকে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য কিংবা কর্মপ্রবচনীয়ের আরগুমেন্ট-সম্পর্ক বিন্যাসকরণের সূত্রে তা সুনির্ধারিত হয়। বস্তুত কর্মগ্রহণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। কর্ম ও ক্রিয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে বাক্যতত্ত্বে থেটা ভূমিকা কার্যকর সক্রিয়তা প্রদর্শন করে থাকে। সাধারণত তিন প্রকার থেটা-ভূমিকার সাহায্যে বাক্যে কর্ম ও ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্দেশিত হয়; এগুলো হলো: এজেন্ট থেটা-ভূমিকা (agent theta role), থিম থেটা-ভূমিকা (theme theta role) ও গোল-থেটা ভূমিকা (goal theta role)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ *হাসি*, *কান্না*, ঘুমানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায়। কারণ অর্কমক ক্রিয়ায় এজেন্ট থেটা-ভূমিকা ও থিম থেটা-ভূমিকার যেকোনো একটি সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে রান্না করা, পুতুল খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়া; কেননা, এখানে দুটি থেটা-ভূমিকা সক্রিয় থাকে এবং পাঠদান করা, উপহার দেয়া, খাওয়ানো ইত্যাদি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। প্রতিটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় তিনটি থেটা-ভূমিকা পাওয়া যায়।

বাক্যে কিছু নির্দিষ্ট উপাদান এই থেটা-ভূমিকা নির্দেশ করতে পারে। বাক্যের এই উপাদানগুলো আরগুমেন্ট হিসেবে পরিচিত। আরগুমেন্ট মূলত প্রেডিকেটের মাধ্যমে থেটা-ভূমিকাকে বাক্যে নির্দেশিত করে। তাহলে বলা যায় যে, একটি প্রেডিকেট থেটা-ভূমিকাকে নির্দেশিত করে থাকে। আর বাক্যের যে উপাদানে থেটা ভূমিকা কার্যকর হয় তা-ই বাক্যের আরগুমেন্ট। কিন্তু, পৃথিবীর সকল মানব ভাষায় থেটা-ভূমিকা সর্বদা একইভাবে থাকে না। অনিবার্যভাবেই অনেক সময় থেটা ভূমিকা অনির্দেশিত থেকে যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায়শই প্রতিবেশের সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু শিশুভাষা একটি ক্রমবর্ধমান বিকশিত ভাষা। তাই ধারণা করা হয় নির্দিষ্ট সময় পরিসরে শিশুরা তাদের ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাবে। তাই যদি শিশুভাষায় থেটা-ভূমিকার সব কয়টি বা কোনো কোনো নির্দেশক কার্যকর না থাকে, তাহলে সেগুলোকে ভুল হিসেবে শনাক্ত না করে (যেমনটা আসিফা সুলতানা (Sultana, 2021) করেছেন) তা ক্রমবিকাশমান ভাষা আয়ত্তীকরণের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

টমাসেল্লো (Tomasello, 1992; p.24) মনে করেন, শিশুরা তাদের ভাষার বহুশাব্দিক স্তর আয়ত্তীকরণের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ক্রিয়ারূপের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণাতীত থাকে। বাক্যিক ক্যাটেগরি, কর্তা-ক্রিয়ার সম্পর্ক, এজেন্ট-পেশেন্ট প্রত্যক্ষ কর্ম বা বাগার্থিক ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুরা ধারণাপ্রাপ্ত নয়। তবে ক্রমান্বয়ে শিশুরা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রেডিকেটসহ ক্রিয়া-সুনির্দিষ্ট ক্যাটেগরি গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ টমাসেল্লো *hitter, thing hit, thing hit with,* এবং অন্যান্য শব্দরূপের কথা উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে, টমাসেল্লো ইংরেজি ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়ার বিন্যাসগত প্রতিসাম্য চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখান যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়

ক্রমবিকশিত ভাষার বহুশাব্দিক বুলির ধরন আর আনুষ্ঠানিক গবেষণালব্ধ ভাষিক তথ্যের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। বস্তুত, শিশু বাক্যে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার বিন্যাসকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত (cue) পেতে শুরু করে। এই সংগুপ্ত নির্দেশনাগুলোই শিশুর ভাষাকে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহায়তা প্রদান করে। (Akhtar and Tomasello, 1997).

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুভাষার বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বাক্যিক আর্গুমেন্ট কাঠামোর প্রকাশিত এবং সংগুপ্ত বিভিন্ন ইঙ্গিত কাজ করে থাকে; যা শিশু তার প্রতিবেশ অভিজ্ঞতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাষিক সামর্থ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে অর্জন করে। শিশুভাষার এই স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো মূলত বাক্যের মুখ্যশ্রেণি-বৈশিষ্ট্য এবং গৌণশ্রেণি-বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। তাহলে জানা প্রয়োজন যে, বাঙালি শিশু তার ১৮ থেকে ২৪ মাস বয়সের ভাষা অর্জন পরিক্রমায় কী ধরনের বাক্যিক ইঙ্গিত বুঝতে শেখে আর কোন কোন নির্দেশনা অনুধাবন করতে তার আরও সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই গবেষণা-জিজ্ঞাসাকে নিম্নলিখিতভাবে কাঠামোবদ্ধ করা যেতে পারে :

গবেষণা প্রশ্ন: ১৮ মাস থেকে ২৪ মাস বয়সী বাঙালি শিশুরা কী ধরনের বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে?

প্রশ্নটি একইসঙ্গে, বাংলা বাক্যের যেসব বৈশেষিক ফাংশন এবং আর্গুমেন্ট বিন্যাসের যেসকল সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত তখনও বাঙালি শিশু আয়ত্ত করে উঠতে পারে না, সেগুলো তুলে ধরতে সক্ষম। এই মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রমাণ করা সম্ভব।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রশ্ন একটি গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান গবেষণায় গবেষণা প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গুণাত্মক পদ্ধতিই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণায় যেহেতু বাংলাদেশের বাঙালি শিশুর ভাষা আয়ত্তীকরণের প্রারম্ভপর্বের বাক্যিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে সেহেতু পারিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের চেয়ে নিবিড় অধ্যয়ন দ্বারাই গবেষণা-প্রতিপাদ্যকে অধিকতর কার্যকরভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। আবার ভাষা অর্জন একটি ক্রম ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে একই ভাষী শিশুদের ভাষা ধাপের উন্নয়নে ও প্রয়োগে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তাই বাংলা ভাষী শিশুর সূচনাপর্বের বাক্যিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে বর্তমান গবেষণায় কালব্যাপ্ত অধ্যয়ন (longitudinal studies) অনুসরণ করা হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে ধারাবহিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

৩.১ অংশগ্রহণকারীর বিবরণ

বর্তমান গবেষণাকর্মটি মূলত একটি বর্ণনামূলক নমুনাধর্মী গবেষণা। গবেষণার নমুনা হিসেবে একভাষী বাঙালি বাবা-মার শিশু সন্তান সংগ্রহের জন্য চারটি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে যে বিয়ষগুলো অনুমিত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো: ১. শিশুকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে হবে; ২. বয়স হতে হবে ১৬ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে; এবং ৩. শিশুটির মাতৃভাষা ও পরিবারে প্রধান যোগাযোগের ভাষা— উভয়ই বাংলা হতে হবে। এ সকল শর্ত মেনে চূড়ান্তভাবে একজন শিশুকে নির্বাচন করা হয়। কেননা দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করে কেবল এই শিশুর পরিবার তাদের সন্তানকে পর্যবেক্ষণের

অনুমতি প্রদান করেন। শিশুটি শারীরিকভাবে সুস্থ। তার পিতা-মাতা প্রদত্ত ভাষাবিকাশের তথ্য পর্যলোচনা করে; শিশুটির ভাষা অগ্রগতির বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে তাকে বর্তমান গবেষণার অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশু বিদুষীর মা গৃহিণী ও বাবা সরকারি কর্মকর্তা।

৩.২ উপাত্তসংগ্রহ কৌশল

বর্তমান গবেষণায় গুণাত্মক পদ্ধতির (qualitative research) কাঠামো ব্যবহার করে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ভাষিক উপাত্তের (data) সাহায্যে গবেষণা-ফল অন্বেষণ করা হয়েছে। গুণাত্মক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এই গবেষণায় নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ (observation): বর্তমান গবেষণায় অংশ নেওয়া শিশু তথ্যদাতার সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত। যেহেতু এই তথ্যদাতা হলো অল্পবয়সী শিশু সেহেতু তার কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত নমুনা সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে তাকে কালব্যাপ্ত পরীক্ষণমূলক পরীক্ষণ কৌশল (longitudinal experimental experimental technique) ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্রভিত্তিক অভীক্ষা (picture stimuli based test): গুণাত্মক পদ্ধতিতে প্রচলিত চিত্রভিত্তিক অভীক্ষার ধরনটি প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করে শিশুর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় গবেষকের পক্ষে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব হয় না। কেননা, এতে উপাত্তের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। আবার, এতে সংগৃহীত উপাত্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত যথাযথভাবে পাওয়া না-ও যেতে পারে (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। বিশেষ করে, বর্তমান গবেষণার তথ্যদাতা শিশু হওয়ায় তাকে কেবল পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভাষার অন্বিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ উপাত্ত আকারে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না (মিথুন, ২০১৮)। তাই এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী শিশুর কাছ থেকে দুই ধাপে চিত্রভিত্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৩ উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ কৌশলের অংশ হিসেবে কালব্যাপ্ত (longitudinal) পরীক্ষণমূলক উপাত্ত সংগ্রহ-উপায় (tool) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কালব্যাপ্ত অধ্যয়ন (longitudinal study) হলো, এমন একটি গবেষণা-উপায় যেখানে অংশগ্রহণকারী তথা নমুনাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় (Robson, 2002)। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একজন বাঙালি ভাষী শিশুকে নির্বাচন করে তাকে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গবেষণায় কালব্যাপ্ত পরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় (দ্র.Tomasello, 2001; Mellow et at. 1996)।

বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুর ১৮ মাস বয়স থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত সময়পর্বে তার কাছ থেকে দুই মাস অন্তর উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পূর্ব মূল্যায়ন ও পরবর্তী মূল্যায়নের মধ্যকার কোনো ধারাবাহিকতা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করার পূর্বেই শিশুর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার প্রয়োজনে বর্তমান গবেষক নিয়মিত তার আবাসস্থল

পরিদর্শন করেছেন। এতে করে শিশুটি পর্যবেক্ষণের শুরু থেকেই গবেষকের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশতে পেরেছে এবং তার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ সহজতর হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বক্ষ্যমাণ গবেষণায় গবেষণা কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ (observation) ও চিত্র অভীক্ষা (picture stimuli) গ্রহণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী শিশুটি এমন একটি বয়স শ্রেণি (age group)-ভুক্ত, যে বয়সে তাকে নিয়মিত প্রত্যক্ষ শিখনের আওতায় নিয়ে আসা অর্থাৎ বড় শিশুদের মতো বোঝানো সম্ভব নয়। অতএব তার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য তাকে স্বাধীনভাবে ভাষা ব্যবহার করতে দিতে হবে। তাই এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বয়সের শিশুরা মূলত তাদের পারিবারিক তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয় এবং এই পরিমণ্ডলেই তাদের ভাষিক উন্নয়ন ঘটে থাকে। শিশুর নিকট হতে প্রাপ্ত উপাত্তকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল করার জন্য পর্যবেক্ষণগুলো তার আবাসস্থলে সম্পাদন করা হয়েছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে শিশুটি জন্য যে সময় সবচেয়ে বেশি ক্রীড়ামুখর সেই সময়কে পর্যবেক্ষণের সময় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিচে বর্তমান অভিসন্দর্ভে অংশগ্রহণকারী শিশুর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

অংশগ্রহণকারীর নাম	পর্যবেক্ষণ ক্রম	পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বয়স	প্রতিটি পর্যবেক্ষণের ব্যাপ্তি	পর্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়
বিদুষী	প্রথম পর্যবেক্ষণ	১৮ মাস	০৪ ঘণ্টা	০৪/০১/২০২১ (দুপুর ০২টা থেকে সন্ধ্যা ০৬টা)
	দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ	২০ মাস	০৪ ঘণ্টা	০৩/০৩/২০২১ (সকাল ০৯টা থেকে দুপুর ০২টা)
	তৃতীয় পর্যবেক্ষণ	২২ মাস	০৫ ঘণ্টা	৯/০৫/ ২০২১ (সকাল ০৯টা থেকে বিকাল ০৩টা)
	চতুর্থ পর্যবেক্ষণ	২৪ মাস	৪.৩০ ঘণ্টা	১৬/০৭/২০২১ (বিকাল ০৪ টা থেকে ৮.৩০)

৪ সারণি: শিশুর পর্যবেক্ষণের সংখ্যা ও সময় (ঘণ্টা)

বর্তমান গবেষণায় যেহেতু শিশুদের বাক্যিক সংগঠন আয়ত্তীকরণের সূচনাপর্বের সার্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে সেহেতু শিশুদের ভাষায় ক্রিয়া ব্যবহারের প্রক্রিয়া ও সামর্থ্য, বিশেষ করে সকর্মক-অকর্মক-দ্বিকর্মক ক্রিয়া ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল। আর তাই এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রায়-নিরীক্ষণমূলক কৌশল (qusi-exprimental approach) হিসেবে বিশেষ উপাত্ত উদ্দীপক (data stimuli) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কৌশলের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারী শিশুকে কয়েকটি চিত্রভিত্তিক অভীক্ষায় (নমুনা চিত্রের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অভীক্ষাগুলোকে দুই ভাগে

ভাগ করে শিশুর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে; যার প্রথম ভাগটি ছিল পরিচিতিমূলক (সাধারণ বস্তুর ছবি, যেমন, বল, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি) এবং মূল অভীক্ষাগুলো ছিল দ্বিতীয় ভাগে। প্রথম ভাগের চিত্রগুলো তৃতীয় পর্যবেক্ষণে এবং দ্বিতীয় ভাগের চিত্রগুলো চতুর্থ পর্যবেক্ষণে শিশুকে দেখানো হয়েছে। তৃতীয় পর্যবেক্ষণে কেবল পরিচিত কয়েকটি বস্তু সংবলিত চিত্র অভীক্ষা শিশুর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে; যার উদ্দেশ্য ছিল চিত্রভিত্তিক অভীক্ষার সঙ্গে তাকে পরিচিত করানো। আর চতুর্থ পর্যবেক্ষণের সময় ক্রিয়ারূপের আরগুমেন্ট ও ফাই ফিচার অনুযায়ী উদ্দীপক তৈরি করে তার কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী বহুশাব্দিক স্তরের শুরুতে শিশুদের বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি থাকে (Boweman, 1977; Braine, 1976; MacWhinney, 1978; Pain, Lieven, Rowland, 1998; Tomasello, 2000)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাকরণিক সূত্র সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি; যা প্রাথমিকভাবে ব্যাকরণের আংশিক ব্যবহারের সঙ্গে সংযুক্ত। এর সঙ্গে ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে অভিধা-উপাদানের (lexical item) সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে ক্রমান্বয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি বিকশিত হয়। এখন বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের ভাষায় প্রাপ্ত বাক্যিক উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

নাম	১৮ মাস	২০ মাস	২২ মাস	২৪ মাস	চিত্রভিত্তিক অভীক্ষা
বিদুষী	যাই আসো বনু ডিম বাকু	চুল ছিড়ি দাঁত ভাঙ্গি ভাই গেল	পেটে হাত না যাও যাও এখানে	মোবাইল দাও আমি যাই বাবা যাই বেরু করি বাককু খাই দাও না যাও এখান থেকে ঘরে যাও রাত হয়ে যাবে তুমি ঢাকা যেয়েছো তুমি পারো নিব ওকে নিমি দাও আমাকে বকু করলো আমি ফেলে দিব অনেক সন্ধ্যা	বিদু হাসি (চিত্র-১) ব্যাথা (চিত্র-২) ঘুম (চিত্র-৩) পুকুর স্নান (চিত্র-৪) লোক যাই (চিত্র-৫) বনু (দাদী) রান্না (চিত্র-৬) বাচ্চু ঘুম করলো (চিত্র-৭) জামা ধোয় (চিত্র-৮) আমি পড়ছি (চিত্র-৯) কাকা পড়ছি (চিত্র-১০) উত্তর পাওয়া যায়নি (চিত্র-১১) উত্তর পাওয়া যায়নি (চিত্র-১২) বৃষ্টি আসো (চিত্র-১৩) উত্তর পাওয়া যায়নি (চিত্র-১৪) খেলি (চিত্র-১৫) বাচ্চু খাই (চিত্র-১৬)

৫ সারণি: অংশগ্রহণকারী থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন

এ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে শিশু ভাষার বাক্যস্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রথমে উপস্থাপন করা হবে এবং তারপর এই উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বাঙালি শিশুদের ভাষা বাক্য অর্জনের প্রারম্ভিক পর্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

৪.১ বাঙালি শিশুর বাক্যের আর্গুমেন্ট কাঠামো বিশ্লেষণ

সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুরা শুরু থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য সম্পর্কে সংবেদনশীল (Guasti, 1994; Hoekstra & Hyams, 1998; Wexler, 1998)। বর্তমান গবেষণায় লক্ষ করা গেছে যে, শিশুরা ভাষা অর্জনের শুরু থেকেই সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পর্কে খুব সংবেদনশীল নয়। তাছাড়া উল্লিখিত ভাষাবিজ্ঞানীরা শিশুদের এমন কোনো বিশেষায়িত পরীক্ষণে নিয়োজিত করেননি যার ফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিতভাবে দেখেছেন যে, শিশুরা সহজাতভাবেই সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে পারে। একদল গবেষক মনে করেন, সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে শিশুরা যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে তা ইতিবাচকভাবেই ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয় (সূত্র: Wexler, 1998)। অপরপক্ষে, অন্য আরেক দল গবেষক মনে করেন, অসমাপিকা রূপটি হলো সাহায্যকারী ক্রিয়া (auxliaries) উচ্চারণ না করার ফল, যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন তত্ত্বের নীতি বিরুদ্ধ নয় এবং তা মূলত সহজাত বাক্যিক জ্ঞান (syntactic knowledge)-কে নিশ্চিত করে (Hoekstra & Hymas; 1998, Rizzi, 1994)। যাই হোক, এই দুটো অনুকল্পই বিসংবাদশূন্য নয় এবং যা বাংলা ভাষার মতো প্রো-ড্রপ (কর্তা উহ্য রয়েছে এমন) ভাষার জন্য উপযোগী নয়। শিশুরা তাদের ভাষার বাক্যতত্ত্ব আয়ত্ত করে থাকে কিছু প্রাথমিক সংগঠন (initial constructions) দ্বারা। সমাপিকা ক্রিয়ার ধরন আলোচনায় কিছু নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক চিহ্ন যুক্ত হওয়ার বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট প্রাবল্যে (frequency) শিশুদের প্রত্যক্ষ বাচনে পাওয়া যায়। অন্যদিকে অসমাপিকা ক্রিয়া শিশুদের বাচনে এভাবে পাওয়া যায় না। আরও বলা যায়, শিশু-ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়া যতটা শক্তিশালী রূপে পাওয়া যায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ততটা শক্তিশালী রূপ পাওয়া যায় না। শিশুদের প্রাথমিক বাচনে অব্যবহিত পরিস্থিতি (immediate context) পাওয়া যায় (Behrens, 2001, Piaget, 1946); যা মূলত সমাপিকা ক্রিয়া আশ্রয়ী। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশুদের প্রাথমিক বাচনে বা উচ্চারণে অসমাপিকা রূপ ব্যবহৃত হয়; ঘাটতিগুলো সম্পৃক্ত হয় সমাপিকার পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহারের ফলে। আবার শিশুরা ২-৫ বছর বয়সে অসমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয় সাধনে ক্রমান্বয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে (Gathercole, Sebastian & Soto, 1999, 2000; Lopez ornat et al., 1994)। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান; যা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে বাঙালি শিশুর ভাষায় প্রাপ্ত অকর্মক, সকর্মক, দ্বিকর্মক ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায়। কিন্তু তার আর্গুমেন্ট কাঠামো পরিপূর্ণ নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো বাক্যিক উপাদান এতে অনুপস্থিত থাকে। ফলে, অনিবার্যভাবেই কোনো কোনো থেটা-ভূমিকা অনির্দেশিতই (unassigned) রয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদুষী ১৮ মাস বয়সে দুটি স্পষ্ট অকর্মক ক্রিয়া ব্যবহার করে। "যাই" এবং "আসো"। এই বয়সে বাঙালি শিশুদের ফ্যাংশনালিটি কম থাকায় তাদের আরগুমেন্ট ব্যবহার সীমিত থাকে। নিচের নমুনা বিশ্লেষণসূত্রে বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে:

$$[[Ø\ [[যাই]_{VP}]_{vP}]_{TP}]$$

সুতরাং বলা যায় যে, ক্রিয়াটির এজেন্ট থেটা-ভূমিকা এখানে অনির্দেশিতই রয়ে গেছে যা ওপরের উদাহরণে Ø-চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, বাংলা ক্রিয়ার সঙ্গে পুরুষবাচক চিহ্ন সম্পৃক্ত থাকে বলেই হয়ত শিশু এজেন্ট থেটা-ভূমিকা অনির্দেশিত রেখেও ভাবপ্রকাশের কাজটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া এই পর্বে শিশুরা ক্রিয়াকে সংগুপ্ত রেখেও

বাক্য তৈরি করে। এই ধরনের বাক্য সাধারণত প্রতিবেশ-নির্ভর হয়; তাই অনেক সময়ই এতে অনিয়মিত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। ২০ মাস বয়সে অংশগ্রহণকারী শিশুর বাক্যিক ফ্যাংশনালিটি বৃদ্ধির কারণে ক্রমেই তার ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, "চুল ছিড়ি", "ভাই গেল [ভাইকে নিয়ে গেল বোঝাতে]"। লক্ষণীয়, প্রথম বাক্যে এজেন্ট থেটা-ভূমিকা সংগুপ্ত রয়েছে ধরে নেওয়া গেলেও দ্বিতীয় বাক্যে একাধিক বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত নিচের বাক্যিক বিন্যাসটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে:

$$[Ø\ [Ø_i\ [[[\text{ভাই ?.ACC}]_{NP}\ Ø\ \text{গেল}]_{VP}]_{vP}]_{TP}]$$

এই সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, বাক্যের আর্গুমেন্ট কাঠামোর অনেক তথ্যই এতে অনুপস্থিত। এই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী ভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিদুষীর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ থেকে ক্রমেই ধারাবাহিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই উন্নয়ন সাধিত হলেও ২৪ মাস পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীর ভাষায় প্রাপ্ত ক্রিয়ারূপে অনেক অনির্দেশিত থেটা-ভূমিকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, "আমি ফেলে দেব" বাক্যেও থিম থেটা-ভূমিকা অনুপস্থিত।

৪.২ চিত্রভিত্তিক অভীক্ষালব্ধ বাক্যিক কাঠামো বিশ্লেষণ

শিশুটির ২৪ মাস বয়সে চিত্রভিত্তিক অভীক্ষা থেকে উপাত্ত নেয়া হয়েছে। ২৪ মাস বয়সে শিশুটি স্বতস্ফূর্তভাবে অনেক রকম ক্রিয়ারূপ ও আরগুমেন্ট ব্যবহার করলেও চিত্রভিত্তিক অভীক্ষায় আরগুমেন্ট খুব কম পাওয়া গেছে। চিত্রভিত্তিক অভীক্ষায় প্রায় সব ধরনের ক্রিয়ারূপ রাখা হলেও উত্তরে তেমন বৈচিত্র্য পাওয়া যায়নি। শিশুটি চিত্রে সংজ্ঞাপিত বাক্যেও টপিক অংশটিকেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে; চিত্রসূত্রে সম্ভাব্য বাক্যকাঠামোর অন্যান্য অংশ তার কাছে গৌণ বলে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিত্রভিত্তিক অভীক্ষার যেসব ছবিতে শিশু রয়েছে সেখানে বিদুষী নির্দ্বিধায় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেছে এবং যেখানে পুতুলের ছবি ছিল সেখানে নিজের খেলনা পুতুল "বাচ্চু"কে প্রতিস্থাপিত করেছে। চিত্রভিত্তিক অভীক্ষায় মূলত অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে, ছবির সাহায্যে অংশগ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রিত সংজ্ঞাপনে বিভিন্ন ফাই-বৈশিষ্ট্য অস্পষ্টই রয়ে গেছে।

৪.৪ ফাই-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

বাক্যের কালবাচকতা, পুরুষ, লিঙ্গ, বচন নির্দেশনা, কারক নির্দেশনা প্রভৃতি নিয়েই ফাই-বৈশিষ্ট্য কাজ করে। ১৮ মাস বয়সে বাঙালি শিশুরা যে ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে তাতে বাক্যের বিভিন্ন ফাই-বৈশিষ্ট্য যেমন, কাল, পুরুষ, কারক, ইত্যাদির ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত শিশুরা এই সময় ক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপ ব্যবহারে উচ্চমাত্রার অসঙ্গতি প্রদর্শন করে (যদিও এখন পর্যন্ত এই উচ্চমাত্রা কতটুকু তা পরিষ্কার নয়)। ওয়েক্সলার (Wexlar, 1999) অনুমান করেন যে, শিশুরা প্রাথমিক অবস্থায়ই তাদের রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপ-বাক্যিক উপাদানের সম্প্রসারণের জ্ঞান থাকে। তিনি আরও বলেন, 'যদি একটি বাক্যে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সংগতিবিধানের সূত্রে কোনো ফাই-বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তার ক্রিয়ার এমন কোনো সম্প্রসারিত বৈশিষ্ট্য থাকবে না যা ওই ফাই-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রকাশ করে। তবে সব ভাষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত রূপ একই রকম হয় না। যেমন; ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে He Jumps বা She goes হলেও বাংলা ভাষায়, আমি ঝাঁপ

দিই, সে ঝাঁপ দেয়। 'ঝাঁপ'-এর কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিভিন্ন পুরুষ নির্দেশক চিহ্ন যুক্ত হতে থাকে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে লক্ষ করা গিয়েছে যে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে শিশুরা 'একজন লোক দৌড়ে যায়' বাক্যটি বোঝাবার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বলেছে, 'লোক যাই'। লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে একদিকে ফাই-বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট সমতাবিধান যেমন হয়নি তেমনি যথাযথ ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘাটতিও প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

আদর্শরূপ: [[[একজন [লোক]$_{NP}$]$_{DPi}$ [[একজন [লোক]$_{NP}$]$_{DPi}$ [দৌড়ে যায়3]$_{VP}$]$_{vP}$]$_{TP}$

শিশুবাচন রূপ: [[? [লোক]$_{NP}$]$_{DP}$ [? যাই]$_{VP, ?}$]]$_{vP}$]$_{TP}$

অংশগ্রহণকারী শিশুর কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে, ভাষা অর্জনের এই পর্বে শিশুরা বাংলা ভাষার ফাই-বৈশিষ্ট্য মেনে কর্তা-ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন তথা subject-verb-agreement তৈরি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যেতে পারে, "আমি ফেলে দেবে" (২৪ মাস) বাক্যটি। এখানে 'ফেলে দেয়া' ক্রিয়া সংগঠনটি ঠিক থাকলেও তার সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক অনির্দেশিত রয়ে গেছে। আবার বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার যে বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়; যেমন: 'চলে যাওয়া', 'বসে পড়া', হেঁটে আসা' প্রভৃতি – এগুলোর ব্যবহারও শিশুদের ভাষার এই পর্বে উপলব্ধ হয় না। তবে, শিশুরা এই দুটি ক্রিয়ার যৌগিক ব্যবহার অনুধাবনে দক্ষ না হলেও ক্রিয়া দুটির কোনটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ তা তাদের সহজাত বোধের সাহায্যে বুঝে নিতে সমর্থ হয়। তাই উল্লিখিত উপাত্তকে বিবেচনায় এনে বলা যায় যে, 'লোক যাই' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে 'যাওয়া' ও 'দৌড়' দুটোর মধ্যে 'যাওয়া' ক্রিয়াটি-ই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তা অংশগ্রহণকারী বুঝে নিয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে, "নিমি দাও" এখানে অংশগ্রহণকারীর পুরুষগত সঙ্গতি রক্ষা না হলেও যৌগিক ক্রিয়ার নির্ভুল গঠন লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুর ধারাবাহিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া আরও কিছু উচ্চমাত্রার ভাষা ঘাটতি যা ফাই-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন; বাংলা বর্তমান কালের সম্প্রসারিত ক্রিয়ারূপের কর্তা-ক্রিয়ার পুরুষগত সঙ্গতি বিধান না মেনে চলার বিষয়টি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রাপ্ত শিশুর ভাষায় এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাক্যিক আয়ত্তীকরণের সূচনা পর্ব হিসেবে যে ৪টি পর্যায় দেখানো হয়েছে প্রতিটি পর্যায়ে এই ঘাটতিটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, "আসো", "লোক যাই", "আমি ফেলে দেবে" ইত্যাদি। এখানে যে পুরুষবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনিয়মিত। (Akhtar and Tomasello, 1997) অনুসারে বলা যায়, এই পর্বে বাঙালি শিশুরা ক্রিয়ার বিন্যাসকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাষিক ইঙ্গিত যথেষ্টভাবে পায়নি।

এছাড়া ফাই-বৈশিষ্ট্যের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কারক চিহ্নিত করা। এখানে অংশগ্রহণকারীর ২০ মাস বয়সে প্রাপ্ত একটি বাক্য পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। "ভাই গেল" এখানে প্রকৃত বাক্যের সংগঠন হলো 'ভাইকে নিয়ে গেল'। এ পর্যায়ে শিশুর যথেষ্ট পরিমাণ কারক জ্ঞান অনুপস্থিত। এখানে তাই কারক চিহ্নের উন্নয়ন না হওয়ায় থিম থেট-ভূমিকাকে এজেন্ট থেটা-ভূমিকা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফলে, কর্মকারক অনির্দেশিতই রয়ে যাচ্ছে। বোঝার সুবিধার্থে দৃষ্টান্তটির বাক্যিক বিন্যাস পুনরায় উপস্থাপন করা যেতে পারে:

$$[Ø\ [Ø_i\ [[[\text{ভাই}\ ?.ACC]_{NP}\ Ø\ \text{গেল}]_{VP}]_{vP}]_{TP}]$$

ফাই-বৈশিষ্ট্যের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কালবাচকতা। বাঙালি শিশুভাষার প্রাথমিক পর্বে কালের বহুমাত্রিক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অংশগ্রহণকারীর ভাষায় ব্যবহৃত একটি কৌতূহলউদ্দীপক কালের ব্যবহার পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় যাওয়া বোঝাতে 'যা' ধাতু ও 'গম'

ধাতুর ব্যবহার রয়েছে। প্রমিত ভাষায় 'যা' ধাতু ব্যবহৃত হয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল প্রকাশের জন্য আর অতীতকাল বোঝাতে 'গম' ধাতু ব্যবহৃত হয়। অংশগ্রহণকারীর ভাষায় "যেয়েছিলে" ক্রিয়ারূপটি আসলে 'যা' ধাতুর সাধারণীকৃত ব্যবহার। ওয়েক্সলার (Wexler, 1998) এই ধরনের অসংগত বৈচিত্র্যকে agreement/tense omission model (ATOM)-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। পিপল ও ওয়েক্সলার এবং ক্লাসেন ও পেনকে (People & Wexler, 1993; Clahsen & Penke, 1992)-এর মতে, উল্লিখিত এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুদের বাচনের প্রাথমিক অবস্থা শনাক্ত করা সম্ভব। হায়েমস (Hyams, 1992) মনে করেন, আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক নীতি অবশ্যই প্রতিফলিত হবে; এমনকি যদি মাপকাঠি নির্ধারণ (parametre setting)-এর মধ্যেও বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোকে সমন্বিত করা হয় তবুও তা ফলস্বরূপ এই বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোকে দেখাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাঙালি শিশুরা যখন আবিষ্কার করে যে, তাদের ভাষায় কর্তা উহ্য রাখা যায় এবং কর্তা উহ্য রাখলেও সর্বদা ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রত্যয়ীকরণ করার প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজেদের মাপকাঠিতে এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ধারণ করে নেয় এবং ভাষার ব্যবহারে ভুল করার সম্ভাবনা কমে যায়।

প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি শিশুরা বাক্য অর্জনের সূচনাপর্বে বিভিন্ন ঘাটতি প্রদর্শন করে। এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে পূরণ হতে থাকে ধারাবাহিক ভাষা আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে। শিশুরা নিজেদের লক্ষ্য-ভাষার বাক্যিক ফিচার বা বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করার জন্য তাদের প্রাথমিক ভাষিক একক দ্বারা ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে থাকে; যার প্রকৃত রূপ ও প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে (Pain, Lieven, Rowland, 1998; Tomasello, 2000)। বাঙালি শিশু ভাষায় প্রাপ্ত ফাই-বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, বাক্য অর্জনের প্রাথমিক স্তরে শিশুরা ক্রিয়ারূপের যথাযথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী না হলেও তার সম্প্রসারিত রূপ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অসমর্থ নয়। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে শিশুটি ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ বাক্যিক অবস্থান মেনে ক্রিয়ারূপের সম্প্রসারিত রূপ বসাতে না পারলেও সে তা ব্যবহার করছে। এমনকি ছদ্মক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সে সম্প্রসারণ ব্যবহারে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। আবার শিশুদের প্রাথমিক বাচনে আরেকটি বিষয় লক্ষ করা গেছে, তা হলো বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ারূপকে কেন্দ্রীয় হিসেবে বিবেচনা করা। তারা যখন ক্রিয়া ব্যবহার শুরু করে আর তাদের একাধিক শাব্দিক শ্রেণি নির্বাচনের সুযোগ থাকলেও তারা ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে বেশি।

আবার শিশুরা যখন বিশেষ্য ব্যবহার শুরু করে তখনও তারা সেটিকে অনেক সময় ক্রিয়ারূপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। শিশুদের এই ভাষিক বোধগুলোর মধ্যে একটি সর্বজনীনতা লক্ষ করা যায় এবং এই বোধগুলো মানব শিশু মাত্রই সহজাতভাবে প্রাপ্ত। শিশুরা ধীরে ধীরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুসরণ করে ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। তাই শিশুদের প্রাথমিক বাচনে বিপুল পরিমাণ ভাষা ঘাটতি থাকবে তা স্বাভাবিক এবং তা ভুল হিসেবে বিবেচনা করা অযৌক্তিক। বরং শিশুরা যখন তাদের সীমিত ব্যাকরণিক জ্ঞানকে বহুভাবে ব্যবহারে উদ্যোগী হয় তখনই ভাষায় অধিক পরিমাণ অযথাযথ রূপ পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে বিষয়সমূহ লক্ষ করা গেছে তা হলো: বাঙালি শিশুদের বাক্য আয়ত্তীকরণের বিষয়টি অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ; যদিও তারা বাক্য আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করে থাকে। বাঙালি শিশুরা ক্রিয়ার যেকোনো একটি সম্প্রসারিত রূপ ব্যবহার করে থাকে। পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের কোনো সুনির্দিষ্টতা না থাকলেও কালের ক্ষেত্রে বাঙালি শিশুরা বেশিরভাগ সময় বর্তমান কাল তথা সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহার করে থাকে। আর শিশুর প্রাথমিক ক্রিয়ারূপ নির্বাচনে শিশুর চাহিদার অগ্রাধিকারের পাশাপাশি ভাষিক প্রতিবেশেরও একটি গুরুত্ব রয়েছে। এই গবেষণার সংগৃহীত উপাত্তে বাঙালি শিশুভাষায় প্রো-ড্রপ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শিশুরা যখন প্রাপ্তবয়স্কদের অনুসরণ করে কর্তা উহ্য রেখে বাক্য গঠন করে তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়ারূপ অধিকতর গুরুত্ব পায়। বাংলা ভাষার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বাঙালি শিশুরা বাক্য আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহারে সক্ষমতা দেখিয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি বাঙালি শিশুর বাংলা বাক্যিক সংগঠন আয়ত্তীকরণ বিশ্লেষণের একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় শিশুর ভাষা অর্জন নিয়ে আরও বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটি আরও অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্রে শিশু ভাষা নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনাকে উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

দানীউল হক । (২০০৭)। *ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিক্ষণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মিথুন ব্যানার্জী। (২০১৮)। বাঙালি শিশুর ধ্বনি আয়ত্তীকরণ। *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৯, সংখ্যা ১২-১৩

Adger, D. (2002). *Core Syntax: A Minimalist Approach*. Oxford. Oxford: University Press.

Akhtar, N. and Tomasello, M. (1997), Young children's productivity with word order and verb morphology. Developmental Psychology 33, 952-965.

Bellugi, U. & Brown, R. (1964). The acquisition of language. *Monographs of the Society for Research in Child Development, 29* (No. 92)

Behrens, H. (2001). Cognitive-conceptual development and the acquistion ofgrammatical morphemes: the development of tiem concepts and verb tense. In M. Bowerman & S. C. Levinson (Eds.), *Language Acquisition and Conceptual Development* (pp. 406-449). Cambridge: Cambridge University Press.

Bowerman. *Monographs of the Society for Research in Child Development, 41*. Brown, J.D. (2005). *Testing in Language Programs: A Comprehensive Guide to English Language Assessment*. New York: McGraw Hill.

Brown, R. (1973). *A First Language. The Early Stages* .London: George Allen & Unwin.

Clahsen, H., & Penke, M. (1992). The acquisition of agreement morphology and its syntactic consequences: New evidence on German child language from the Simonecrpus. In J. Meisel (ed.), *The acquisition of verb placement: Functional categories and V2 phenomena in language acquisition* (pp. 181-223). Dordrecht: Kluwer.

Clark, H. H. (1992). *Arenas of Language Use*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Fraser, C. (1966) "Discussion of 'The Creation of Language.' " In John Lyons and Roger J. Wales, eds.

Gathercole, V. C. M., Sebastián, E., & Soto, P. (1999). The early acquisition ofSpanish verbal morphology: Across-the-board or piecemeal knowledge? *TheInternationa Journal of Bilinguialism, 3*(2-3), 133-182.

Guasti, M. T. (1994). Verb syntax in Italian child grammar: Finite and nonfiniteverbs. *Language Acquisition, 3(1),* 1-40.

Hoekstra, T., & Hyams, N. (1998). Aspects of Root Infinitives. *Lingua, 106*, 81-112.

Hyams, N. (1992). Morphosyntactic development in Italian and its relevance toparemeter-setting models: comments on the paper by Pizzuto & Caselli. *Journal of Child Language, 19*, 695-709.

López, Ornat, S.,; Fernández, A., Gallo, P. & Mariscal, S. (Eds.) (1994). *Adquisiciónde la lengua española*. Madrid: Siglo XXI.

Pine, J. M., & Lieven, E. V. M ., Rowland, C. F (1998).Comparing different models of development of English verb category. *Linguistics 36*(04), 807-830.

Mellow, J.D., Reeder, K. & Forster. E. (1996). `Using time-series research desings to investigate the effects of instruction on SLA'. *Studies in Seceond Language Acquisition*. 18: 325-50.

Miller, J. (1981). *Assessing language production in children*. Baltimore: University Park Press.p.111-136.

Owens, R. E. (2005) *Language development: an introduction*, 6th edition, USA. Pearson.

Poeppel, D., & Wexler, K. (1993). The Full Competence Hypothesis of ClauseStructure in Early German. *Language, 69*(1), 1-33.

Piaget, J. (1946). *Judgment and Reasoning in the Child*. London: Routledge.

Robson, C. (2002). *Real World Research*. UK: Blackwell Publishing Ltd.

Rizzi, L. (1994). Some Notes on Linguistic Theory and Language Development: The Case of Root Infinitives. *Language Acquisition, 3* (4), 371-393.

Sultana, A. (2015). *Morphosyntactic development of typically-and atypically-developing Bangla-speaking children* [Doctoral dissertation]. University of Canterbury.

Sultana, A. (2021). Early Verb Morphological Development of a Banglaspeaking Child, Language Learning and Development, DOI: 10.1080/15475441.2021.1875832

Tomasello, M. (1992). *First Verbs.* Cambridge: Cambrige University Press.

Tomasello, M. (2000). The item-based nature of children's early syntacticdevelopment. *Trends in Cognitive Sciences, 4*(4), 156-163.

Tomasello, M. (2000). Acquiring syntax is not what you think. In D. V. M. Bishop & L. B. Leonard (Eds.), *Speech and Language Impairments in Children* (pp. 1-15). Hove: Psychology Press.

Tomasello, M. (2000). Do young children have adult syntactic competence? *Cognition, 74*, 209-253.

Tomasello, M. (2003). *Constructing a Language. A Usage-Based Theory ofLanguageAcquisition*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Wexler, K. (1998). Very early parameter setting and the unique checking constraint: A new explanation of the optional infinitive stage. *Lingua, 106*, 23-79.

Wexler, K. (1999). Maturation and Growth of Grammar. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), *Handbook of Child Language Acquisition* (pp. 55-110). London: Academic Press.

সংযুক্তি-০১ সাধারণ চিত্র (সূত্রঃ google image)

সংযুক্তি-০২ (ক্রিয়ারূপ সংবলিত চিত্রভিত্তিক অভীক্ষা) (সূত্রঃ google image)

চিত্র নং- ০১

চিত্র নং- ০২

চিত্র নং- ০৩

চিত্র নং- ০৪

চিত্র নং- ০৫

চিত্র নং- ০৬

চিত্র নং- ০৭	চিত্র নং- ০৮
চিত্র নং- ০৯	চিত্র নং- ১০
চিত্র নং- ১১	চিত্র নং- ১২
চিত্র নং- ১৩	চিত্র নং- ১৪
চিত্র নং- ১৫	চিত্র নং- ১৬

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা: একটি কালানুক্রমিক পর্যালোচনা

আজিজুর রহমান*

Abstract : In course of all movements leading to the liberation of Bangladesh, Rabindranath Tagore is an indispensable name in conceiving Bengali nationality. In all difficulties and woes, Bengalis have sought the source of inspiration in Tagore's songs. In socio-political crisis and democratic movements of twentieth century, the progressive Bengali people sang his songs as a symbol of protest, and an expression of solidarity. After the independence of Bangladesh, Tagore's songs have become an integral part of our national culture. This article is an endeavour to present an analytical review of the practice of Tagore's music in Bangladesh.

বাংলার কবি, বাঙালির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবিতকালেই এই বাংলায় এবং বাংলার বাইরে বাংলাভাষীদের মধ্যে এক ধরনের অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে ব্রিটিশ প্রদত্ত নাইট উপাধি আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন তাঁকে বৃটিশ বিরোধী বাঙালিদের কাছে প্রিয়তর করে তুলেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৩ সালে প্রথম ভারতীয় বাঙালি হিসাবে নোবেল প্রাইজ অর্জন। সেই ত্রিশের দশকেই রবীন্দ্রসাহিত্য এই বাংলার স্কুল কলেজে পাঠ্য ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং গ্রামোফোনের কল্যাণে এ দেশের শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। পূর্ববাংলার শিক্ষিত বাঙালি সমাজ অনুরক্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়। সেই ত্রিশ, চল্লিশের দশকেই ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক। ফকরুল আলম তাঁর 'বাংলাদেশের জাতিসত্তা গঠনে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে উদ্ধৃতিসহ এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। (ফকরুল আলম, ২০১১, ১৭২)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের সাথে প্রথম বিরোধ শুরু হয় জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে। জাতির পরিচয় পাওয়া যায় তার ধর্ম, কর্ম, সংস্কৃতি, অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক অবয়ব, গায়ের রং এ। বাঙালি জাতির প্রধান সম্পৃক্তি এর ভাষার সাথে। এই ভাষার প্রশ্নেই প্রথম দমন শুরু করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুঝেছিল ভাষা-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিসত্তায় আঘাতই হবে বাঙালিকে যথার্থ আঘাত। ১৯৪৮ সালেই বাঙালি বুঝে নিয়েছিল দমন পীড়নের প্রধান লক্ষ্যবস্তু বাঙালি সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এই অর্থে বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ভাষার প্রশ্নে প্রাথমিক বিজয় সূচিত হলেও ৫২ থেকে ৭১ পর্যন্ত বাঙালিকে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে উর্দু, আরবি ভাষার আগ্রাসনে মুসলমানি বাংলা, পাকিস্তানি বাংলার বিরুদ্ধে। বাঙালির বাংলা রক্ষায়, ভাষা, সাহিত্য, সংগীত রক্ষায় যেমন অন্যতম অবলম্বন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান আঘাতের বস্তুও ছিলেন তিনি। "বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে/পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে" গানটি পূজা

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যায়ের আত্মবোধ উপপর্যায়ের গান। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উল্লেখ্য দুটি লাইন খুবই প্রাসঙ্গিক পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে সারা বিশ্বে বাংলাভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রজন্মোৎসব কমিটি সরকারের রোষানলে পড়ে উৎসব পালন করতে গিয়ে, ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হয়। 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' ছিল সেসময় ঢাকার একমাত্র সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে এই একাডেমীর শিক্ষক ভক্তিময় দাশগুপ্তের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। ঢাকা ড্রামা সার্কেল পরিবেশন করে 'তাসের দেশ'। চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহীতেও আয়োজিত হয় জন্মশতবর্ষ উৎসব। প্রদেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে জনমানসে পরিচিত, ক্ষেত্রবিশেষে জনপ্রিয় করে তোলে। অন্যদিকে পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রপক্ষ-বিপক্ষের বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত বাঙালির কাছে একটি জীবন্ত সত্ত্বায় পরিণত হন।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সফল উদ্‌যাপন তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। এঁদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে গঠিত হয় ছায়ানট। রবীন্দ্রসংগীত চর্চা প্রসঙ্গে, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার ঝড় এই গানকে ক্রমে বাঙালির প্রাণের গান করে তোলে। স্বাধীনতার অভিযাত্রায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাঙালির প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে রবীন্দ্রসংগীত। এই সময়ে রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষণ, চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ও ছায়ানট। স্বাধীনতার পূর্বেতো বটেই, উত্তরকালেও স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছায়ানট। স্বাধীনতার পূর্বে বিশেষ করে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে সভা সমিতিতে অন্যান্য গানের পাশাপাশি গণসংগীত হিসেবে গীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। এসব পরিবেশনায় 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই' এর মতো রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াটাই মুখ্য ছিল, সুর ও স্বরলিপির শুদ্ধতা গুরুত্ব পায়নি তেমন করে (যদিও ছায়ানটের শিক্ষাদান স্বরলিপি মেনেই হত)। স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার সুরগত যথার্থতা, শিক্ষার নিষ্ঠা প্রাধান্য পেতে থাকে।

১৯৮০ সালে 'জাহিদুর রহীম স্মৃতি পরিষদ' গঠিত হয়। ষাটের দশকের বাঙালি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী শিল্পী জাহিদুর রহীম স্বাধিকার, স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন অবলম্বন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, যে কোনো সভা সমিতিতে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে, সত্তর এর দশকে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা ও প্রসারেও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। জাহিদুর রহীম প্রয়াত হন ১৯৭৮ সালে। এই পরিষদ প্রয়াত শিল্পী জাহিদুর রহীমের মৃত্যুদিনে ঢাকায় রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ১৯৮০ সালে। পরের বছর চারটি বিভাগীয় শহরে প্রতিযোগিতা করে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় ঢাকায়। ক্রমান্বয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এ কার্যক্রম। প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে আয়োজন করা হয় 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন'। দেশব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন সারাদেশের রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমীদের (শিল্পী, শিক্ষক, শ্রোতা, সমালোচক) নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পরবর্তীকালে 'জাহিদুর রহীম স্মৃতি পরিষদ' নাম পাল্টে সাংগঠনিক নামকরণ হয় 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ'। ১৯৮১ থেকে আজ পর্যন্ত 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের' উদ্যোগে প্রতি বছর এই সম্মেলন আয়োজিত হয়ে আসছে, পালাক্রমে এক বছর ঢাকায় এবং পরের বছর অন্য কোনো জেলা শহরে। বর্তমানে 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের' শাখা প্রত্যেক জেলায় তো বটেই, রয়েছে অনেক উপজেলা শহরেও। সম্মেলনে শাখার প্রতিনিধিরা

স্থানীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা সংক্রান্ত সমস্যা এবং তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। আয়োজিত হয় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক সেমিনার 'রবিরশ্মি', সান্ধ্য অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করেন সারাদেশ থেকে আগত শিল্পীরা, পরিবেশিত হয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ' জন্মলগ্ন থেকেই সারা দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে 'ওয়াহিদুল হক সংগীত প্রব্রজ্যা' নামে পরিচালিত হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান রাখছে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চায়। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সম্মেলনে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সারাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার একটা চিত্র পাওয়া যায় জাতীয় সম্মেলনে। (প্রাবন্ধিক জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ এর একজন সক্রিয় কর্মী, সংগঠক ও প্রশিক্ষক)

১৯৮৩ সালে শিল্পী কলিম শরাফীর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতন থেকে সংগীত বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিল্পীদের নিয়ে বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) সংগীতভবনের আদলে গঠিত হয় সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সংগীত ভবন'। আশির দশকে ছায়ানট এবং অন্যান্য সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি কোর্স থাকলেও কোন বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম ছিল না। সংগীত ভবন পাঠ্যক্রম ভিত্তিক শিক্ষা দেয়া শুরু করে। বিভিন্ন পর্যায় এবং অঙ্গভিত্তিক বিভাগ ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হয় রবীন্দ্রসংগীতের মূলগান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। (সংগীত ভবনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রশিক্ষক হাসি বিশ্বাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য) এই পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা, সমকালে তরুণ জনপ্রিয় শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সাদী মোহাম্মদ তকিউল্লাহ, আমিনুর রহমান নিঝু, সর্বোপরি বর্ষীয়ান শিল্পী কলিম শরাফীর প্রশিক্ষণ সংগীত ভবনকে অচিরেই জনপ্রিয় করে তোলে। ঢাকায় রবীন্দ্রসংগীত চর্চা এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে সংগীত ভবন।

১৯৮৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা'। (বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা'র প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক শিল্পী তপন মাহমুদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য) জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের সংগঠন বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রতিবছর আয়োজন করে তিনদিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত উৎসব'। এছাড়াও প্রতিমাসে আয়োজন করে শ্রোতার আসর, পালন করে রবীন্দ্রজন্মোৎসব ও প্রয়াণদিবস। 'বাংলাদেশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সংস্থা' প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জড়িত না থাকলেও, সংগীত অনুষ্ঠান আয়োজনের এই নিয়মিত কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে।

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি 'বর্ষামঙ্গল' এর আয়োজনকে কেন্দ্র করে সমকালীন নবীন শিল্পী ও শিক্ষক সাদী মোহাম্মদ তাঁর কিছু শিষ্য ও অনুসারীদের নিয়ে গঠন করেন রবীন্দ্রসংগীত সংগঠন 'রবিরাগ'। (রবিরাগ-এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী সাদি মোহাম্মদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। একঝাঁক নবীন শিল্পীদের নিয়ে গঠিত 'রবিরাগ' অল্পদিনেই সংগীত অঙ্গনে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত অঙ্গনে বেশ আলোচিত সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রবিরাগের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে নতুনত্ব এবং নৈপুণ্য বেশ সাড়া জাগায় রবীন্দ্রশ্রোতৃমহলে। বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজন ছাড়াও 'রবিরাগ' অদ্যাবধি প্রতি মাসে আয়োজন করে আসছে মাসিক শ্রোতার আসর। রবিরাগের ভূমিকা শুধু নতুন শ্রোতা সৃষ্টি বা রবীন্দ্রসংগীতচর্চার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি বরং এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী দশকে ঢাকায় সংগঠিত হয় বেশ ক'টি রবীন্দ্রসংগীত সংগঠন। যাদের সামগ্রিক চর্চায় সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত অঙ্গন। সমকালীন ও তৎপরবর্তী অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিশ্ববীণা, গীতসুধা, রবিরশ্মি ইত্যাদি।

শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'সুরের ধারা'। সুরের ধারা স্বরলিপিভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি শান্তিনিকেতনের গুরুপরম্পরাভিত্তিক সুরে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়। (প্রাবন্ধিক সুরের ধারার সংগঠক ও প্রশিক্ষক) আশির দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত ভবন' শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষিত শিল্পীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং একই শিল্পীদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে সরব উপস্থিতির কারণে শান্তিনিকেতনের গায়নশৈলী, গায়কী সম্বন্ধে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন ঢাকা তথা দেশের রবীন্দ্র অনুরাগী। শিল্পী কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের আশীর্বাদপুষ্ট 'সুরের ধারা' শান্তিনিকেতনের গায়কীতে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদানে সবাক ও স্পষ্টভাষী হল। ছায়ানট ও জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের কঠোর স্বরলিপি নির্ভর প্রশিক্ষণের সমান্তরালে সুরের ধারার শান্তিনিকেতনে প্রচলিত গায়নশৈলীর প্রশিক্ষণ এবং নতুন শিল্পীসৃষ্টি দেশের রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে।

'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থে অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ *Pakistan observer, Morning News* এবং *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন -

> "১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, বেতার ও টেলিভিশন থেকে পাকিস্তান বিরোধী রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" (সূত্র: গোলাম মুরশিদ, ১৯৯৩ : ১৮৬)

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় জনাব মুরশিদ পূর্ববঙ্গের ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করেন। এতে দুটি বিষয় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, প্রথমত ষাটের দশকেই সরকারি প্রচারমাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হতো, দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রসংগীত সে সময় বাঙালির প্রাণের গান হয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতার চল্লিশোর্ধ বছর পরে বেতার, টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ব্যাপ্তি বেড়েছে অনেক। শুধু গানই নয়, পরিবেশিত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে গবেষণাধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সরকারি প্রচারমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়াও নতুন সহস্রাব্দে দেশে অনেক স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং এফ,এম রেডিও হয়েছে। এসব টেলিভিশন, রেডিওতে উল্লেখযোগ্য সময় ধরে প্রচারিত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতা বেড়েছে অনেক, বেড়েছে শিল্পীসংখ্যা, শ্রোতার আগ্রহকে পুঁজি করে শিল্পীদের মধ্যে বেড়েছে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের বোদ্ধা শ্রোতা এখন শুধু জনপ্রিয় কিছু রবীন্দ্রসংগীত শুনেই তৃপ্ত নন, রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে তারা জানতে চান রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে।

গত শতকের শুরুতে যন্ত্রপ্রযুক্তির প্রভাব আবহমান বাংলার গানের ধরন পাল্টে দিল, বাংলা গান art music থেকে পরিণত হলো music industry তে। গ্রামোফোন, বেতার, সিনেমার কল্যাণে শ্রোতাসংখ্যা বৃদ্ধি পেল বহুগুণে, গান পরিণত হলো ক্রেতা সামগ্রীতে (consumer product), রসজ্ঞ শ্রোতার স্থানে আসলো সংখ্যাতীত ভোক্তা-ক্রেতা, ভোক্তার রুচি প্রভাবিত করল বিক্রয়যোগ্য গানকে। রবীন্দ্রনাথের গান রচনারম্ভ, বাংলা গানে এই সংগীত- বাণিজ্য আবির্ভাবের পূর্ব সময়ে এবং যে সময়ে গ্রামোফোন, বেতার, সিনেমা বাংলা গানকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে, রবীন্দ্রনাথ সেসময়ে শান্তিনিকেতনে, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গীতরচনা ছিল বাণিজ্যিক

প্রভাব মুক্ত। নিশ্চিতভাবেই তাঁর গান আত্মোপলব্ধ। আত্মোপলব্ধ বলেই রসোত্তীর্ণ, শিল্পবিচারে কালোত্তীর্ণ। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহমান- একটি বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপি-নির্ভর, দ্বিতীয়টি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রভাবে স্বরলিপি এবং গুরুপরম্পরানির্ভর। স্বাধীন বাংলাদেশে, গত শতকের সত্তর এর দশকে ছায়ানট এবং আশির দশকে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ স্বরলিপি নির্ভর যে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা শুরু করে, কয়েক বছরের মধ্যেই নবীন শিল্পীদের সৃষ্ট নতুন সংগঠন ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের গীতপরম্পরা ভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীত চর্চার এক নতুন মাত্রা এর সাথে যুক্ত হয়। তৃতীয় ধারাটি স্পষ্টত কোনো ধারাই নয়, এটি রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে বাণিজ্যচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ধারাতেও সবটুকু বাণিজ্যচেষ্টা বা বাণিজ্যিক উপকরণ হিসাবেই রবীন্দ্রসংগীতকে ব্যবহার করা হয়েছে তা বলা যাবে না। নতুন প্রজন্মের উপলব্ধিগত সততার পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। যদিও তা অভ্যস্ত রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার কানে অন্যরকম লাগতে পারে।

প্রথমোক্ত ধারা, অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপি নির্ভর ধারাটির উপর আলোকপাত করা যাক। অধ্যাপক সন্‌জিদা খাতুন তাঁর একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "সঙ্গীত গুরুমুখীবিদ্যা একথা সকলেই জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের কাছ থেকে শিখবার সুযোগ আমাদের নেই, তাঁরা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। গুরুমুখী বিদ্যালাভের আশা ছেড়ে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য আমাদের প্রধানত স্বরলিপির উপর নির্ভর করতে হয়।"(সন্‌জিদা, ২০১১ : ৪২)

তিনি উল্লেখ করেছেন রেকর্ড ও স্বরলিপির সুরের সামঞ্জস্যহীনতার কথা— রেকর্ড, রেডিওতে শোনা গানের স্মরণ বিস্মরণের দোলচালে প্রতিনিয়ত স্বকীয়তা হারাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। উল্লেখ করেছেন রাজধানী ও মফস্বল শহরের সংগীত শিক্ষক, বিশেষ করে গৃহশিক্ষকের প্রসঙ্গ, যাদের হাতে নিয়ত বিকৃত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুর। অতঃপর তাঁর দাবী এই যে, স্বরলিপিকে এমনভাবে করে তুলতে হবে যাতে তা থেকেই যথেষ্ঠ নির্দেশ পাওয়া যায়, যাতে আন্তরিক আগ্রহ এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সাহায্যে গুরুমুখী শিক্ষার অসদ্ভাবের সমস্যা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রপথিক 'ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন' এবং স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত ধরে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত সংগঠন 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ'(এখন প্রায় সবকটি জেলায় এমনকি অনেক উপজেলা পর্যায়েও রয়েছে এই সংগঠনের শাখা) বিশুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি নির্ভর ধারায় চর্চা করে থাকে। প্রচার মাধ্যমের শ্রুতিনির্ভর ও গৃহশিক্ষক নির্ভরতার বিপরীতে এই একান্ত স্বরলিপিনির্ভর ধারাকেই বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় বৃহত্তর ধারা বলা যেতে পারে।

সংগীত শিক্ষণে স্বরলিপির প্রতি একান্ত নির্ভরতার সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক-

বাংলাগানে স্বরলিপির, আকারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যবহার দেড়শো বছর অতিক্রম করেনি। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের সুর রক্ষা শুরু হয়েছে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। এর আগে প্রায় দেড় দশক ধরে চলছিল কসিমাত্রিক ও সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপির পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি ত্রুটিসংশোধনের পথ ধরে ক্রমান্বয়ে একটি বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক স্বরলিপি পদ্ধতি হয়ে উঠার ইতিহাসও রবীন্দ্রনাথের গানকে কেন্দ্র করেই।স্বরতীক্ষ্ণতা (pitch),

লয় (tempo), স্বরের মৃদুতা ও প্রবলতা, ধ্বনির হ্রাস-বৃদ্ধি (dynamic) ইত্যাদি নির্দেশ আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। স্বরলিপি প্রচলনের প্রথম যুগে, *সাধনা* পত্রিকায় (পৌষ ১২৯৮), স্বরলিপি গীতিমালায় (১৩০৪ বঙ্গাব্দ), সরলা দেবী সম্পাদিত শতগানে (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরতীক্ষ্ণতা, লয়, ধ্বনির হ্রাসবৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এবং চিহ্নসমুহ উল্লেখ করলেও আমরা জানি যে পরবর্তী সময়ে, আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে এই চিহ্নগুলি নেই। [৯] (সন্‌জিদা, এপ্রিল ২০০৪ : ৫১,৫২) অর্থাৎ সংগীতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক উপাদানসমূহের অসম্পুর্ণতা রয়ে গেছে আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে। বাংলা গানে এই বিষয়গুলি শুনে, গুরুর তত্ত্বাবধানেই আয়ত্ত করতে হয়। আত্মউপলব্ধি নির্ভর একক কণ্ঠে গীত উপমহাদেশীয় সংগীত বিকশিত হয়েছে এই ধারায়। (ইউরোপীয় সংগীতধারার ক্যাথিড্রাল চার্চ কেন্দ্রিক Gregorian Chant-এর সম্মেলক পরিবেশনা আমাদের সংগীতে নেই, আমাদের কীর্তন, পাঁচালী, যাত্রায়, কবিগানে দোহারের বৃন্দকণ্ঠে একক পরিবেশনারই অনুরণন)। আমাদের গানের ধরনই এমন যে এটা শুনে শিখতে হয়। এই শ্রুতিনির্ভরতা কালের প্রবাহে রচয়িতার মূল সুর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অপরিণত গায়কের কণ্ঠে গান রূপভ্রষ্ট হয় এখানে। এই চিত্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বের গীতিকারদের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি রবীন্দ্রপরবর্তী গীতকাররাও রেহাই পাননি গায়ককৃত এই সুরপরিবর্তনের হাত থেকে। এমন অনেক নজরুল সংগীতের উদাহরণ দেয়া যাবে যেগুলো কবির স্বকণ্ঠে গীত, পরবর্তীকালে গায়ক সুরবিহারের অভ্যাসবশে তাঁর সুর আমূল পরিবর্তন করেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর সংগীত শিক্ষায় স্মৃতি বিভ্রমের আশংকা থেকে যায় বৈকি, আশংকা থেকে যায় সুরভ্রষ্টতার যা রবীন্দ্রনাথ চাননি, তিনি তাঁর গানে এ স্বাধীনতা দেননি। দীলিপ কুমার রায়ের সাথে আলোচনায় কবি বলেছেন-

> "আমি তো নিজের রচনাকে সেরকমভাবে খণ্ড বিখণ্ড করার অনুমতি দেইনি... যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম... হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে এটা যে চেয়েছিলেন... আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯ : ৯৬)

তবে রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে একান্ত স্বরলিপি নির্ভরতাই কি শেষ কথা? ঠাকুরবাড়িতে আবাল্য গানের আবহে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্তানি সুরকে ধারণ করেছেন তাঁর সংগীত চেতনায়। হিন্দুস্তানি সুরের অনুপ্রেরণায়, সেই গানের নির্যাস গ্রহণ করে, সেই গানের ধরনকে ভুলে গিয়ে তিনি রচনা করেছেন নতুন ধরণের বাংলা গান: রবীন্দ্রসংগীত। তাঁর মতে,

> "আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিনীর টুকরাগুলি পাইয়াছি, সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগ রাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। ...আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরী হোক না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাহকে একাটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।"(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৯: ৫৬)

হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের এবং অবশ্যই রাগসংগীত প্রভাবিত বাংলাগানের তথা রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যই হলো এর শ্রুতির ব্যবহার। আমাদের সংগীত স্বর নয়, সুরকে প্রাধান্য দেয় এবং সে সুর অন্য সুরের সাথে শ্রুতির যোগে যুক্ত। স্বরলিপিতে, আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে এ বিষয়ে (সুর ও শ্রুতি) কোনো নির্দেশনা নেই। আকার মাত্রিক স্বরলিপি সংগীতের স্বরসংস্থানের কাঠামো দিতে পারলেও আমাদের গানের স্বরসঙ্গতির ব্যঞ্জনা দিতে অক্ষম। যেমন ধরা যাক ভৈরবী সুরের গান 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে'। গানটির স্থায়ী অংশের স্বরলিপি উল্লেখ করছি-

II{ সা -া মা । মা মা মা । পা দণা দপা । মা জ্ঞরা জ্ঞা I
অ ন্ ত র ম ম বি ক০ শি০ ত ক০ রো
I ঋা -সা ঋা । জ্ঞমা জ্ঞা ঋা । সা -া -া । -া -া -ঋা }I
অ ন্ ত র০ ত র হে ০ ০ ০ ০ ০
I {জ্ঞা -রা জ্ঞা । জ্ঞা -রা জ্ঞা । রজ্ঞা -মপা পা । মা জ্ঞা ম্জ্ঞঋা I
নি র্ ম ল ক রো উ০ ০০ জ্জ্ব ল ক রো
I সা -ঋা সঋা । জ্ঞমা -জ্ঞা ঋা । সা -া -া । -া -া (ঋা)}I
সু ন্ দ০ র০ ক রো হে ০ ০ ০ ০ ০
I সা দা দা । দা -পা ম্পজ্ঞা । পদা -ণা ণা । দা মপা মা I
নি র্ ম ল ক রো উ০ ০০ জ্জ্ব ল ক রো
I মা -পা জ্ঞা । মা দপা মা । জ্ঞা -া -া । -ঋা -সা -ঋা II
সু ন্ দ০ র০ ক রো হে ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫)

আশ বা মীড়ের স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও ভৈরবী সুরের গানটিতে ষড়জ থেকে মধ্যম যেতে শ্রুতির পথ ধরেই যাওয়া উচিৎ। তবেই তা ভৈরবী সুর বলে মনে হবে। এমনকি ভাঙা গানের ক্ষেত্রে মূল গান 'Drink to me only with thyne eyes' এর স্বর প্রয়োগ এবং ভাঙা গান "কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া" সুর প্রয়োগ একই রকম হবার কথা নয়। মূল গানটির স্বরলিপিতে গাওয়া এবং বাজানোর ক্ষেত্রে স্বর প্রয়োগের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও ভাঙা গানে (কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া) আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে সেই নির্দেশনা স্পষ্ট নয়। স্বরনির্ভর পাশ্চাত্য গানে স্বর ঠিক রেখে গাওয়াটাই যথেষ্ঠ, কিন্তু সুরনির্ভর (melody), শ্রুতিনির্ভর বাংলাগানে, রবীন্দ্রসংগীতে স্বর ঠিক রেখে গাওয়াটা যথেষ্ঠ নয়।

পাশ্চাত্য স্বরলিপি পদ্ধতির বয়স সহস্রাধিক বর্ষ। সপ্তম শতকে ক্যাথিড্রাল চার্চকেন্দ্রিক সম্মেলক সংগীতচর্চায় উদ্ভূত ও ব্যবহৃত এই পদ্ধতি প্রয়োজনের তাগিদেই গুরুমুখিতার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে লিখিত ধরনকে। প্রথমে সুর প্রধান (melodic) হলেও পরবর্তী অর্থাৎ অষ্টম শতকে দ্বিস্বরিক (Biphonic) সঙ্গীত এবং বার শতকে তা পরিপূর্ণ ঐকতানিক (harmonic) সংগীতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে সতের শতকে ব্যারক যুগে পাশ্চাত্য সংগীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য Basso Contenuo বা Figured Bass এই ঐকতানকে আরো সুসংহত করে। এই ঐকতানিক প্রত্যেক ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছে স্বরলিপি নির্ভরতা। এইভাবে পাশ্চাত্য সংগীত এবং notation পরস্পরের পরিপূরকতায় বিবর্তিত হয়েছে। সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী বিবর্তিত এই পদ্ধতি সুর, ছন্দ, মাত্রা ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিবরণ সহযোগে অধিকতর উপযোগিতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির বয়স এখনো দেড়শো বছর অতিক্রম করেনি। আমাদের গুরুমুখী সংগীত পরম্পরায় এই পদ্ধতির প্রতি একান্ত নির্ভরতার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত নয়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের বরাত দিয়ে অধ্যাপক সন্‌জিদা খাতুন জানিয়েছেন

> "সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ হয়ে স্বরলিপি শিক্ষাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তাঁকে, তাঁর ভাষায় সর্বসাধারণ আশ্রমবাসী বিরুদ্ধতা করেছেন এই ভেবে যে, গুরুদেবের গানগুলি মেকানাইজড হয়ে যাবে।"(সন্‌জিদা, ১৪১১ : ৬০)

আমাদের দেশে একান্ত স্বরলিপি নির্ভর রবীন্দ্রসংগীতের ধারাটি আশ্রমবাসীর এই আশঙ্কার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সন্‌জিদা খাতুন তাঁর *সংস্কৃতি-কথা সাহিত্য-কথা* গ্রন্থে *রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপির কথা* প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপিকার, গায়ক ও শিক্ষকগণের স্মৃতিবিভ্রাটের কথা তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক আমাদের জানিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের আদি যুগের শিল্পীদের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে, রবীন্দ্রসংগীতাচার্যগণ একই গান ভিন্ন ভিন্ন সুরে, তালের ভিন্নতায় গেয়ে থাকতেন। বিশেষ করে বাউল, কীর্তন অঙ্গের এমন অনেক গানের উদাহরণ দেয়া যাবে যে স্বরলিপিতে চতুর্মাত্রিক ছন্দে লিখা আর রবীন্দ্রনাথের কাছে সরাসরি শেখা শান্তিনিকেতনের সংগীতগুরুগণ ত্রিমাত্রিক ছন্দে গেয়ে থাকেন এবং পরম্পরাগত ভাবে এই সুরই শান্তিনিকেতনে প্রচলিত। (উদাহরণস্বরূপ— আজ খেলা ভাঙার খেলা, আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে)। কবির শান্তিনিকেতন জীবনে, তাঁর ৪৮ বছর বয়সে লিখা গান- *ওই আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব* গানটির স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু গানটি একেবারেই ভিন্ন সুরে গেয়ে থাকেন রবীন্দ্রশিষ্য শান্তিদেব ঘোষ। গানটির ৩৭ নম্বর স্বরবিতানে উল্লেখিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি এবং শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে গীত সুরের স্বরলিপি কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি-

স্বরবিতানে উল্লেখিত স্বরলিপি-

১	০	১	১	॥
রা গা II{ মা -া পা া। মপা ধা পা (-া I	-া -ধা -মা -পা। গা মা রা -গা)}I -া I			
ও ই আ ০ স ন্ ত০ লে ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ র্ ও ই র্			
I পা -ধা না র্সনা। ধা নধা পা -ধা I ধা	র্সা র্সা -া। না র্সনা ধা -নধা I			
মা ০ টি ০র প ০০ রে ০ লু ০ টি	০ য়ে ০০ র ০০			
I পা -ধা মা পা। গা মা { রা -গা I মা	া পা -া। মপা ধা পা (-া I			
ব ০ ০ ০ ০ ০ ও ই আ ০ স	ন্ ত০ ০ লে ০			
I া -ধা মা পা। গা মা রা -গা)} I -া I র্সা	া র্সা -া। র্সা -া র্সা -া I			
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ই র	তো ০ মা র্ চ ০ র ন্			
I র্রা -র্সা র্রা র্সা। র্রা -র্সা র্সা -না I না	-র্সা র্সা -া। না -সর্না ধা -ণধা I			
ধু ০ লা য় ধু ০ লা ০	ধু ০ স ০ র ০০ হ ০০			
I পা -ধা -মা -পা। -গা	-মা রা -গা II			
ব ০ ০ ০ ০ ০ ও ই				

(রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৩৭)

শান্তিদেব ঘোষ গীত সুর অবলম্বনে প্রাবন্ধিক কৃত স্বরলিপি-

র্ঽ ০ ১ র্ঽ ॥
রা গা II{ মা -া পা পা। মপা ধা পা (-া I-া -ধপা -মা -মপা। -গা -মগা রা -গা)}I -া I
ও ই আ ০ স ন ত০ লে ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ র্ ও ই র্
I পা -ধা না র্সনা। ধা নধা পা -ধা I ধা র্সা র্সা -া। না র্সনা ধা -নধা I
মা ০ টি ০র প ০০ রে ০ লু ০ টি ০ য়ে ০০ র ০০
I পা -ধপা মা পমা। গা মগা { রা -গা I মা া পা -া। মপা ধা পা (-া I
ব ০০ ০ ০০ ০ ০০ ও ই আ ০ স ন্ ত০ ০ লে ০
I া -ধপা মা পমা। গা মগা রা -গা)} I -া I পা ধা ধা -র্সা। র্সা -া র্সা -া I
০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ও ই র তো ০ মা র্ চ ০ র ণ্
I র্সা -র্রা র্রা -র্সা । র্সর্রা -র্গা র্রা -র্গর্রা I র্সা -া -া -া । -া -না পা ধা I
ধু ০ লা য় ধু০ ০ লা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ আ মি
I ধা -র্সা র্সা -া। -না -র্সনা ধা -নধা I পা -ধপা -মা -পমা। -গা -মগা রা -গা II
ধু ০ স ০ র ০০ হ ০০ ব ০০ ০ ০০ ০ ০০ ও ই

এই গানের ক্ষেত্রে বা এই ধরনের গানের ক্ষেত্রে স্বরলিপির শুদ্ধতা যেমন মানতে হবে তেমনি অস্বীকার করা যাবে না সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছে বা তাঁর সরাসরি শিষ্যের কাছে শেখা শান্তিনিকেতনের সংগীত পরম্পরাকে।

৮০-র দশকে সংগীত ভবন, রবিরাগ এবং ৯০-র দশকে প্রতিষ্ঠিত সুরের ধারা রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় স্বরলিপির পাশাপাশি পরম্পরাভিত্তিক গায়নশৈলীকে প্রাধান্য দিয়েছে। শান্তিনিকেতন ফেরত পরম্পরাভিত্তিক শিল্পীদের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। ক্রমে সৃষ্টি হয় নতুন ধারার শিল্পীসমাজ। এই ধারার শিল্পীরা কোন বিশেষ ঘরানার সৃষ্টি না করলেও পূর্বে উল্লেখিত একান্ত স্বরলিপিনির্ভর শিল্পীদের বিপরীতে একটি ভিন্ন সমাজ গড়ে তোলে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরিবেশনাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ববর্তী শিল্পী সমাজের সাথে এদের অবস্থান অনেকটাই দ্বান্দ্বিক। নতুন সহস্রাব্দে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় (অধুনা গেয় কিছু বিকৃত গায়নকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিচ্ছি) সুরের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়।

১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতে বিশ্বভারতীর কপিরাইট উঠে যায়। ভারত সরকার নিজ দেশের জন্য এর মেয়াদ দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেন। সে মেয়াদও শেষ হয় ২০০১ সালে। রবীন্দ্রনাথ দীলিপ কুমার রায়ের সাথে আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরিবর্তন, সুর বিহারের প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

> "যারা সত্যিকারের গুণী তাদের আমি অনেকটা স্বাধীনতা দিতে পারতাম তবে একটা কথা, না দিলেই বা মানছে কে? দ্বারী নাই শুধু দোহাই আছে এমত অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে পারে।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৯:৯৯)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা পাওয়া গেল নতুন সহস্রাব্দে। আজ যথেচ্ছ সুরে রবীন্দ্রসংগীত গীত হচ্ছে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কণ্ঠে, বাণিজ্য উপকরণ হিসেবে, সহজ জনপ্রিয়তার মাধ্যম রূপে। এই নতুন প্রজন্ম স্বরলিপি অথবা পরম্পরা কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য করে না। শ্রুতি, স্মৃতিনির্ভর গানে তারা সংযোজন করেন নিজস্ব সুর। সে যোগ কখনো যন্ত্রানুষঙ্গের বাহুল্যে, কখনো সুরের পরিবর্তনীয়তায়, এমনকি কখনো কথা ঠিক রেখে আমূল নতুন সুরের উপস্থাপনায়।

কথা ও সুরের যুগলমিলনে গান। বাংলাগানের, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে দীলিপ কুমার রায়ের সাথে আলাপ আলোচনায়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে পত্রালাপে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের কথাকে ধুন হিসেবে নিয়ে সুর বিহারের প্রবণতা দেখা যায় অনেক শিল্পীর মধ্যে। গান গাওয়া হলো দু লাইন তারপর গীটার, কিবোর্ড, স্যাক্সোফোনে যন্ত্রবাদন হলো বেশ খানিকক্ষণ। কবির ২৫ বছর বয়সে লেখা কীর্তন সুরের গান *নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে*। তিন-চার মিনিটের গানকে যন্ত্রসংগীতের সুরবিহারে গাইলেন প্রায় এগার মিনেট। গান ছাপিয়ে যন্ত্রবাদনই মুখ্য হয়ে ওঠল। (শায়ান ২০০৮, অ্যালবাম-ডুব) এ চর্চা শুধু তরুণ শিল্পীরা করেন এমন নয়, অনেক প্রথিতযশা শিল্পীকেও এমন করে গাইতে দেখা যায় স্যাটেলাইট টেলিভিশনে।

এবারে সুর পরিবর্তনের (নাকি সুরারোপের) ভিন্ন চিত্র। এফ.এম রেডিওতে ঘোষণা হলো অমুক শিল্পীর কণ্ঠে 'নবীনা' গানটি পরিবেশিত হবে। বেশ খানিকটা শোনার পর মনে হলো কথাগুলি চেনা চেনা লাগছে— হ্যাঁ গানটি তাসের দেশ নাটকের প্রথম দৃশ্যের গান 'হে নবীনা/প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চেনা। আন্তর্জাতিক ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের উপর কপিরাইট স্বত্ব উঠে যাওয়ার পনের বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় শোনা গেল একেবারেই ভিন্ন সুরে, ছন্দে এক অদ্ভুত ধরনের সুর। এ গানটির নতুন সুরটির সাথে রবীন্দ্রনাথের সুরের, রবীন্দ্রসংগীতের কোন মিল নেই এবং তরুণ সমাজে এটি রবীন্দ্রনাথের গান বলে পরিচিতও নয়। প্রকাশনার পক্ষ থেকে একে রবীন্দ্রনাথের গান বা তাঁর গীতিকবিতা বলে উল্লেখ করা হয়নি বা এই অদ্ভুত সুরারোপের কোনো ব্যাখ্যাও তারা দেননি। প্রকাশনার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে Fuad ft Poonam, Bangla Pop, Folk fusion. (পুনম, ২০০৬, মিশ্র এ্যালবাম)

রবীন্দ্রনাথ কৃত মূল গানের সুর এবং পুনম কৃত একেবারে ভিন্ন সুরটির কিছু অংশের স্বরলিপি তুলে ধরছি। উল্লেখ্য পুনমকৃত গানটি শুরু হয়েছে দ্বিতীয় লাইন থেকে।

II সা -া -দা । দা -া দা । দপা -া -া । দা -মা -া I
হে ০ ০ ন ০ বী না ০ ০ ০ ০ ০
I পা -া -ণা । দা -া দপা । পজ্ঞা -া -া । -া -া -া I
হে ০ ০ ন ০ বী না ০ ০ ০ ০ ০
I ণর্সা র্সা -া । র্শর্ধা র্সা -ণা । দণা -ণদা -ণা । ণদা পা -দা I
প্র তি ০ দি নে র্ প থে০ র্ ধু লা ০
I -মপা -জ্ঞা -া । দা -া -া। মপা -জ্ঞা -া । দা -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০ য়্ যা০ ০ ০ ০ ০ য়্
I জ্ঞরা -জ্ঞা -ঋা । সা -া -রা। জ্ঞা -মা -ক্ষমা । জ্ঞরা -জ্ঞা -ঋা I
না০ ০ চি০ না ০ ০ যা ০ ০০ না০ ০ চি
I সা -া -া । -া -া -া I
না ০ ০ ০ ০ ০

(রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫১)

পুনম গীত সুর অবলম্বনে প্রাবন্ধিক কৃত স্বরলিপি

| | | |

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে নিসর্গচিত্রের রূপায়ণ

কালিদাস ভক্ত*

Abstract : Every poets of Sanskrit literature presented different aesthetic aspects of nature in their writings. This relation with nature is observed from the Vedic age. Poets are very much inspired by the natural beauty and have highlighted various things related with nature in their writings. It is well known that Mahakabi Kalidasa was impresed by the beauty of nature. Renoned scholars poets and thinkers of the world have called him the poet of nature. He composed two epics – (Kumarasambhavam, Raghuvansham); three dramas – (Malavikagnimitram, Vikramorvashiyam, Abhijanashakuntalam) and two short kavyas (Meghadutam and Ritusamharam) — where various images of nature had been potrayed with important impacts. In this article, different aspects of nature depicted in the play Malvikagnimitram have been discussed.

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাসের তিনটি নাটকের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ অন্যতম। নাটকটি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা বলে অনেকেই মত দিয়েছেন। এই নাটকে প্রেম ও প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে। এখানে অতি নিবিড়ভাবে প্রকৃতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে কবি মানুষ এবং প্রকৃতিকে একই মোহনায় মিলিত করেছেন। মানুষের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ। এই পরিবেশের প্রধান অবলম্বন হলো প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে পরিদৃশ্যমান রয়েছে – গাছ-পালা, লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, আলো-বাতাস, মাটি-পানি, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র-তারা, নদ-নদী, সমুদ্র প্রভৃতি। বৈদিক যুগে মানুষ প্রকৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এ যুগ থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ পাহাড়ের গুহায় বনজঙ্গলে বসবাস করত। সে যুগ পেরিয়ে আজকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বেদে যে সমস্ত দেবতার বন্দনা করা হয়েছে তাঁরা প্রকৃতির চেতনাময় সত্তা। যেমন – সূর্য, অগ্নি, পৃথিবী, সোম, বায়ু, ঊষা প্রভৃতি। এছাড়া ঋগ্বেদে অরণ্যানী নামে একটি সূক্ত রয়েছে। এখানে প্রকৃতিকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়েছে। এসমস্ত বিষয়ের দ্বারা মহাকবি কালিদাস প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতির নানা বিষয় আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে সে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাটক, উপন্যাস, সিনেমায় সমাজের বাস্তবিক বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা হয়। এই বিষয়গুলো সহজেই মানুষের মনে দাগ কাটে। মানুষ জীবনমুখী উপকরণ বুঝতে সক্ষম হয়। মহাকবি কালিদাস নাটকের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে নাটকটি জীবনধর্মী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এতে নাটকটি সার্থকতা লাভ করেছে। বিষয়টি যথার্থভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃতি পরিবেশের স্বাভাবিক বহমানতা বজায় রাখা, প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে পথচলার বিষয়গুলোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মনীষিগণ *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটক সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন –

শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন – কালিদাসের কবি-মানসের ভিতরে তাঁর চারিপাশের জীবন – আলো-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-প্রান্তর যেমন করে গিয়ে ভিড় করে বাসা বেঁধেছিল, বাল্মীকির নিকট হতে লব্ধ সকল চিন্তা, ভাব, আদর্শ, তেমন করেই তাঁর কবি মানসে বাসা বেঁধেছিল। (দাশগুপ্ত, ১৩৯৬ : ১৩)

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস বলেছেন – অতি সাধারণ একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যবস্তু প্রথিত হলেও নাট্যকার কালিদাসের ঈর্ষণীয় নির্মাণ-নৈপুণ্যে নাটকটি পরিণামে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে তা সত্যি বিস্ময়কর। (বিশ্বাস, ১৯৮৬ : ১)

যুধিষ্ঠির গোপ নাটকটি সম্পর্কে বলেন – মালবিকাগ্নিমিত্র বাস্তব প্রেমের এক প্রাণচঞ্চল জীবন্ত নাটক। (গোপ, ২০১৭ : ১৫৫)

দেবকুমার দাস বলেছেন – কালিদাসের প্রেমভাবনার ক্রমপরিণতির স্তর এবং নাট্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখে মনে হয় যে, মহাকবি কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার বীজ মালবিকাগ্নিমিত্রে উপ্ত হয়েছে। (দাস, ১৪০৪ : ১৪৯)

পাশ্চাত্য মনীষী ম্যাকডোনেল বলেছেন – কালিদাস ইচ্ছা করেই তৎকালীন রাজ-অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ নাটক রচনা করেছেন। (ম্যাকডোনেল, ২০১৫ : ৩৩০)

আলোচনার এ পর্যায়ে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের নিসর্গ চিত্রের রূপায়ণ বিশ্লেষণ করা হলো –

নান্দী শ্লোকে প্রকৃতির অনুসঙ্গ

মালবিকাগ্নিত্রম্ নাটকের শুরুতে দেখা যায় নান্দী শ্লোকে আটটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো শিবের আটটি মূর্তি। যেমন – 'অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতে নাভিমানঃ' (বসু, ১৯৮৩ : ২৫৯) অর্থাৎ আটটি মূর্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেও গর্বশূন্য উক্ত শ্লোকে প্রকৃতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। আটটি মূর্তি হলো – জল, বহ্নি, যষ্টা, সূর্য, চন্দ্রমা, আকাশ, বায়ু, অবনী। এখানে যষ্টা শব্দটি বাদে সবগুলোই প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট। এগুলো প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে একাত্ম হয়ে আছে। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বজগৎকে এগুলোর মাধ্যমে ধারণ করে আছেন। এভাবে নাটকের শুরুতে নান্দী শ্লোকে প্রকৃতির অনুসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রকৃতিধর্মী চরিত্র

নাটকের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে প্রকৃতিধর্মী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন – মালবিকা, কৌমুদিকা, বকুলাবলিকা, মধুকরিকা, সমাভৃতিকা, মদনিকা, জ্যোৎস্নিকা, চন্দ্রিকা, মাধবিকা প্রভৃতি। মালবিকা

অর্থ হলো একটি সুন্দর ফুল। অপর অর্থে একটি লতা বিশেষ। কৌমুদিকা শব্দের অর্থ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ, পদ্ম প্রভৃতি ছাড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। বকুলাবলিকা হলো বকুল ফুলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সুগন্ধী পুষ্প বিশেষ। মধুকরিকা অর্থ মধু সংগ্রহকারী, জ্যোৎস্নিকা শব্দের অর্থ চাঁদের আলো, চন্দ্রিকা অর্থ জ্যোৎস্না, মাধবিকা অর্থ এক ধরনের লতা ও তার ফুল। এভাবে চরিত্রসমূহ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পদবাচ্য প্রকাশ করে।

বসন্ত বর্ণন

মহাকবি কালিদাস প্রস্তাবনার শুরুতে বসন্ত উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন। বসন্তকালে প্রকৃতি অনাবিল সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়। সেই আবেশে মানুষ সঞ্জীবনী শিহরণে জেগে উঠে দোল যাত্রা, বসন্তবরণ, বাসন্তীপূজা, মেলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেকালেও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আয়োজন করা হতো। এখানে প্রকৃতিকে সম্মান জানাতে বসন্ত উৎসবে নাট্যকার সূত্রধারের উক্তিতে নাটক মঞ্চস্থ করার কথা বলেছেন। যেমন– মালবিকাগ্নিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রযোক্তব্যমিতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৫৯) অর্থাৎ, বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নামক নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়– প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে রাজার অন্তরে শিহরণ জেগেছে। অপরদিকে রানি ইরাবতীও বসন্তোৎসব রাজার সাথে ভাগাভাগি করার মানসে প্রতিহারী নিপুণিকার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। এখানে বিদূষকের উক্তিতে বসন্ত প্রকৃতির নানা দৃশ্য প্রকটিত হয়েছে। যেমন– নন্বদ্যৈব প্রথমং বসন্তাবতারসূচকানি রক্তকুরবকান্যুপায়নং প্রেষ্য নববসন্তাবতারব্যপদেশেনেরাবত্যা নিপুণিকামুখেন প্রার্থিতো ভবান্ 'ইচ্ছাম্যার্যপুত্রেণ সহ দোলাধিরোহণমনুভবিতুম্' ইতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৪) অর্থাৎ, বসন্তের সূচনায় রক্তাশোকের উপহার পাঠিয়ে নতুন বসন্তোৎসবের ছলে ইরাবতী নিপুণিকার মুখে প্রার্থনা জানিয়েছেন আর্যপুত্রের সাথে দোলাহরণ উৎসব উপভোগের জন্য। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রমোদবনে মিলিত হওয়ার নিবেদন।

বসন্ত সম্পর্কে বিদূষক আরও বলেছেন– বসন্তঃ কিলৈতাভিঃ পবনচলিতাভিঃ পল্লবাঙ্গুলীভিস্ত্বরয়তীব ভবন্তমেতৎ প্রমোদবনং প্রবিশেতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৪) অর্থাৎ, রাজা মদনাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। বসন্ত তাঁকে পীড়া দিচ্ছে প্রমোদ বনে প্রবেশের জন্য। পরিশেষে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বসন্ত সম্পর্কে বিদূষক বলেছেন– এতৎ খলু ভবন্তমিব বিলোভয়িতুকাময়া প্রমদবনলক্ষ্ম্যা যুবতিবেষলজ্জয়িতৃকং বসন্তকুসুমনেপথ্যং গৃহীতম্। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৫) অর্থাৎ, হে রাজন! বসন্তলক্ষ্মী তরুণীদের সাজসজ্জাকে হার মানিয়ে বসন্তকালের ফুলের সাজ পরেছে।

প্রকৃতির এই মধুময় আবেশে কালিদাস রাজা অগ্নিমিত্রের উক্তিতে প্রেমিক হৃদয়ে প্রকৃতি যে মাধুর্যমণ্ডিত করে হৃদয়কে টানে সে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। যেমন –

আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন॥

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়া চ তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব সুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীমাধবী যোষিতাম্॥
ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।
তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৩/৪-৬)

অর্থাৎ, ঋতুরাজ বসন্তকালে কোকিলেরা শ্রুতিমধুর কূজনের মাধ্যমে প্রণয় ব্যথা কতটা সহনীয় তা বিনম্রভাবে জানবার ইচ্ছা করছে ; আমের পল্লবের ঘ্রাণ বয়ে এনে সুরভিত দক্ষিণা বাতাস নরমভাবে ছোয়া দিয়ে যাচ্ছে, যেন বসন্ত নিজেই কোমল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লাল বর্ণের অশোকের শোভা বিম্বাধরের লালিমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কুরবক ফুলের শ্যামলিমা এবং শ্বেত অরুণিমা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণিশোভিত তিলকফুলগুলি তিলকক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে, বসন্তের মধুময় শোভা রমণীদের মুখের সাজসজ্জা অবজ্ঞাভরে পরাজিত করে দিয়েছে। সারসের সুমধুর ক্রেঙ্কার ধ্বনি শুনে গাছে ঢাকা নদীর কথা জেনে তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো তোমার মুখে নিকটস্থ প্রিয়ার কথা জেনে আমার ক্লিষ্ট হৃদয় আশ্বস্ত হলো।

পঞ্চম অঙ্কে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনে বসন্তের প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। প্রথমে বিদূষক বলেছেন – কিংচিৎপরিবৃত্তযৌবন ইব বসন্ত প্রমোদবনে লক্ষ্যতে। (বসু, ১৯৮৩ : ২৯৮) অর্থাৎ, প্রমোদবনের বসন্তের যৌবন যেন সামান্য অতিক্রম করেছে।

পরে রাজা বিদূষকের উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বসন্ত ঋতুর যৌবনদীপ্ততার কথা বর্ণনা করলেন –

অগ্রে বিকীর্ণকুরবকফলজালকভিদ্যমানসহকারম্।
পরিণামাভিমুখমৃতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/৪)

অর্থাৎ, সামনে কুরবকের ফুলসমূহ ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে, সেই সাথে গাছেও ফলসম্ভার বিস্তীর্ণ, বসন্তঋতুর পরিণত যৌবন চিত্তকে আকুলিত করছে। এভাবে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিতে বসন্তের প্রভাবে মানব মনে যে অনাবিল শাশ্বত প্রেম জেগে ওঠে সে বিষয়গুলো ব্যক্ত করেছেন।

উপমার প্রয়োগে প্রকৃতি চিত্রণ

মহাকবি কালিদাস মালবিকগ্নিমিত্রম্ নাটকে প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ গাছ-পালা, ফুল, সাগর, নদী প্রভৃতিকে উপমার মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় বকুলাবলিকার উক্তিতে কৌমুদিকার হাতে একটি আংটি দেখে সেটিকে প্রস্ফুটিত ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন – অনেনাঙ্গুলীয়কেন উদ্ভিন্নকিরণকেসরেণ কুসুমিত ইব তেঽগ্রহস্তঃ প্রতিভাতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৬০) অর্থাৎ, আংটিটা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন ফুলের কেশর। আর মনে হচ্ছে হাতের পাতায় ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে বিদূষকের কূটবুদ্ধির জন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ায় রাজার উক্তিতে নাট্যকার এ সফলতাকে গাছে ফুল ফোটার সাথে তুলনা করেছেন। যেমন – ত্বৎসুনীতিপাদপস্য পুষ্পমুদ্ভিন্নম্। (বসু, ১৯৮৩ : ২৬৩) অর্থাৎ, তোমার কূটবুদ্ধির গাছে ফুল ফুটেছে।

এরপরে নৃত্যগুরু গণদাসের উক্তিতে রাজার অঙ্গের সৌন্দর্য এবং গুণের মাধুর্যকে বিশাল সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন–

সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে
ভবতি স এব নবো নবেঽয়মক্ষ্ণোঃ। (বসু, ১৯৮৩ : ১/১১)

অর্থাৎ, সে যেন আমার চোখে বিশাল সমুদ্রের মতো প্রতিমুহূর্তে নব থেকে নবতর মনে হচ্ছে।

আরেক নৃত্যগুরু হরদত্ত নৃত্যগুরু গণদাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগে করেছেন – অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্রপল্বলয়োরিবান্তরমিতি।(বসু, ১৯৮৩ : ২৬৪) অর্থাৎ, ওর আর আমার মধ্যে তফাৎ হলো সমুদ্র আর ডোবার মধ্যকার পার্থক্য যেমন।

পরিব্রাজিকার উক্তিতে রাজা অগ্নিমিত্র ও দেবী ধারিণীর গুণের মহিমা প্রকাশ করতে প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে –

অতিমাত্রভাসুরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রেঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ॥ (বসু, ১৯৮: ১/১৩)

অর্থাৎ, সূর্যের ঔদার্যে আগুন যেমন জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে তেমনি রাত্রির ঔদার্যে চন্দ্র তার গৌরব প্রকাশ করে।

এখানে পণ্ডিত পরিব্রাজিকার উক্তিতে গণদাস ও হরদত্তের গুণাবলির বিষয়ে উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা এক-এক জন রাজা ও রানীর সহায়তা পেলে আরও অনেক সফল হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ রাজাকে সূর্যের সাথে আর রানিকে চন্দ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকী রাজা-রানির প্রশংসা করে প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ করেছেন –

মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ।
ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্তা শরচ্ছদম্॥
অনিমিত্তমিন্দুবদনে! কিমত্রভবতঃ পরাঙ্মুখী ভবসি।
প্রভবন্তেঽপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ১/১৫, ১৮)

অর্থাৎ, আপনি একশ বছর ধারিণী ও ধরণীকে পালন করুন। ধারিণীর পুত্র মহাবলশালী, এ পৃথিবী প্রচুর বৃষ্টিতে শস্যশ্যামলা, দুজনই ক্ষমা গুণে সমান। আপনি চন্দ্রমুখী অকারণে কেন রাজা মহাশয়ের উপর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? স্বামী গৃহে প্রভাব থাকলেও স্ত্রীরা সঙ্গত কারণে স্বামীর উপর রাগ করেন।

তৃতীয় অঙ্কে সমাভৃতিকার উক্তিতে মালবিকার বিরহের কারণে মানসিক যে অবস্থা হয়েছে সেখানে কবি প্রকৃতির অনুসঙ্গ মালতীমালার সাথে মালবিকার মানসিক অবস্থাকে তুলনা করেছেন – মালবিকাপ্যেষু দিবসেষ্বনুভূতমুক্তেব মালতীমালা ম্লায়মানা লক্ষ্যতে। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৩) অর্থাৎ, মালবিকা গলায় পরে খুলে রাখা মালতীমালার মতো ম্লান হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে আবার রাজার উক্তিতে মালবিকার রক্তিম চরণকে মহাদেবের কোপে দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের সাথে তুলনা করা হয়েছে –

চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ সরসাং পশ্য বয়স্য! রাগলেখাম্ ।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৩/১১)

অর্থাৎ, প্রেয়সীর চরণপ্রান্তে আঁকা রক্তিম আলপনা যেন মহাদেবের দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ।

পরবর্তীকালে উপমার মাধ্যমে রাজার উক্তিতে বলা হয়েছে – বিরহে রাজার ধৈর্যরূপ বৃক্ষে ফুল ফুটছে না। তাই অতি শিঘ্র মালবিকারূপ নারীর স্পর্শ দ্বারা রাজার দোহদ পূরণ করা প্রয়োজন। যেমন –

ধৃতিপুষ্পময়মপি জনো বধ্নাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি।
স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যরুচেঃ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৩/১৯)

অর্থাৎ, বহুদিন হলো ধৈর্যের গাছে ফুল ফুটছে না। অপরদিকে অন্য কিছুতে রুচি নেই। অতএব মালবিকার অমৃত স্পর্শে আমার দোহদ পূরণ করো।

চতুর্থ অঙ্কে রাজা ইরাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উপমাশ্রিত নিম্নোক্ত উক্তিটি করেছেন –

কদামুখং বরতনু কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্।
অপর্বণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৪/১৬)

অর্থাৎ, পূর্ণিমা ছাড়া রাতের চন্দ্রমণ্ডল যেমন রাহুগ্রস্ত হয় না তেমনি বিনা কারণে সুন্দর মুখ ক্ষণিকের জন্য রাগান্বিত হয়েছে?

সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ নিয়েই মানব জীবন। রাজা অগ্নিমিত্রের জীবনও তেমনি। একদিকে মালবিকার বিরহে তিনি যেমন বিলীন, অপরদিকে বিদর্ভরাজকে পরাজিত করে বিজয়ী হবার সংবাদ শুনে তাঁর মন আন্দোলিত। এমনি দ্বৈত মানসিকতাকে নাট্যকার প্রকৃতিধর্মী উপমা দিয়ে তুলনা করেছেন –

কান্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসংপ্রয়োগাং শ্রুত্বা বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ।
ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/৩)

অর্থাৎ, যার সাথে মিলন সহজে পাওয়া যায় না সেই প্রিয়ার কথা ভেবে এবং সৈন্য শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদর্ভরাজ পরাজিত হয়েছে শুনে হৃদয় রৌদ্রতপ্ত দিনে বৃষ্টির ধারায় সিক্ত পদ্মের মতো দুঃখ ও সুখ দুই-ই অনুভব করছে।

পরবর্তীকালে প্রমোদবনে রাজার আগমনে তাঁকে সম্মান জানাতে ধারিণী ও মালবিকা বিনয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নাট্যকার সে বিষয়টিকে প্রকৃতিধর্মী উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন –

মামিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদুপস্থিতা প্রিয়য়া।
বিস্মৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্যা বসুমতীব॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/৬)

অর্থাৎ, আমাকে দেখা মাত্র দেবী প্রিয়াকেসহ সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ালেন, যেমন বসুমতী রাজ্যশ্রীকে নিয়ে উঠে আসছেন, শুধু তাঁর হাতে পদ্মটি নেই।

এরপরে দেখা যায়, মালবিকার মনের অবস্থাকে নাট্যকার প্রকৃতির সাযুজ্য দিয়ে উপমায়িত করেছেন। যেমন –

বিসিনীপত্রগতমিব সলিলং বেপতে মে হৃদয়ম্। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৩) অর্থাৎ, পদ্মপাতার উপরে জলের মতো আমার হৃদয় কাঁপছে।

পরবর্তীকালে মালবিকার সৌন্দর্যকে রাজার উক্তিতে নাট্যকার চৈত্রমাসের নক্ষত্রশোভিত রাতের জ্যোৎস্নার সাথে তুলনা করেছেন। যেমন –

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী বহুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা গতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/৭)

অর্থাৎ, অনতিলম্বিত বস্ত্র পরিহিতা এবং অনেক অলংকারে ভূষিতা দেখে আমার মনে হচ্ছে চৈত্রমাসের নক্ষত্রশোভিত, হিমমুক্ত রজনী, যখন জ্যোৎস্না সবেমাত্র দেখা দিয়েছে।

নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে নায়িকা মালবিকার অঙ্গের বর্ণনায় প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিভিন্ন উপমার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মুখশ্রীকে শরৎকালের চাঁদের সাথে, হাত শ্যামা লতার সাথে, মুখের হাসি সদ্যফোটা পদ্মফুলের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন –

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহু নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণি মতো নিতম্বি জঘনং পাদাবরাঙ্গুলী
ছন্দো নর্তয়িতুর্যথৈব মনসঃ শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ॥
বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজুয়তার্ধম্॥
স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেসরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্॥ (বসু, ১৯৮৩ : ২/৩,৬,১০)

অর্থাৎ, চোখ দুটি টানাটানা, মুখখানি শরৎকালের চাঁদের মতো শোভিত, কাঁধ থেকে দুটি হাত নেমে পড়েছে, উন্নত স্তনযুগলে বক্ষোদেশে স্থানাভাব, দুপাশ অতি মসৃণ, মাঝখানটি হাতের মুঠোয় ধরা যায় মনে হয়, ঊরু এবং নিতম্ব প্রশস্ত, জোড়া পায়ে আঙ্গুলগুলো বাঁকা হয়ে অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। নৃত্যগুরুর মনের মতোই যেন শরীরটি সুগঠিত। অঙ্গের ঊর্ধ্বাংশ সোজা রেখে দাঁড়িয়ে থাকায় ভঙ্গি যেন খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাতের কব্জিতে কঙ্কন পরিহিত বাম হাতটি নিতম্বে রাখা, ডান হাতটি আলগা এলিয়ে শ্যামা লতার মতো, চোখের দৃষ্টি নামানো মেঝের দিকে যেখানে তারই বুড়ো আঙ্গুলের ঘষায় ফুলের রাশি পিষে গিয়েছে। আয়তাক্ষীর হাসি ছড়ানো মুখে দাঁত সামান্য দেখে যাওয়ায় খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল – যেন একটি সদ্যফোটা শতদল, যার কেসরগুলো এখনও স্পষ্ট নয়।

পরবর্তীকালে বিদূষকের উক্তিতে প্রকৃতির অনুসঙ্গ লক্ষ করা যায়। যেমন –

গৃহীতক্ষণোঽস্মি। কিন্তু মেঘাবলীনিরুদ্ধা জ্যোৎস্নেব পরাধীনদর্শনা তত্রভবতী মালবিকা। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭২) অর্থাৎ, মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো তাঁর দেখা পাওয়া নির্ভর করে অন্যের উপর।

তৃতীয় অঙ্কে দূর থেকে প্রমোদ বনে মালবিকাকে দেখে প্রকৃতির নানা বিষয় দিয়ে তাঁর রূপের বর্ণনা করেছেন। যেমন –

অনেন তনুমধ্যয়া মুখরনূপুরারাবিণা
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সংভাবিতঃ।
অশোক! যদি সদ্য এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যসে
বৃথা বহসি দোহদং ললিতকা মসাধারণম্॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৩/১৭)

অর্থাৎ, হে অশোক! এই সুন্দরী নুপুরের ধ্বনিতে সদ্য প্রস্ফুটিত কোমল পদ্মের মতো চরণের স্পর্শে তোমাকে গৌরব দিয়েছে। যদি সদ্য সদ্য কুসুমিত না হও তবে বিলাসী কামিজনের মতো বৃথাই তোমার দোহদ।

প্রমোদ উদ্যান

নাট্যকার কালিদাস তাঁর তিনটি নাটকেই প্রমোদ উদ্যানের উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য নাটকের বিভিন্ন স্থানে প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনা রয়েছে। নাটকের কাহিনির প্রয়োজনে প্রধান চরিত্রসহ বিভিন্ন পার্শ্ব চরিত্রের লোকদের প্রমোদ উদ্যানে মিলিত হতে দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে দেখা যায় পরিচারিকা সমাভৃতিকা রানি ধারিণীর নির্দেশে তাঁর সাথে দেখা করতে যাবে সেজন্য উদ্যান থেকে বীজপূরক (লেবু) আনতে প্রমোদ উদ্যানে যাবে। সমাভৃতিকা বীজপূরকের খোঁজে উদ্যানে যায়। সেখানে রক্ষিণী হিসেবে মধুকরিকার কাছে যায় । রক্ষিণী উদ্যান থেকে বীজপূরকের ব্যবস্থা করে দেয়। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, রাজা প্রতিহারী জয়সেনাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে প্রমোদ উদ্যানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেমন – জয়সেনে গূঢ়েন পথা মাং প্রমোদবনং প্রাপয়। (বসু, ১৯৮৩ : ২৮৮) অর্থাৎ, জয়সেনা, গোপনপথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চলো। এখানে রাজ ভবনের পাশে উদ্যান থাকায় প্রকৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে নাটকে উদ্যানের উপযোগিতা বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে প্রাকাশ পেয়েছে।

সমুদ্র গৃহ

সমুদ্র গৃহ মূলত প্রকৃতির প্রশান্ত-নিবিড় পরিবেশ উপভোগের জন্য সরোবরের মধ্যে নির্মিত গৃহকে বোঝানো হয়েছে। আগের দিনে নৃপতিরা অবকাশ যাপন, চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদের মাধ্যম হিসেবে সমুদ্র গৃহ তৈরি করতেন। আলোচ্য নাটকে বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র গৃহের উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে প্রকৃতির অন্যতম একটি অনুসঙ্গ হিসেবে সমুদ্র গৃহের বর্ণনা করা হয়েছে। বিদূষক কৌশলে মালবিকাকে পাতালগৃহ থেকে মুক্ত করে সমুদ্র গৃহে রাজা অগ্নিমিত্রের সাথে সাক্ষাৎ করায়। একে-অপরের প্রণয় কাতর হৃদয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এখানে নাট্যকার রাজা অগ্নিমিত্রের উক্তিতে মালবিকাকে প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে মুক্তলতার মতো স্বভাব-সুলভ হতে বলেছেন। যেমন –

বিসৃজ সুন্দরি সংগসমাধ্বসং তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহান গতে সহকারতাং ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৪/১৩)

অর্থাৎ, হে সুন্দরী মিলনের বিষয়ে আশঙ্কা করো না। অনেক দিন ধরে তোমার প্রণয়ে আমি ব্যকুল। তরু সদৃশ তুমি আমাতে হও মুক্তলতা।

এখানে সমুদ্র গৃহ যেমন প্রকৃতির একটি বিশাল অনুসঙ্গ অপরদিকে নায়ক-নায়িকার কথোপকথনও প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

অশোক তরু

এই নাটকের কাহিনিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অশোক তরুর গুরুত্ব অনেক। রাজা অগ্নিমিত্রের উদ্যানে এই তরুটি শোভিত হচ্ছে। নাট্যকারের কল্পনায় অশোক তরুতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে হলে সুন্দরী নারীর স্পর্শ দরকার। সেকারণে অশোক তরুর দোহদ ইচ্ছা (গর্ভিণীর ইচ্ছা) পূরণের জন্য মালবিকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতি এবং মানবীকে একই মোহনায় মিলিত করা হয়েছে অপরদিকে নাটকীয় ঘটনা সামনের দিকে প্রাগ্রসর হয়েছে। যেমন – ত্বং তাবদ্ গত্বা তপনীয়াশোকস্য দোহদং নির্বর্তয় ইতি। যদ্যসৌ পঞ্চরাত্রাভ্যন্তরে কুসুমং দর্শয়তি, ততোঽমভিলাষপুরয়িতৃকং প্রসাদং দাস্যামীতি।। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৫) অর্থাৎ, তুমি তপনীয় অশোক তরুর দোহদ ইচ্ছাপূরণ করো। যদি পাঁচ রাতের মধ্যে তাতে ফুল ফোটে তবে অভিলাষ পূর্ণ করা পুরস্কার দেবো।

এরপরে মালবিকা অশোক তরুর ইচ্ছা পূরণার্থে তপোবনে এসে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন তাতে প্রকৃতির শোভা উপভোগের ইচ্ছা প্রকাশিত হলো। যেমন –

অয়ং স ললিতসুকুমারদোহদাপেক্ষী অগৃহীতকুসুমনেপথ্য উৎকুণ্ঠিতায় মমাঽনুকরোত্যশোকঃ। যাবদস্য প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিষণ্ণাত্মানং বিনোদয়ামি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৭৬)

অর্থাৎ, এই সেই অশোকতরু যে দোহদের আকাঙ্ক্ষায় কুসুমসজ্জা গ্রহণ না করে আমার উৎকণ্ঠিত অবস্থাকেই অনুকরণ করছে। যা হোক, এর ছায়া শীতল শীলাতলে বসে একটু নিরুদ্বেগ হই।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় রাজা ও বিদূষক দুজনই তরুটি যাতে বিনষ্ট না হয় অথবা কেউ এর ক্ষতি করতে না পারে সেই চেষ্টায় রত। এখানে একটি হরিণ যাতে অশোক তরুটির পাতা না খায়, সেজন্য বিদূষক বকুলবলিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। রাজাও সেবিষয়ে বিদূষককের পক্ষাবলম্বন করেছেন। যেমন –

'বকুলাবলিকে ! অশোকপল্লবানি অভিলঙ্ঘয়িতুম্ ইচ্ছতি হরিণঃ। এহি নিরাবয়াবঃ ক্রনম্ । রাজা – এবমেবাস্মিন্ রক্ষণীয়েঽবিলম্বিতেন ভবিতব্যম্।' (বসু, ১৯৮৩ : ২৯১) অর্থাৎ, নরম-কচি অশোকের পাতাগুলোকে এটি হরিণ খেতে আসছে। বকুলাবলিকা, এসো একে বিরত করতে চেষ্টা করি। এখানে বিদূষক ও রাজার এই প্রচেষ্টা পরিবেশ রক্ষার অনুকূলে।

পঞ্চম অঙ্কে অশোক তরু সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উদ্যানপালিকার উক্তিতে। যেমন –

উপক্ষিপ্তো ময়া কৃতসৎকারবিধেস্তপনীয়াশোকস্য বেদিকাবন্ধঃ। যাবদনুষ্ঠিতনিয়োগমাত্মানং দেব্যৈ নিবেদয়ামি। অহো দৈবস্যানুকল্পনীয়া মালবিকা। তস্যাং তথা চণ্ডী দেব্যনেনাশোককুসুমবৃত্তান্তেন প্রসাদসুমুখী ভবিষ্যতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৯৬) অর্থাৎ, চিত্তাকর্ষক অশোকতরুর মাচান নির্মাণ করে দিয়েছি। আমি কর্তব্যকর্ম শেষ করেছি, দেবিকে সেকথা জানাই। মালবিকা সত্যিই ভাগ্যের অনুকল্পার যোগ্য। তার প্রতি ক্রুদ্ধ দেবী অশোককুসুমের প্রস্ফুটিত হওয়ার বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চই খুশি হবেন।

একই অঙ্কে অশোকতরুর ফুল ফোটাকে কেন্দ্র করে বিদূষক ও রাজার মধ্যে কথোপকথনে নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদূষক রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন – স দত্তনেপথ্য ইব কুসুমস্তবকৈস্তপনীয়াশোকঃ। (বসু, ১৯৮৩ : ২৯৮) অর্থাৎ, পুষ্পস্তবকের ভারে যেন বসন সজ্জিত তপনীয় অশোকতরু।

পরবর্তীকালে রাজা বললেন –

স্থানে খল্বয়ং প্রসবমন্থরোঽভূত্।
যদিদানীমনন্যসাধারণীং শোভামুদ্বহতি পশ্য!
সর্বাশোকতরুণাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব কুসুমানি॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/৫)

অর্থাৎ, যুক্তিপূর্ণভাবেই অশোকতরু কুসুম প্রকাশে মন্থর হয়েছে। এখন অনন্যসাধারণ শোভা ধরেছে। দেখো – মনে হচ্ছে এর দোহদ পূরণ করাতে, অন্য সমস্ত অশোকতরুর পুষ্পরাশি, যারা প্রথমে বসন্তের সূচনা করেছিল, এসে একেই আশ্রয় করেছে।

নাট্যকার উদ্যান, প্রমোদবন, উদ্যানপালিকার কর্মকাণ্ড প্রভৃতি প্রকৃতিধর্মী বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়েছেন।

নায়িকা মালবিকার রূপ বর্ণনায় প্রকৃতি চিত্রণ

নাট্যকার কালিদাস তৃতীয় অঙ্কে রাজার উক্তিতে নাটকের প্রধান চরিত্র মালবিকার রূপের বর্ণনায় বসন্তের প্রকৃতির মতো সৌন্দর্যময় রূপের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে নায়িকা মালবিকাকে পাবার মানসে নায়ক অগ্নিমিত্র বিদূষকের কাছে যে অনুভূতি ব্যক্ত করেন তাতে প্রকৃতির নানা বিষয় ফুটে উঠেছে –

শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা॥
বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ।
অনিমিত্তামুৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতোঽয়ম্॥
নবকিসলয়রাগেণাগ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্॥ (বসু,১৯৮৩ : ৩/৮-৯, ১২)

অর্থাৎ, এর কপোলদেশ শরকাণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য অলংকার পরিধান করে আছে – মনে হচ্ছে যেন বসন্তকাল পরিণতপত্রসহ সামান্য কুসুমে কুন্দলতার মতো শোভিত। কুরুবকফুলের রেণু বয়ে আনা এবং নব কিসলয় ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয় সমীরণ অকারণ উৎকণ্ঠাও জন্মায়। এই তরুণী নখের দ্যুতি ছড়িয়ে কচি-কিসলয়ের মতো রাঙা পায়ে দুজনকেই আঘাত করতে পারে – ইচ্ছাপূরণের জন্যে কুসুমশূন্য অশোকতরুকে অথবা চরণে প্রণত সদ্য অপরাধী দয়িতকে।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় মালবিকাকে আপন করে পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত রাজা অগ্নিমিত্র যেভাবে তাঁর লাস্যময়ী রূপের প্রশংসা করে বলছেন তাতে প্রেমরূপ বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখা সর্বশেষ ফুলে-ফলে বিকশিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যেমন –

তমাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাস্থয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ।
হস্তস্পর্শে মুকুলিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বা-
ৎকুর্যাৎক্লান্তং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞাং ফলস্য॥
মধু স্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৪/১-২)

অর্থাৎ, মালবিকার কথা কানে শুনেই আশায় আশায় যে গাছের মূল সৃষ্টি হয়েছিল, চোখে দেখার পরে তাতে আরক্ত কিসলয় দেখা দিল, হস্তস্পর্শ করাতে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে ফুল ফুটেছিল, কামনার এই মনসিজ তরু আমাকে নিশ্চয়ই ফলের রসও গ্রহণ করাবে। মধুকণ্ঠী কোকিলবধূ এবং ভ্রমরী প্রফুল্ল সহকারে বৃক্ষকে আশ্রয় করেছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ বৃষ্টিপাতের ফলে তারা কোটরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেমী রাজা-রানি

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে রাজার উদ্যানে অশোক তরু শোভিত। মালবিকার পদস্পর্শের পরে অশোক তরুতে ফুল ফুটেছে। সেই কুসুমশোভা দেখার জন্য রানি রাজাকে সহ উদ্যানে যাবেন প্রতিহারীর কথায় সে বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন– ইচ্ছাম্যার্যপুত্রেণ সহাশোকবৃক্ষস্য প্রসূনলক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্তুমিতি। (বসু, ১৯৮৩ : ২৯৭) অর্থাৎ, রাজার সাথে আমি অশোক কুঞ্জের ফুলের দৃশ্য দেখতে চাই। এ থেকে রাজা-রানির প্রকৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেই সাথে একজন রাজা হয়ে যেভাবে প্রকৃতির সাথে একত্র হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন মধুকরিকার উক্তিতে সেই কথাই ধ্বনিত হয়েছে। যেমন –

পরভৃতকরব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষ্বনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।
বিজয়করিণামালানত্বং গতৈঃ প্রবলস্য তে
বরদ বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ॥ (বসু, ১৯৮৩ : ৫/১)

অর্থাৎ, কোকিলের কলকূজনে আনন্দ করে আপনি অঙ্গযুক্ত অনঙ্গের মতো বিদিশার তীরে উদ্যানে উদ্যানে বসন্ত উদ্‌যাপন করছেন। হে বরদ! আপনি প্রবল বরদা নদীর তটস্থ বৃক্ষগুলি আপনার বিজয় হস্তীদের বন্ধনস্তম্ভ হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আপনার শত্রুও অবনত হয়েছে।

এভাবে রানি হয়ে যেভাবে প্রিয় মানুষের সাথে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তেমনি রাজাকেও কোকিলের কূজনে আনন্দে মেতে ওঠার বিষয় লক্ষ করা যায়। এখানে নাট্যকার প্রকৃতি প্রেমের প্রগাঢ় বিচ্ছুরণ স্পষ্ট করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে কালিদাস যেভাবে প্রকৃতির কথা বলেছেন সে হিসেবে তাঁকে প্রকৃতির মানসপুত্র বলা যায়। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা নাট্যকার ঐ যুগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি নাটকের কাহিনির মাধ্যমে সুকৌশলে মানুষের কাছে এই বিষয়টি জনপ্রিয় করে চিত্তবিনোদনের খোরাক যেমন যুগিয়েছেন তেমনি ধরণীকে বাসযোগ্য করার প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। প্রাচীনকালে নাট্যকার বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকলেও প্রকৃতিকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছেন। মহাকবি কালিদাসের এই নাটকের মাধ্যমে সেযুগেও মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠক মাত্রই মনকে আন্দোলিত করবে। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে নাট্যকার তা অতি মনোরমভাবে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার কালিদাস বাস্তবিকই প্রকৃতিপ্রেমিক তা নাটকের ছত্রে-ছত্রে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনও বা উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। বর্তমান সরকারের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত নানা পদক্ষেপ, বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করার প্রয়াস, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভূমিকা প্রভৃতি এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলকে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে। প্রকৃতিকে লালন করতে হবে, পালন করতে হবে এবং আবেগ-অনুভূতিকে সাবলীল রাখার জন্য প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে হবে। কোনোভাবেই প্রকৃতিকে বিপন্ন হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান বিশ্বে নিসর্গপ্রেমী, প্রকৃতি অনুরাগী, সৌন্দর্য অবলোকনকারী লোকের সংখ্যা অনেক থাকলেও প্রকৃতি ধ্বংসকারী লোকের সংখ্যাও কম নয়। কালিদাসের প্রকৃতি প্রেম বিশ্বসভ্যতা টিকে থাকার অন্যতম উপায়।

উল্লেখপঞ্জি

দেবকুমার দাস (১৪০৪)।*সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস (১৯৮৬)। কালিদাসের মালবিকা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

প্রসূন বসু [সম্পা.] (১৯৮৩)। মালবিকাগ্নিমিত্রম্, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১দশ খণ্ড, কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন

বিমান ভট্টচার্য(২০০৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা: বুক ওয়ার্লড

যুধিষ্ঠির গোপ (২০১৭)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৯৬)। *ত্রয়ী-বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স

Macdonell (2015). *History of Sanskrit Poetics*, Delhi: Motilal Benarasidass Publishers Private Limited

ফাতেমার সুরতনামা: পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও কবি-পরিচয়

শহিদুল হাসান*

Abstract : Sherbaj Khan's *Fatimar-Suratnama*, a Bangla lyrical composition contains story about the beauty of Hazrat Fatima (R.), daughter of Hazrat Muhammad (SM.). In this prosodic work, the poet sometimes presented Fatima (R.) in a vernacular outfit. Five copies of this poem are being kept in the collections of Dhaka University Library. It is interesting to note that one manuscript of *Fatimar-Suratnama* has been copied in Arabic-Persian scripts. The poet being an excellent literate had successfully yarn several segmented fiver of the theme in a metaphoric method. In this article an attempt has been taken to decipher that five manuscripts and present the metaphoric stories to the readers. No colophon of these manuscripts is available resulting different opinions among scholars about the temporal limit of the poem and the poet. Identity of Sherbaz Khan is also a debatable issue among researchers. The research is a humble effort to put an end to the debate on the poet and his chronology.

ভণিতা

বাংলা ভাষায় মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত রয়েছে। কবি শেরবাজের লেখা *ফাতেমার সুরতনামা তেমনি* একটি কাব্যগ্রন্থ যার একাধিক পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত। বর্তমান গবেষণা[১] সেই পাণ্ডুলিপিগুলির সহায়তায় *ফাতেমার সুরতনামার* পাঠোদ্ধার ও কাব্যটির কাহিনি সংক্ষেপে পুনর্গঠন করার একটি প্রয়াস। বর্তমান প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপির পরিচয়, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ অনুযায়ী পুনর্গঠিত কাহিনি সংক্ষেপ এবং কবি-পরিচয় ও কবির কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি পরিচয়

ফাতেমার সুরতনামার মোট পাঁচটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। পুথিগুলি হলো: (ক) নং ৩০২, এমএস ১৩৩, (খ) নং ৩০৩, এমএস ১২৩ (গ) নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪ (Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10) (ঘ) নং ৩৬৩, এমএস ১২৪ এবং (ঙ) সা.-বি. ৭৮৪ (Parvin, 2013: 28)। এই পাঁচটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে চারটিই বাংলা হস্তাক্ষরে লেখা এবং একটি আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লেখা। একটিমাত্র পাণ্ডুলিপিতে (পুথি নং ৩০২) লিপিকারের নাম কালীদাস নন্দী (Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10) ও একটি পাণ্ডুলিপিতে অনুলিপির (পুথি নং ৩০৪) সময় লেখা আছে ১১৯৬ মঘী বা ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10)। আরবি-ফারসি অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপির ফোলিও সংখ্যা একুশটি যা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ফোলিও। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটি ছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে ভণিতাসহ কাব্যটির পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়নি। বর্তমান গবেষণায় তিনটি পাণ্ডুলিপির (পুথি নং ৩০৩, ৩০৪ এবং ৩৬৩) সাহায্যে কাব্যটির কাহিনি-সংক্ষেপ পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে (Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10, 367)।

কাহিনি-সংক্ষেপ

কবি শেরবাজ ভণিতাতে মহান আল্লাহর হামদ ও নাতে রাসুলের মাধ্যমে তার কাব্য শুরু করেন। এই কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হলো রাসূল (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর রূপ ও সৌন্দর্যের বিবরণ উপস্থাপন।

একদিন ফাতেমার স্বামী রাসুলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাহাবি হযরত আলি (রা.) হজরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে তাকে ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর থেকে হজরত বকর জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাঁকে ডাকছে? আলি উত্তর দিলেন, আমি আলি। তুমি বাইরে এসে আমার সাথে দেখা কর। দরজায় এসে বকর আলিকে প্রশ্ন করে, কে তুমি? উত্তরে আলি বললেন, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি রাসুলের 'দামাদ'। হাসান হোসেনের পিতা এবং ফাতেমা অপরূপা আমার স্ত্রী। বকর মৃদু হেসে আলিকে বললেন তুমি কি ফাতেমার সুরত দেখেছ? আলি অবাক হয়ে বকরকে উত্তর দেন, কী অবাক কথা! ফাতেমা আমার ঘরণী! আমি যদি ফাতেমা (রা.)-এর সুরত না দেখি তাহলে আমার দুই পুত্র হলো কীভাবে? তার আর কী সুরত আছে যা আমি জানি না? তখন বকর উত্তর দিল:

এসব সুরত তান দিআছে আল্লাহএ।
ছাপায়ে রাখিছে জান বিবি ফাতেমায়।
কভু তুমি না দেখিছ ফাতেমার রূপ।
রাখিছে সুরত মাএ বেহেস্তের কুলুব।
প্রচার করিবে মাএ হিসাবের দিন।
সুরাতের কথা মায়ের হাসানসেজান।

(ফোলিও নং ০২, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ৩৬৩)

অর্থাৎ ফাতেমার সৌন্দর্য আল্লাহ প্রদত্ত এবং তা লুকানো আছে। কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ করা হবে। মায়ের রূপের কথা ছেলেরাও জানে।

লজ্জায় হযরত আলি ঘরে ফিরে খাটের উপর শুয়ে পড়েন। বিবি ফাতেমা খাবার রান্না করে খাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। কিন্তু আলি ফাতেমাকে বলে তোমার সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো কিছু খাবো না। উত্তরে ফাতেমা বলেন, আমি তো আপনার সাথেই সব সময় থাকি । আমার যা আছে সেটা তো আপনার দেখা। এ কী কাহিনি বলছেন আপনি। আমার আর কী সুরত আছে? কিন্তু আলি আবার ফাতেমাকে বলে, তোমার যে নিজ রূপ আছে তা আমি দেখতে চাই। শুনে ফাতেমা চলে গেলেন। তিনি দুই ছেলে হাসান হোসেন-কে পাঠালেন হজরত আলিকে আনার

জন্য। দুই ছেলে এসে বাবার কোলে বসে বাবাকে বলল– বাবা, তোমাকে চিন্তিত লাগছে কেন? সত্য করে আমাদের কাছে বল কী হয়েছে? আলি উত্তরে দিলেন, বাছা খবর শোন! তোমাদের মায়ের আরও রূপ আছে। হাসান হোসেন উত্তরে বলল, হ্যাঁ, পবিত্র কোরানে তা বলা আছে। এটা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ করবেন। এই কথা শুনে আলি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং ফাতেমার সুরত দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন।

এভাবে তিন দিন চলে গেল কিন্তু আলি খাবার কিংবা পানি কিছুই খান না। ফাতেমার সুরত দেখার জন্য তাঁর হৃদয় অস্থির। অবশেষে ফাতেমা ব্যাকুল চিত্তে আলিকে গিয়ে বললেন, তিন দিন ধরে আপনি খাবার খাননি, তাই আপনার দুই ছেলেও কোনো কিছু খায়নি। আলি উত্তর দেন যে, তিনি ফাতেমার যাবত সুরত দেখার পরেই খাবার খাবেন। ফাতেমা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আমার সুরতের খবর দিয়েছে তার ওপর হোক জওহর-কওহর।

ফাতেমার মুখে এই কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহ ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.)-কে বললেন, দেখ ফাতেমা হাসান-হোসেনকে বধিলেন ।

আলি সাথে সাথে বললেন, একি কথা তুমি বললে! আমাদের দুই জাদুমনি এবং বকর এই কথা আমাকে বলেছেন। আলির উত্তর শুনে ফাতেমা কাঁদতে লাগলেন। ফাতেমার ক্রন্দনে আরশ-কুরসি তিন পৃথিবী নড়ে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে ফাতেমা আলিকে বলেন, আগে খাবার খাও তার পর সুরত দেখবে। কিন্তু আলি বলেন, আগে তোমার রূপ দেখার পরই খাবার খাব।

নিরুপায় ফাতেমা আলিকে মৃগয়াতে যেতে বললেন। বললেন, অরণ্যের মধ্যেই তিনি সুরত দেখতে পারবেন। ফাতেমার কথায় আলি শিকারে চলল। সেখানে দেখেন একজন ফকির নামাজ পড়ছেন। তাঁর পাশে একজন নারী/কঙ্কালিনী দুইজন বালককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আলি হতাশ হয়ে প্রখর সূর্যতাপে আরও দূর এগিয়ে চললেন। এগিয়ে দেখে মাঠের মধ্যে একটি গাছের নিচে একজন ফকির দুই হাত বেঁধে সিজদারত। ফকিরের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হয়ে আসছে। এটি দেখে আলি হায় হায় করতে থাকে।

এখানে ফকিরের পাশে দাঁড়ানো কঙ্কালিনী ফকিরকে বাবা বাবা বলে ডাকছে। ফকিরের চোখের পানিতে মাটি ভিজে যায় আর ফকির উম্মত উম্মত বলে কাঁদতে থাকে। এরপর আলি আরেকটু সামনে গিয়ে দেখে আগুনের মাঝে একজন ফকির বসে আল্লাহর নামে জিকির করছেন। আগুনে ফকিরে মগজ এমনভাবে গলছে যেমনভাবে হাড়ির মধ্যে চাল সিদ্ধ হয়। ফকিরের মাথার খুলি ফেটে মগজ বের হয়, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মত উম্মত বলে কাঁদতে থাকেন।

এসব দৃশ্য দেখে আলি চিন্তিত হয়ে সামনে যেতে থাকেন। জঙ্গলের কিনারে গিয়ে দেখেন একজন কঙ্কালিনী রুটি বানাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে ইমাম আলি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? কার স্ত্রী তুমি? জঙ্গলে বসে কার জন্য রুটি বানাচ্ছ? কঙ্কালিনী উত্তর দেয়, আমার একজন নিরঞ্জন আছে, তার জন্যই আমি রুটি বানাচ্ছি। আলি উত্তরে বলেন, কী পাগলের মতো কথা বলছ? সংসারের নিরঞ্জন একজনই। তোমার নিরঞ্জন কে? কঙ্কালিনী উত্তর দেয়, আমার নিজের একজন নিরঞ্জন আছে।

কঙ্কালিনীর কথা শুনে ইমাম আলি আরও সামনে চললেন। কিছুদূর গিয়ে দেখেন বৃক্ষের উপর সুন্দর একটি ময়না পাখি বসে আছে। ময়নার মাথায় তাজ, গলায় হাসুলি, ললাটের মাঝে সবুজ

টিকলি ও দুই কানে দুই মতি। ময়নার শরীরে পবিত্র কোরানের অক্ষর লেখা। ময়নার মুখে আল্লাহর জিকির ও নবির কালেমা। ময়নার সুরত দেখে হযরত আলি মোহিত হয়ে তাকে ধরতে যায়। ময়নার কাছে গিয়ে আলি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে ময়না হেসে উড়ে যায়। এভাবে ময়না একডাল থেকে আরেক ডালে উড়তে থাকে। ময়না এভাবে তামাশা করে আলিকে লালসা লাগায়। আলিকে রেখে ময়না উড়ে চলে। রাগে ব্যাকুল হয়ে মহাবলী আলি ময়নার পিছে পিছে চলতে থাকে। ময়না উড়ে যায় সমুদ্রের পানে। আলিও তার পিছনে সাঁতার দিলেন।

এসব দেখে ময়না নিজেকে মনে মনে বলে, একি করছি আমি। আমার জন্য কতজন দুঃখ পাবে। এজন্য আমি গুনাহগার হব। এই ভেবে ময়না তীরে এসে নিজের নীড়ে ফিরে আসল। তা দেখে আলিও সাঁতার কেটে তটে ফিরে আসলেন।

তীরে ফিরে আলি ময়নাকে ধরতে গেল, কিন্তু ময়না ধরা দিল না। সুন্দরী ময়নাকে ধরতে গেলে উড়ে যায়। কতদূরে গিয়ে এক মসজিদের ভিতর ময়না চলে গেল। ময়নার পিছনে পিছনে আলি মসজিদের নিকটে উপস্থিত হলো। মসজিদের দরজায় এক খাটুলির ওপর শয়নরত বৃদ্ধ একজন নারীকে আলি দেখলেন। আলি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মসজিদের ভেতর একটি ময়নাকে যেতে দেখেছ? উত্তরে বৃদ্ধা বলেন, হ্যাঁ একটি ময়নাকে যেতে দেখেছি। আলি বৃদ্ধাকে দরজা থেকে সরতে বললেন। বৃদ্ধা বলল, আমার নড়ার শক্তি নেই। আমাকে উঠিয়ে একপাশে রেখে মসজিদের ভিতর গিয়ে তুমি ময়না দেখ।

আলি প্রথমে খাটটি তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। রাগে আলি খুব জোরে টান দেয়; কিন্তু খাট নড়ে না বরং আলি মাটিতে হাটু গেড়ে বসে পড়ে। টানাটানি করেও আলি খাট উঠাতে পারে না। খাটুলিতে থাকা বৃদ্ধা এই ঘটনা দেখে আলিকে বলে, জগতের সকলে তোমাকে মহাবলী বলে কিন্তু তোমার মরদামিতো আমি বুঝতে পারলাম। আলি লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল, আমি কীভাবে মসজিদের ভিতর যাব? বৃদ্ধ আলিকে খাটুলির নিচ দিয়ে দেখার জন্য বলল। বলল, খাটের নিচ দিয়ে দেখে যদি ময়না থাকে তাহলে ধরে নিয়ে এসো।

খাটের নিচ দিয়ে তাকিয়ে ইমাম আলি আরশ কুরসি দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন মসজিদের ভিতর দুইজন বালক কোরান পড়ছে; তাদের মধ্যে একজন বালকের মুখ কালো এবং আরেক জন বালকের মুখ লাল হয়ে আছে। আলি ভাবতে থাকেন এই দুই আদম কারা? এসব দেখে আলি বৃদ্ধাকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয়, আলি কেন হুজ্জত কর? কেন তুমি ফাতেমার সুরত দেখতে চাইলে? তুমি যা দেখলে সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এসব কিছু ইমাম আলি মারেফত ভেবে আল্লাহর নাম জিকির করতে করতে ঘরে ফিরে গেল।

আলি ঘরে ফিরলে ফাতেমার সাথে দেখা হয়। ফাতেমা আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বনে কী দেখেছে? কী শুনেছে? কীসের সাক্ষাৎ পেল? আলি উত্তর দিল, আগে আমাকে সুরত দেখাও। বনে তার অনেক পেরেশানি হয়েছে। উত্তরে ফাতেমা বলল, হে মোর প্রভু, তুমি বনে যখন গিয়েছ তোমার সাথে আমিও গিয়েছিলাম। সেখানেই তুমি আমার রূপ দেখেছ। আলি বলল, বনে গিয়ে আমি একটি গাছের নিচে একজন ফকিরকে দেখলাম যে হাত বেঁধে মুনাজাত করছিল। এসময় ফকিরের কাছে একজন নারী দুইজন বালককে হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ফাতেমা বললেন, ঐ ফকির ছিলেন রাসুল। কঙ্কালিনী হলাম আমি এবং আমার সাথে ছিল হাসান হোসেন। রাসুল তাঁর উম্মতের মুক্তির জন্য নামাজ পড়ে কাঁদছিলেন।

ফাতেমা আবার আলিকে জিজ্ঞাসা করল আর কী দেখেছ তুমি? আলির কথা শুনে বলে, জঙ্গলের কিনারে রুটি বানিয়েছে যে কঙ্কালিনী, সে আর কেউ নয়, ফাতেমা স্বয়ং। তোমার জন্যই আমি রুটি বানাচ্ছিলাম। তুমিই আমার নিরঞ্জন। ফাতেমা আবার আলিকে রুটি খাওয়ার অনুরোধ করে। আলি বলে ফাতেমার সুরত না দেখলে সে রুটি খাবে না।

ফাতেমা বলে সুরত যা বনেই দেখেছ। সেখানে তোমার সঙ্গে আমিই ছিলাম। আলি কিছুটা রাগান্বিত হয়ে ফাতেমাকে বলে বনে দেখলাম এক ময়না। কে সেই ময়না? হাত জোড় করে ফাতেমা উত্তর দিল জঙ্গলে যে ময়না দেখেছ সেটি আমিই। আমিই ময়নার রূপ ধারণ করে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। ময়নার শিরে যে তাজ দেখেছো তা হল প্রভু করতার। গলায় হাঁসুলি দেখেছিলে তা ছিল দ্বীন রাসুল। ময়নার দুই কানে যে মতি তা হলো হাসান হোসাইন। ময়নার কপালের টিকলি হলে তুমি। ময়নার অঙ্গেতে তুমি যে কোরানের হরফ দেখেছ তা হল 'মোর বদনে' কোরানের অক্ষর।

আলি আবার ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মসজিদের দরজায় যে বৃদ্ধা ছিল তিনি কে? ফাতেমা উত্তর দিল, বৃদ্ধা হয়ে আমিই গিয়েছিলাম সেখানে। আলি বলল, তাহলে আমি তোমাকে তুলতে পারলাম না কেন? ফাতেমা বললেন, প্রভু শোন তিন ভুবনের আঠারো হাজার মাখলুকাত আমার ওপর ভর করেছিল। তা তুমি কীভাবে তুলবে?

আলি আবার ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদের ভিতর বেহেশত দেখলাম; আরশ কুরসি দেখলাম। আরও দেখলাম দুইজন বালক কোরান পড়ছে। এদের একজনের মুখ হয়ে আছে লাল আরেক জনের মুখ হয়ে আছে কালো। আলির কাছে এই কথা শুনে ফাতেমা ঢলে পড়ল; পুত্র পুত্র বলে কাঁদতে লাগল। হায় হায় করে বুক চাপড়াতে লাগল। কেন আমি এই মুখে জহর-কহর বলে গালি দিয়েছিলাম – এই বলে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে ফাতেমা আলিকে রুটি খাবার অনুরোধ করে। আলি আবার বলে, আগে সুরত দেখাও। ফাতেমা উত্তর দিল, আর কেমন সুরত দেখবে? কঙ্কালিনী, ময়নাবতী এবং বৃদ্ধা রূপে আমি গিয়েছিলাম। এসবই আমার সুরত। আলি বলে এসব কথা আমি শুনব না তোমার সকল সুরত দেখেই আমি খাবার খাব।

ফাতেমা আলির কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ফাতেমা রাসুলের কাছে গিয়ে এই ঘটনা বললেন। রাসুল আলির কাছে এসে বলল ফাতেমার সুরতের কথা একদিন বলব। আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমার অঙ্গে সুরত দিয়েছে। কিয়ামতের দিন সেই রূপ প্রকাশিত হবে। এখন যদি সেই সুরত দেখ তাহলে তার জ্যোতিতে তুমি জ্বলে মরবে। আরশ কুরসিসহ ত্রিভুবন জ্বলে যাবে। আরো জ্বলবে তোমার দুই 'ফরজন' হাসান হোসেন।

আলি উত্তর দিল, যদি মৃত্যুবরণ করি তা-ও আমি ফাতেমার সুরত দেখব। হাসান-হোসেন দুই ভাইও পিতাকে বোঝাতে লাগল । তারা বলল:

> মায়ের সুরত জ্যুত সহিতে নারিমু।
> সেই জুতে দুইই ভাইই জলিয়া মরিমু। (পুথি নং ৩৬৩: ফোলিও নং ২১, মুখ্য ও গৌণ পৃষ্ঠা)

মায়ের সুরতের জ্যোতি তারা সহ্য করতে পারবে না। সেই জ্যোতিতে তারা দুই ভাই পুড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে মা কী উত্তর দিবে। তারা বার বার বাবাকে হুজ্জত করতে নিষেধ করল।[২]

হাসান-হোসেনের অনুরোধ সত্ত্বেও আলি ফাতেমার সুরত দেখার কথা বলেন। ফাতেমা আলিকে সতর্ক করে যে সুরতের জ্যোতিতে তার মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। আলি আল্লাহর দোহাই দিয়ে সুরত দেখানোর জন্য ফাতেমাকে অনুরোধ করে। ফাতেমা পেরেশান হয়ে নবির কাছে যায়। নবিকে ফাতেমা বলে সুরত দেখানোর জন্য মাজার এক বন্ধ দুই বন্ধ তিন বন্ধ খোলার সাথে সাথে সে মুহচিত হয়ে যাবে। তখন নবি মা মা বলে ডাকতে থাকবে। কবির ভাষায়:

তবে সে ফাতেমা বিবি হইআ পেরসানি
নবির গেচরে জাই কহে স বানি
জখনে মাজা বন্ধ খুলিতে লাগিমু
এক বন্ধ খুলি দুই বন্ধ খুলিমু
তিন বন্ধ খুলিতে যে মুহুচিত হইমু।

(পুথি নং ৩০৩, ফোলিও নং ১৩)

ফাতেমা বিসমিল্লাহ বলে এক বন্ধ খুলে ফেলল। সাথে সাথে বিজলি চমকে উঠল। তখন ফাতেমা আলিকে অনুরোধ করল, এবার আমায় ক্ষমা কর। আলি উত্তরে বললেন, আমি কিছুই শুনব না। আমি তোমার সুরত দেখব। দুই বন্ধ খোলার পর আগুনের মত বিজলি চমকে উঠল। পুনরায় ফাতেমা আলির কাছে নিবেদন করল এবার ক্ষমা কর। আলি উত্তরে বলল আল্লাহর দোহাই আর কী সুরত আছে দেখাও। ফাতেমা ক্রোধে তিন বন্ধ খুলে ফেললেন। চারদিকে তখন আগুনের মতো বিজলি চমকালো। ফাতেমার সুরত দেখে আলি টলে পড়লেন। হাসান-হোসেন দুই ভাই ডাকতে লাগল। রাসুল মুহচিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর নবি উঠে বসলেন। মা মা বলে তিন বার ডাক দিলেন। বাবার ডাক শুনে মা ফাতেমার চেতনা ফিরে আসল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেলেন। সাথে সাথে জামা বেধে নিলেন। দেখলেন হাসান-হোসেন মূর্ছা গেছেন। আলি পড়ে আছে। রাসুল হতচকিত হয়ে আছে। ফাতেমা ভাবতে থাকলেন, কী করবেন তিনি? কার যত্ন নেবেন আগে? প্রথমে তিনি পিতার মুখ ধুয়ে দিলেন। তার পর স্বামী আলিকে শান্ত করলেন। সবশেষে দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে ...। (পুথি নং ৩০৩)[৩]

ফাতেমা দুইভাইকে ধরে বসাল। আলি সুরত দেখে সন্তুষ্টি হল এবং আল্লাহর শুকরিয়া করে নামাজ পড়ল। এর পরের অংশ কবির সমাপনী স্তবকগুলি নিম্নরূপ:

হীন সেক তনুএ কহে ভাব করতার।
শুনিয়া এসব কথা কিতাব মাজার॥
কিতাবেত এই কথা কর্নেত শুনিয়া।
আল্লাকে স্মরিয়া কিছু রাখিছে লেখিআ।
গুনিগন পদ আক্ষি করি নিবেদন।
জদি দোস হই থাকে খেম সর্ব্বজন॥
অশুদ্ধ হইলে তাকে শুদ্ধ করিবা।
গরিব দেখিয়া... সমুখে খেমিবা॥ (পুঁথি নং ৩০৪)[৪]

কবি-পরিচয়

কবি শেরবাজের পরিচয় জানার একমাত্র উৎস হল তাঁর রচিত কাব্যসমূহ। তবে দুঃখের বিষয়, ভণিতায় কবি নিজের নাম ছাড়া তেমন আর কোনো তথ্য প্রদান করেননি। ফলে সমসাময়িক অন্যান্য কাব্য ও সেগুলির রচনাকাল নির্ণয়ের মাধ্যমে পণ্ডিতগণ কবির পরিচয় ও রচনার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং এনামুল হকের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *ফাতেমার সুরতনামা*-র কবি হিসেবে শেরতনুর নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এই কবি ষোড়শ শতাব্দীর কবি (Karim and Sharif, 1960: Appendix, vi)। তবে তিনি শেরবাজ চৌধুরি নামে আরেকজন কবির নাম উল্লেখ করেন যিনি *কাসেমের লড়াই* এবং *মল্লিকার সাওয়াল* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি এই কবির কাল চিহ্নিত করেন অষ্টাদশ শতাব্দী (Karim and Sharif, 1960: Appendix, vii)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাঁচটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩০২, ৩০৩ ও ৩০৪ নং পাণ্ডুলিপিতে কবির নাম শেখ তনু এবং ৩৬৩ নং পাণ্ডুলিপির ভণিতাতে নাম উল্লেখ আছে শেরবাজ। কবি নিজের পরিচয়ে বলছেন:

হীন শেরবাজে কহে সবার চরণ।
ফাতেমার সুরতের কথা শোন সবাগন
(ফোলিও নং ০১, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ৩৬৩)

এনামুল হক তাঁর *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* গ্রন্থে কবি শেরবাজকে ত্রিপুরার কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মোট তিনটি কাব্য-পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে (হক, ২০০১: ১৬৪)। কাব্যগ্রন্থ তিনটি হলো: *ফাতেমার সুরতনামা*, *কাসেমের লড়াই* এবং *মল্লিকার সাওয়াল*। তাঁর মতে সমসাময়িক আরেক জন কবি শৈখ সাদী *গদা মল্লিকা* কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যে বিষয়বস্তু হলো রুম-রাজনন্দিনী মল্লিকার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। মল্লিকা পণ করেছিলেন, তাঁর হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। অনেক যুবরাজ ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়। পরে আবদুল্লাহ ওরফে গদা তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া মল্লিকাকে বিয়ে করেন। কাব্যটির একটি তারিখ পাওয়া যায় ১১২২ ত্রিপুরা অব্দ/ ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দ (হক, ২০০১: ১৬৪)। এনামুল হকের মতে শৈখ সাদী এবং কবি শেরবাজ-এর মধ্যে দ্বিতীয়জনই পূর্ববতী সময়ের। দুইজন কবিই মূলত ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর *ফক্কর নামা* কাব্যের হুবহু অনুকরণ করে বাংলা ভাষায় কাব্যাকারে কাহিনিটি উপস্থাপন করেন। কবি শেরবাজ তাঁর কাব্যে এরকমই একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

ফক্কর নামা নামে এক কিতাব আছিল।
পীরের প্রভাবে কিছু প্রচার করিল ॥

কিন্তু শৈখ সাদীর কাব্যটিতে এরকম কোনো ইঙ্গিত নাই। তাতেই হক মনে করেন, শেরবাজের কাব্য পড়েই শৈখ সাদী তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। অতএব শেরবাজ ১৭১২ সালের আগের কবি । শেরবাজের *কাসেমের লড়াই* কারবালার ঘটনার একাংশের সাদামাটা বিবরণ। কিন্তু হকের মতে ''*ফাতেমার সুরতনামা* একটি অদ্ভুত পুস্তক। ইহার বিষয়-বস্তু সত্যই অদ্ভুত। মনে হয় ইহা বাংলা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের মুসলিম জওয়াব" (হক, ২০০১: ১৬৪-৬৫)। অনুরূপ একটি ধারণা

কাজী আব্দুল মান্নানের *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal upto 1855* গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এরকম একটি সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে মুসলিম কবিগণ বাংলা ভাষায় ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের অনুকরণে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনাকে চিত্রায়ণ করতে থাকেন। *ফাতেমার সুরতনামা*র মতো অনুরূপ কাব্যগ্রন্থ হলো সুলতানের লেখা *ইবলিশনামা*, শেখ পরান এবং মীর মোহাম্মদের লেখা *নূরনামা* এবং শেখ চাঁদের লেখা *কেয়ামতনামা*। তিনিও মনে করেন এখানে রাসুল (স.) কন্যা ফাতেমাকে চণ্ডী দেবীর প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে (Mannan, 1974: 32)। লিপির বৈশিষ্ট্যের আলোকে কবির এবং কাব্য গ্রন্থটির কাল নির্ধারণের একটি চেষ্টা করা যেতে পারে। বাংলা অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপির অক্ষর এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষজ্ঞরা একে অষ্টদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুকৃত হিসেবে মত প্রকাশ করেন।[৫] এ বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের সংগ্রহশালাগুলিতে অনুরূপ পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান ও লিপিবিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা।

উপসংহার

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। প্রাক-আধুনিক যুগের বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক উন্মোচন ও নতুন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র হিসেবে *ফাতেমার সুরতনামা* কাব্যটিকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাব্যটিকে ব্যাখ্যা করা হলে সমকালীন দৈনন্দিন ইতিহাসের উৎস হিসেবে এটিকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কবি শেরবাজ খান ইসলাম ধর্মের এই কাহিনিটি চিত্রায়িত করেছেন বাংলার ভৌগোলিক ও সামাজিক অবকাঠামোতে। তাঁর কাব্যের চরিত্র আলি বা ফাতেমা রাসুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুইজন সাহাবি। কিন্তু কবি তাদেরকে দেখিয়েছেন বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে। যেমন: আলির বকরের ঘর থেকে ফিরে এসে পালঙ্কতে শুয়ে পড়া, কিংবা ফাতেমা কর্তৃক আলিকে মৃগয়ায় পাঠানো কিংবা আলির জন্য ফাতেমার খাবার বানানো, বনের কিনারে কঙ্কালিনীর ছদ্মবেশে ফাতেমার রুটি বানানো কিংবা ময়নার অলঙ্করণের বর্ণনায় দেশীয় অলংকার যেমন হাসুলি, টিকলি ইত্যাদির উল্লেখ সামাজিক ইতিহাসে নতুন সংযোজন হতে পারে।

টীকা

[১] বর্তমান প্রবন্ধের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন মহোদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধটি ২০১৮ সালে কলা অনুষদ বক্তৃতামালা-৪ (৯ অক্টোবর ২০১৮)-এর লিখিত রূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বর্তমান গবেষককে ২০১৭-১৮ বর্ষে তাঁদের পাণ্ডুলিপি পাঠ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে *ফাতেমার সুরতনামা* পাণ্ডুলিপিটি পাঠোদ্ধার করতে দিয়েছিল। প্রবন্ধটি উক্ত পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও গবেষণা কর্মের অংশ।

[২] পুথি নং ৩৬৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ], এখানেই এই পুথিটির পৃষ্ঠা শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৩ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

[৩] পুথি নং ৩০৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ] থেকে কাহিনির এই অংশটুকু পুনর্গঠন করা, এখানেই এই পুথিটির ফোলিও শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৪ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

[৪] পুথি নং ৩০৪ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ] থেকে কাহিনির এই অংশটুকু পুনর্গঠন করা, এখানেই এই পুথিটির পৃষ্ঠা শেষ। এর পর পুথির লিপিকাল লেখা আছে ১১৯৬ মঘী বা ১৮৩৪।

[৫] বর্তমান গবেষক এই পাণ্ডুলিপিগুলি ড. শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়কে দেখালে তিনি এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদিও অনুলিপিগুলি অষ্টাদশ শতকের কিন্তু এই কাহিনির প্রাচীনতা আরো দুই/তিন শতক আগের। এছাড়া ড. রজত সান্যাল (লিপি বিশারদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ, হেড, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এটিকে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের হিসেবে মত প্রকাশ করেন।

আকর সূত্র (Primary sources)

চৌধুরী শেখ শেরবাজ, *বিবি ফাতেমার সুরত নামা* [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] সা-বি ৭৮৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

তনু শেখ, *ফাতেমার সুরত নামা* [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] পুথি নং ৩০২, এমএস ১৩৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

তনু শেখ, *ফাতেমার সুরত নামা* [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] পুথি নং ৩০৩, এমএস ১২৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

তনু শেখ, *বিবি ফাতেমার সুরত নামা* [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] পুথি নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

তনু শের, *বিবি ফাতেমার সুরত নামা* [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] পুথি নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

উল্লেখপঞ্জি

কাইউম, মোহাম্মদ আব্দুল। (২০০০) *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*, ঢাকা: গতিধারা

পারভীন, সৈয়দা সুলতানা, শাহীন সুলতানা এবং সৈয়দ আলী আকবর (সম্পা.)। (২০০৬) *পাণ্ডুলিপি পারিচয়*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি

মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা* (১৯৮৪) ঢাকা: বাংলা একাডেমি

রহমান, এস এম লুৎফর। (২০০৫) *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একডেমি

হক, এনামুল *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*। (২০০১) ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, (৩য় সংস্করণ)

Karim Munshi Abdul and Ahmad Sharif, (1960) *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan,

Mannan, Qazi Abdul, (1974) *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.)*, Dhaka: Bangla Academy, (2nd rep).

Parvin, Syeda Farid (compiled), (2013) *An Alphabetic Index of Bengali Manuscripts (Abdul Karim Sahity Bisharad's Collections*, Part III, Dhaka : Dhaka University Library

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা

প্রমথ মিস্ত্রী*

Abastract : Bangla and Sanskrit language both have feminine association in their respective grammar. We still have to rely on Sanskrit to form Bangla new words. A notable example is the suffixation process in the morphology of both languages. The main topic of this article is to describe word formation processes of both languages. In Bangla, there is a wide use of words formed from Sanskrit strī-pratyaẏa. Therefore, the main topic of the present article is to highlight strī-pratyaẏa and affirmative words to indentify how these elements provide with a large vocabulary for Bangla language.

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন ভাষা। আর মুহম্মদ শহীদুলালাহ্-র মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা এসেছে। তবে বাংলা ভাষা সরাসরি প্রাকৃত থেকে আসলেও এ ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। সব ভাষার মতো এ দুটো ভাষায়ও রয়েছে ব্যাকরণের চারটি মৌলিক বিষয়। যথা– ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি রূপতত্ত্বের মধ্যে নিহিত। কারণ উভয় ভাষার শব্দ গঠনের (উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি) একটি অন্যতম প্রক্রিয়া প্রত্যয় (suffix)। উভয় ভাষায় প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয় । বাংলা ভাষায় শব্দ তৈরির যতগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের প্রভাব বিদ্যমান। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও সেটা পরিলক্ষিত। পাণিনির[১] *অষ্টাধ্যায়ীর* তৃতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় (অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) পর্যন্ত সমস্ত প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। (বিশ্বরঞ্জন পণ্ডা , ২০১৪ : ১) উভয় ভাষায় প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার । যথা– ১. কৃৎ-প্রত্যয় ও ২. তদ্ধিত-প্রত্যয়। তবে উভয় ভাষায় আরো কিছু বিভাগ আছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে আরো তিন প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা–১. বিভক্তি ২. **স্ত্রী-প্রত্যয়** ও ৩. ধাতুবয়ব। অপরদিকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও আরো পাঁচ প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা– কৃৎ-প্রত্যয় > ১. বাংলা কৃৎ ২. সংস্কৃত কৃৎ; তদ্ধিত-প্রত্যয় > ৩. বাংলা তদ্ধিত ৪. সংস্কৃত তদ্ধিত ও ৫. বিদেশি তদ্ধিত। উক্ত বাংলা বিভাগে **স্ত্রী-প্রত্যয়** বিভাগটি না থাকলেও বাংলা ব্যাকরণের 'লিঙ্গ পরিচ্ছেদে' (পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ) আছে। সেক্ষেত্রেই সংস্কৃত **স্ত্রী-প্রত্যয়** ব্যবহৃত হয়েছে। (মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ২০০২ : ৫০-৫২) এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে (টাপ্ > আ, ঙীপ্ > ঈ প্রভৃতি) তদ্রূপ উক্ত প্রত্যয় দ্বারা সাধিত শব্দেরও কিছু রূপান্তর [মাননীয় + টাপ্ = মাননীয়া, মাননীয়া + সুপ্ = মাননীয়া > মাননীয়া (বাংলা রূপ); সিংহ + ঙীপ্ = সিংহী, সিংহী + সুপ্ = সিংহী > সিংহী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি] ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে সেটা আমরা বিস্তারিত অনুসন্ধানে তৎপর হব। আজ প্রমিত বাংলার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতের অবদান। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> আমরা যখন কোন কিছু সাধু ভাষায় লিখি তখন সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা আসে প্রায় ৫৫% থেকে ৬০% ভাগ। আর যখন চলিত ভাষায় লিখি তখন তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভব) শব্দের সংখ্যা আসে ৬৫% থেকে ৭০% ভাগ। বাকীটা অন্যান্য শব্দ (আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি) মিলে। বাংলা ভাষায় কোন শব্দের প্রভাব কতটুকু তার একটি শতকরা হিসাব ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে দিয়েছেন। হারটি এরূপ– তৎসম ৪৪%, তদ্ভব ও দেশি ৫১.৪৫%, বিদেশি ৪.৫৫%। (নিখিল রঞ্জন, ২০১৭ : ১৯) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র বা জসীম উদ্‌দীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকদের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে শাব্দিক অনুপাত পাই তাকে মোটামুটি এইভাবে দেখানো যায়– তৎসম শব্দ ২৫%, অর্ধ-তৎসম ৫%, তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভব) ৬০%, বিদেশী ৮%, দেশি ২%। (মুহম্মদ এনামুল, ২০০৩ : উপক্রমণিকা)

উক্ত হিসাব থেকে আমরা বলতে পারি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সংস্কৃতের অবদান অনস্বীকার্য। তাই এক্ষেত্রে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ কীভাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে ঋদ্ধ থেকে ঋদ্ধতর করেছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ

সংস্কৃতে প্রতি পূর্বক ই–ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে 'প্রত্যয়ঃ' (প্রতি-√ই + অল্ = প্রত্যয়, প্রত্যয় + সুপ্ = প্রত্যয়ঃ > প্রত্যয়) শব্দটি গঠিত হয়েছে। (পাণিনি, ২০১২ : ১৮১) ই-ধাতুর অর্থ যাওয়া কিন্তু 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণের ভাষায় প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) অর্থাৎ শব্দ ও ধাতুর পরে যুক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ।' অর্থাৎ যা **প্রকৃতির** পরে যুক্ত হয় তাই প্রত্যয়। (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১ : ১২২) আর ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'প্রকৃতেঃ পরঃ প্রত্যয়ো বেদিতব্যঃ'। অর্থাৎ যা প্রকৃতির পরে যুক্ত হয় (এরফলে পদ বা শব্দ গঠিত হয়) তাকে প্রত্যয় বলে জানবে। (পাণিনি, ২০১২ : ১১২) যেমন–

বিভক্তি : √ভূ + লট্ -তি = ভবতি (হয়)

কৃৎ-প্রত্যয় : √গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)

তদ্ধিত-প্রত্যয় : দশরথ + ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন)

স্ত্রী-প্রত্যয় : দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ = দেবী (দেবতা) > দেবী (বাংলা রূপ)

ধাত্ববয়ব : √পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)
√পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিসতি (পড়তে চায়)
√পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (পুনঃ পুনঃ পাঠ করা)

এখানে তি, তব্য, ইঞ্, ঙীপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

১. কৃৎ
২. তদ্ধিত

তবে এর বাইরে আরো তিন প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা–

১. বিভক্তি
২. স্ত্রী-প্রত্যয় ও
৩. ধাতুবয়ব

বিভাগটি নিচের ছকে প্রদর্শিত হলো :

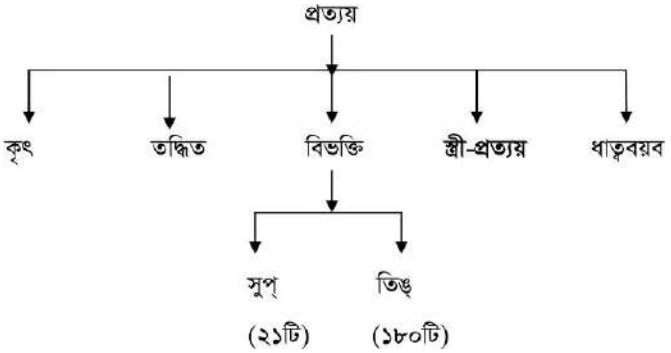

১. বিভক্তি (বি-√**ভজ্ + ক্তি = বিভক্তি** Suffixes) : বিভক্তিশ্চ [পাণিনি (পা.) ১/৪/১০৪]।

সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। যার দ্বারা সংখ্যা ও কারক বোঝায় তাকে বিভক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর তিঙ্ (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ও প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু ,ঔ প্রভৃতি) যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। যেমন–

তিঙ্ : √ভূ + লট্ -তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)

সুপ্ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (মানুষটি) > নর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ' ধাতুর উত্তর তি এবং 'নর' প্রাতিপদিকের উত্তর সু (ঃ) যুক্ত হয়েছে। এগুলো বিভক্তি।

২. কৃৎ-প্রত্যয় (√কৃ + ক্বিপ্ = কৃৎ primary suffixes) : ক) ধাতোঃ (পা. ৩/১/৯১)।
খ) কৃদতিঙ্ (পা. ৩/১/৯৩)।

ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন–

√গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে) > গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'গম্' ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন তব্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এটি কৃৎ-প্রত্যয়।

৩. তদ্ধিত-প্রত্যয় (তৎ + হিত = তদ্ধিত secondary suffixes) : তদ্ধিতাঃ (পা. ৪/১/৭৬)।

তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যো) হিতাঃ প্রত্যায়াঃ উচ্যন্তে। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ঠ অনুসারে প্রযুক্ত হয় তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। অন্যভাবে বলা যায়– প্রাতিপদিকের উত্তর যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন–

সর্বজন + খ (ঈন) = সর্বজনীন, সর্বজনীন + সুপ্ = সর্বজনীনঃ > সর্বজনীন (বাংলা রূপ) [সর্বজনেভ্যো হিতঃ]

সর্বজন + খঞ্ (ঈন) = সার্বজনীন, সার্বজনীন + সুপ্ = সার্বজনীনঃ > সার্বজনীন (বাংলা রূপ) [সর্বজনেষু সাধুঃ] ইত্যাদি।

এখানে 'সর্বজন' প্রাতিপদিকের উত্তর খ (ঈন) এবং খঞ্ (ঈন) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো তদ্ধিত-প্রত্যয়।

উল্লেখ্য, 'আত্মন্‌বিশ্বজনভোগত্তরপদাৎ খঃ' (পা. ৫/১/৬) এবং 'প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্' (পা. ৪/৪/৯৯) সূত্রদ্বয় অনুসারে যথাক্রমে চতুর্থী ও সপ্তমী অর্থে 'সর্বজনীন' ও 'সার্বজনীন' শব্দদ্বয় গঠিত হয়েছে। দুটি শব্দই সঠিক।

স্মর্তব্য, খঞ্ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। এটি ঞ্-এর জন্যই হয়ে থাকে।

৪. স্ত্রী-প্রত্যয় (feminine suffixes) : স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪/১/৩)।

স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে। যেমন–

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল) > অজা (বাংলা রূপ)

দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী (দেবতা) > দেবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে অজ, দেব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো স্ত্রী-প্রত্যয়।

৫. ধাত্ববয়ব (ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব Parts of root) : যেসব প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব স্বরূপ সেসব প্রত্যয় হচ্ছে ধাত্ববয়ব। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন–

ধাতু : √পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)

√পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিসতি (পড়তে চায়)

√পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (বার বার পড়া)

প্রাতিপদিক : আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + কাম্য + লট্-তি = পুত্রকাম্যতি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)

আত্মনঃ ধনমিচ্ছতি = ধন + ক্যচ্ + লট্-তি = ধনীয়তি (নিজের জন্য ধন চায়)

এখানে 'পঠ্' ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং পুত্র, ধন প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো ধাতুবয়ব।

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ

বাংলা ব্যাকরণে অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ নির্ণয়ে আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ আর বাংলায় প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ মূলত একই। এক্ষেত্রে নতুন করে আর উল্লেখ করা হলো না।

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

বাংলা ব্যাকরণেও প্রত্যয় প্রধাণত দুই প্রকার। যথা–

১. কৃৎ-প্রত্যয় [ধাতুর উত্তর বসে]

কৃৎ-প্রত্যয় আবার দুপ্রকার। যথা–
ক) বাংলা কৃৎ ও
খ) সংস্কৃত কৃৎ

২. তদ্ধিত-প্রত্যয় [বিশেষ্য পদের উত্তর বসে]

তদ্ধিত-প্রত্যয় আবার তিন প্রকার। যথা–
ক) বাংলা তদ্ধিত
খ) সংস্কৃত তদ্ধিত ও
গ) বিদেশি তদ্ধিত

বিভাগটি ছকে প্রদর্শিত হলো :

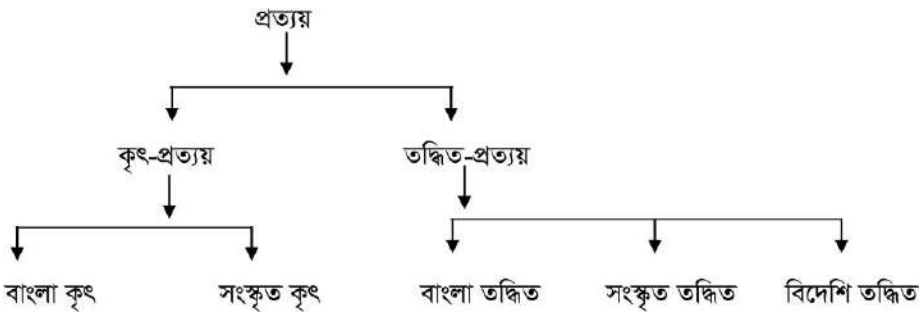

লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ সংস্কৃতে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে 'স্ত্রী-প্রত্যয়' বিভাগটি থাকলেও বাংলায় এটি নেই। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের 'লিঙ্গ পরিচ্ছেদে' (পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ) এটি আছে। তাই কীভাবে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়েছে তা অনুসন্ধানে এখন আমরা তৎপর হব।

এক নজরে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার

সংস্কৃত ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তি জাত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই (অদৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) বাংলা ভাষার মূলত মূল শব্দ। যেমন– সংস্কৃত গুণিন্ শব্দের প্রথমার একবচন গুণিন্ + সুপ্ = 'গুণী' অদৃশ্যমান বিভক্তিরূপ যা বাংলারও রূপ প্রভৃতি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রথমা রূপটি (দৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) তার বিভক্তি পরিহার করে বাংলায় ব্যবহৃত হয় [ধেনু, ধেনু + সুপ্ = ধেনুঃ > ধেনু (বাংলা রূপ)]। নিচে এক নজরে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হলো :

সংস্কৃত বাংলা

স্ত্রী-প্রত্যয় : কোকিল + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = কোকিলা, কোকিলা + সুপ্ = কোকিলা > কোকিলা (বাংলা রূপ)

নদ + ঙীপ্ = নদী, নদী + সুপ্ = নদী > নদী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে সুপ্ বিভক্তিজাত কোকিলা, নদী শব্দের প্রথমার একবচনের অদৃশ্যমান বিভক্তিরূপটিই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মূলশব্দ।

প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে যা সহায়ক

প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে নিচের বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

প্রকৃতি (base) : মূল শব্দকে (ক্রিয়াবাচক, বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক) প্রকৃতি বলে। (Ashoke kumar, ২০০৮ : ৪) যেমন–

ক্রিয়াবাচক : ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

বস্তুবাচক : সূর্য
তরু
জল ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর
মন্দ
পুরাণ ইত্যাদি।

এখানে ক্রিয়াবাচক, বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক যথাক্রমে ভূ, সূর্য, সুন্দর প্রভৃতি শব্দগুলো মূলশব্দ। তাই এগুলো প্রকৃতি।

প্রকৃতি দুপ্রকার। যথা–

১. ধাতু (Verbal root) : ভূবাদয়ো ধাতবঃ (পা. ১/৩/১)।
ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.) : ক্রিয়াবাচিনো ভাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

ভূপ্রভৃতয়ো বাসদৃশ্য যে তে ধাতুসংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। ভূ (হওয়া) প্রভৃতি বা (প্রবাহিত হওয়া) সদৃশ যে শব্দস্বরূপ তাদের ধাতু বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়– ক্রিয়াবাচক ভূ (হওয়া) প্রভৃতি প্রকৃতির ধাতু সংজ্ঞা হয়। যেমন–

ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ', 'গম্' প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক। তাই এগুলো ধাতু।

২. প্রাতিপদিক (প্রতিপদং গৃহ্যতি যৎ তৎ = প্রতিপদ + ঠক্ = প্রাতিপদিক nominal base):

ক) অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (পা. ১/২/৪৫)।
খ) কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ (পা. ১/২/৪৬)।

অর্থবিশিষ্ট শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তিযুক্ত শব্দ প্রাতিপদিক নয়। কিন্তু কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দ প্রাতিপদিক। যেমন–

কৃদন্ত : √কৃ + ণ্বুল্ = কারক, কারক + সুপ্ = কারকঃ > কারক (বাংলা রূপ)

তদ্ধিতান্ত : রাবণ + ইঞ্ = রাবণি, রাবণি + সুপ্ = রাবণিঃ > রাবণি (বাংলা রূপ)

সমাসবদ্ধ : রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষ, রাজপুরুষ + সুপ্ = রাজপুরুষঃ > রাজপুরুষ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, 'প্রাতিপদিক' একটি মহাসংজ্ঞা। তাই–

বার্ত্তিককারের মতে, অনর্থক নিপাতগুলোরও প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়। উক্ত হয়–
নিপাতস্যানর্থকস্য প্রাতিপদিকসংজ্ঞা বক্তব্যা [বার্ত্তিক (বা)]।

যেমন–
বৈ (সম্বোধন, পাদপূরণ)
হ (সম্বোধন, পাদপূরণ) ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে– যা বস্তুবাচক অথবা বস্তুর বিশেষণবাচক তাকে প্রাতিপদিক (বা নাম) বলে। (ঈশ্বরচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭) যেমন–

বস্তুবাচক : সূর্য
তরু
জল ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর
মন্দ
পুরাণ ইত্যাদি।

এখানে সূর্য, সুন্দর প্রভৃতি বিভক্তিহীন শব্দ। এগুলো প্রাতিপদিক।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–

১. ইৎ (ই + ক্বিপ = **ইৎ** Indicatory letter) :

ক) কস্মৈচিৎ কার্যায়োচ্চর্যমাণো বর্ণ ইৎসংজ্ঞো ভবতি।
খ) 'উপদেশেঽ জনুনাসিক ইৎ' (পা. ১/৩/২)। থেকে 'লশকৃতদ্ধিতে' (পা. ১/৩/৮)।
গ) তস্য লোপঃ (পা. ১/৩/৯)।

ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ কার্যের জন্য প্রাতিপদিক, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, আগম, আদেশ প্রভৃতির অঙ্গরূপে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে ইৎ বলে। (প্রবোধচন্দ্র ও হৃষীকেশ, ২০০৮ : ৯) সংক্ষেপে বলা যায়– প্রত্যয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু বর্ণ থাকে। উক্ত প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রত্যয়ের বাড়তি অংশ যা লোপ পায় তাকে ইৎ বলে। যেমন–

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল) > অজা (বাংলা রূপ)
দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী (দেবতা) > দেবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'টাপ্' ও 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের যথাক্রমে 'ট্ ও প্' এবং 'ঙ্ ও প্' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ ইৎ হয়েছে। এগুলোই ইৎ বর্ণ। আর এই 'ট্ ও প্' এবং 'ঙ্ ও প্' বলে দিচ্ছে অজ ও দেব-এর অন্তে যথাক্রমে আ ও ঈ-কার যুক্ত হবে। উল্লেখ্য, এই উদাহরণদ্বয় থেকে প্রমাণিত প্রত্যয় নিরর্থক নয় (যেহেতু ইৎ বর্ণ বলে দিচ্ছে)। অর্থাৎ প্রত্যয়েরও অর্থ আছে।

২. টি : অচোঽন্ত্যাদি টি (পা. ১/১/৬৪)।

শব্দের অন্ত্য স্বর অথবা অন্ত্য স্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে 'টি' বলে। যেমন-

শক = শ্ + অ + ক্ +**অ**
কুল = ক্ + উ + ল্ + **অ**
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + **অ + স্**
পতৎ = প্ + অ + ত্ + **অ + ৎ** ইত্যাদি।

এখানে শব্দগুলোর দাগাঙ্কিত বর্ণ বা বর্ণসমূহ টি।

৩. উপধা : অলোঽন্ত্যাৎপূর্ব উপধা (পা. ১/১/৬৫)।

শব্দের অন্ত্যবর্ণের ঠিক পূর্ব বর্ণকে 'উপধা' বলে। যেমন–

শক = শ্ + অ + ক্ +**অ**
কুল = ক্ + উ + ল্ + **অ**
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + **অ + স্**
পতৎ = প্ + অ + ত্ + **অ + ৎ** ইত্যাদি।

এখানে শব্দগুলোর দাগাঙ্কিত বর্ণ উপধা।

৪. আগম (Augment) : প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরনুপঘাতী আগমঃ।

প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অতিরিক্ত বর্ণের উপস্থিতিকে আগম বলে। (বিশ্বরূপ, ১৯৯৭ : ৩৫) যেমন–

প্রকৃতি : বন্ + পতি = বনস্পতি [স্]
প্রত্যয় : বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান [শানচ্ = আন > মান প্রত্যয়ে 'ম্' ইত্যাদি।]

এখানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণ স্ ও ম্ এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অতএব এগুলো আগম।

উল্লেখ্য, আগম বন্ধুর মতো এসে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটিয়ে উভয়ের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে। তাই বলা হয়–

'মিত্রবদাগমঃ'।

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়

স্ত্রী-প্রত্যয় (feminine suffixes) : স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪/১/৩)।

স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে। যেমন–

কৃপণ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = কৃপণা, কৃপণা + সুপ্ = কৃপণা > কৃপণা (বাংলা রূপ)
হরিণ + স্ত্রিয়াম্ ঈপ্ = হরিণী, হরিণী + সুপ্ = হরিণী > হরিণী (বাংলা রূপ)
মনুষ্য + স্ত্রিয়াম ঙীপ্ = মনুষী, মনুষী + সুপ্ = মনুষী > মনুষী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে টাপ্, ঈপ্ ও ঙীপ্ স্ত্রী-প্রত্যয়।

উল্লেখ্য, প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় হয়। তবে তি, নি ও মি স্ত্রী-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। এগুলো যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়

পাণিনীয় মূল প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠনের সময় সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে মূল প্রত্যয়ের কিছু অংশ লোপ পায় বা ইৎ যায় (ব্যতিক্রমও আছে)। অর্থাৎ পুরোটা ব্যবহৃত না হয়ে যতটুকু কার্যকরী সেটুকু ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে বিষয়টি ছকে প্রদর্শিত হলো :

ক্রমিক নং	পাণিনীয় মূল প্রত্যয়	সংস্কৃত / বাংলায় ব্যবহৃত অংশ
১	টাপ্	আ
২	চাপ্	আ
৩	ডাপ্	আ
৪	ঙীপ্	ঈপ্ / ঈ
৫	ঙীষ্	ঈষ্ / ঈ
৬	ঙীন্	ঈ
৭	ঊঙ্	ঊ
৮	ক্তিন্ (ক্তি)	তি
৯	তল্	তা
১০	নি ও মিক্	নি ও মি

উল্লেখ্য, পাণিনি ব্যাকরণে ছকে প্রদর্শিত এক থেকে আট (১–৮) পর্যন্ত আটটি স্ত্রী-প্রত্যয়ের উল্লেখ আছে। তবে এর বাইরেও কিছু প্রত্যয় (তল্ প্রভৃতি) ও একাক্ষর কারান্ত কিছু শব্দ (শ্রী, ভূ প্রভৃতি) আছে যারা স্ত্রীলিঙ্গ হয়। উক্ত প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন > উক্ত শব্দ বাংলায় ব্যবহার

সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্ত্রী-প্রত্যয় রয়েছে। এখানে কেবল প্রচলিত যেসব সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বর্ণানুক্রমে দৃষ্টান্তসহ নিচে তুলে ধরা হলো :

টাপ্ (আ) প্রত্যয় :

১। টাপ্ (আ) প্রত্যয় : অজ প্রভৃতি অ-কারান্ত শব্দের (প্রাতিপদিক) উত্তর টাপ্ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করার

সময় টাপ্ প্রত্যয়ের 'ট্' ও 'প্' ইৎ হয় এবং 'আ' (= া) থাকে। স্মরণীয়, বিভিন্ন অর্থে এই প্রত্যয়টি

ব্যবহৃত হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২২২) যেমন–

ক) সাধারণ অর্থে :

চপল + টাপ্ = চপলা, চপলা + সুপ্ = চপলা > চপলা (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

খ) জাতি বা শ্রেণি অর্থে :

শূদ্র + টাপ্ = শূদ্রা, শূদ্রা + সুপ্ = শূদ্রা > শূদ্রা (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, মহৎ (> মহা) শব্দ পূর্বে থাকলে শূদ্র শব্দের উত্তর ঙীপ্ হয়। যেমন–

মহাশূদ্র + ঙীপ্ = মহাশূদ্রী, মহাশূদ্রী + সুপ্ = মহাশূদ্রী > মহাশূদ্রী (বাংলা রূপ)

২। টাপ্ প্রত্যয় হলে প্রত্যয়স্থিত ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের স্থানে ই-কার হয়। স্মরণীয়, বিভিন্ন অর্থে এই প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ৫৮৭) যেমন–

ক) সাধারণ অর্থে :

নায়ক + টাপ্ = নায়িকা, নায়িকা + সুপ্ = নায়িকা > নায়িকা (বাংলা রূপ)

বালক + টাপ্ = বালিকা, বালিকা + সুপ্ = বালিকা > বালিকা (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

খ) ক্ষুদ্রার্থে :

নাটক + টাপ্ = নাটিকা, নাটিকা + সুপ্ = নাটিকা > নাটিকা (বাংলা রূপ)
পুস্তক + টাপ্ = পুস্তিকা, পুস্তিকা + সুপ্ = পুস্তিকা > পুস্তিকা (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

ঙীপ্ (ঈপ্) প্রত্যয় :

১। ঋ-কারান্ত ও ন-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করার সময় ঙীপ্ প্রত্যয়ের 'ঙ্' ও

'প্' ইৎ হয় 'ঈ' থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ২২৩) যেমন–

ঋ-কারান্ত প্রাতিপদিক :

নেতৃ (নেতা) + ঙীপ্ = নেত্রী, নেত্রী + সুপ্ = নেত্রী > নেত্রী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ন-কারান্ত প্রাতিপদিক :

মেধাবিন্ (মেধাবী) + ঙীপ্ = মেধাবিনী, মেধাবিনী + সুপ্ = মেধাাবিনী > মেধাবিনী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

২। জাতি বোঝালে জাতিবাচক অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৩) যেমন–
ব্রাহ্মণ + ঙীপ্ = ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী + সুপ = ব্রাহ্মণী > ব্রাহ্মণী (বাংলা রূপ)
বৈষ্ণব + ঙীপ্ = বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবী + সুপ = বৈষ্ণবী > বৈষ্ণবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৩। উ-কারেৎ (মতুপ্ > মৎ প্রভৃতি) ও ঋ-কারেৎ (শতৃ > অৎ প্রভৃতি) প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২২৩, ৫৪৭) যেমন–

উ-কারেৎ (মতুপ্ > মৎ প্রভৃতি) প্রত্যয় :

বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধি + মতুপ্) + ঙীপ্ = বুদ্ধিমতী, বুদ্ধিমতী + সুপ্ = বুদ্ধিমতী > বুদ্ধিমতী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ঋ-কারেৎ (শতৃ > অৎ প্রভৃতি) প্রত্যয় :

বিদ্বৎ / বিদ্বস্ [বিদ্ + শতৃ (বসু)] + ঙীপ্ = বিদুষী, বিদুষী + সুপ্ = বিদুষী + সুপ্ = বিদুষী > বিদুষী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

৪। যে সকল জাতি-বাচক প্রাতিপদিকের উপধা (অন্ত্য বর্ণের পূর্ববর্ণ) স্থলে 'য' থাকে, তাদের উত্তর ঙীপ্ হয় না, টাপ্ হয়। কিন্তু হয় (ঘোড়া) প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীপ্ হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৩) যেমন–

উপধা স্থলে (অন্ত্য বর্ণের পূর্ববর্ণ) 'য' :

বৈশ্য + টাপ্ = বৈশ্যা, বৈশ্যা + সুপ্ = বৈশ্যা > বৈশ্যা (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

অন্যান্য স্থলে :

হয় + ঙীপ্ = হয়ী, হয়ী + সুপ্ = হয়ী > হয়ী (বাংলা রূপ)

মৎস্য + ঙীপ্ = মৎসী, মৎসী + সুপ্ = মৎসী > মৎসী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৫। ট-ইৎ শব্দ ও প্রত্যয়, ঢ, অণ্, অঞ্, দ্বয়সচ্, দঘ্নচ্, মাত্রচ্, তয়প্, ঠক্, ঠঞ্, কঞ্ ও কুরপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২২৪) যেমন–

ট-ইৎ শব্দ :

নদ + ঙীপ্ = নদী, নদী + সুপ্ = নদী > নদী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ট-ইৎ প্রত্যয় :

নিশাচর + ঙীপ্ = নিশাচরী, নিশাচরী + সুপ্ = নিশাচরী > নিশাচরী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ঢ (এয়)- প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

ভাগিনেয় + ঙীপ্ = ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ী + সুপ্ = ভাগিনেয়ী > ভাগিনেয়ী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

অণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

বৈষ্ণব + ঙীপ্ = বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবী + সুপ্ = বৈষ্ণবী > বৈষ্ণবী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

অঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

পৌত্র + ঙীপ্ = পৌত্রী, পৌত্রী + সুপ্ = পৌত্রী > পৌত্রী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

দ্বয়সচ্ (দ্বয়সট্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

গজদ্বয়স + ঙীপ্ = গজদ্বয়সী, গজদ্বয়সী + সুপ্ = গজদ্বয়সী > গজদ্বয়সী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

দঘ্নচ্ (দঘ্নট্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

গজদঘ্ন + ঙীপ্ = গজদঘ্নী, গজদঘ্নী + সুপ্ = গজদঘ্নী > গজদঘ্নী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

মাত্রচ্ (মাত্রট্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

বাঙ্মাত্র + ঙীপ্ = বাঙ্মাত্রী, বাঙ্মাত্রী + সুপ্ = বাঙ্মাত্রী > বাঙ্মাত্রী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

তয়প্ (তয়ট্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

চতুষ্টয় + ঙীপ্ = চতুষ্টয়ী, চতুষ্টয়ী + সুপ্ = চতুষ্টয়ী > চতুষ্টয়ী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ঠক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

ধার্মিক + ঙীপ্ = ধার্মিকী, ধার্মিকী + সুপ্ = ধার্মিকী > ধার্মিকী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ঠঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

বার্ষিক + ঙীপ্ = বার্ষিকী, বার্ষিকী + সুপ্ = বার্ষিকী > বার্ষিকী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

কঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

ঈদৃশ + ঙীপ্ = ঈদৃশী, ঈদৃশী + সুপ্ = ঈদৃশী > ঈদৃশী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

কৃরপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ :

ঈশ্বর + ঙীপ্ = ঈশ্বরী, ঈশ্বরী + সুপ্ = ঈশ্বরী > ঈশ্বরী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

ঙীষ্ (ঈষ্) প্রত্যয় :

১। ষ্ ইৎ যায় এমন সব প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং গৌর প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। ঙীষ্ প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণের লোপ হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২২৮, ৫৩৬) যেমন–

গৌর + ঙীষ্ = গৌরী, গৌরী + সুপ্ = গৌরী > গৌরী (বাংলা রূপ)

সুন্দর + ঙীষ্ = সুন্দরী, সুন্দরী + সুপ্ = সুন্দরী > সুন্দরী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

২। ই-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৩) যেমন–

শ্রেণি + ঙীষ্ = শ্রেণি / শ্রেণী, শ্রেণি / শ্রেণী + সুপ্ = শ্রেণিঃ / শ্রেণী > শ্রেণি / শ্রেণী (বাংলা রূপ)

রাত্রি + ঙীষ্ = রাত্রি / রাত্রী, রাত্রি / রাত্রী + সুপ্ = রাত্রিঃ / রাত্রী > রাত্রি / রাত্রী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, মনুষ্য বাচক ই-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। যেমন–

দাক্ষি + ঙীষ্ = দাক্ষী, দাক্ষী + সুপ্ = দাক্ষী > দাক্ষী (বাংলা রূপ)

৩। গুণ-বাচক উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২২৯) যেমন–

সাধু + ঙীষ্ = সাধু / সাধ্বী, সাধু / সাধ্বী + সুপ্ = সাধুঃ / সাধ্বী > সাধু / সাধ্বী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

৪। জায়া অর্থে জাতিবাচক অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩০) যেমন–

ব্রাহ্মণ + ঙীষ = ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী + সুপ্ = ব্রাহ্মাণী > ব্রাহ্মণী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

৫। জায়া অর্থে ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর আন্ (আনুক্) ও ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : তদেব) যেমন–

ইন্দ্র + আন + ঙীষ্ = ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রণী + সুপ্ = ইন্দ্রাণী > ইন্দ্রণী (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

৬। মাতুল প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে আন্ (আনুক্) ও ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : তদেব) যেমন–

মাতুল + আন + ঙীষ্ = মাতুলানী, মাতুলানী + সুপ্ = মাতুলানী > মাতুলানী (বাংলা রূপ)

৭। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে আন্ (আনুক্) ও ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : তদেব) যেমন–

ক্ষত্রিয় + আন + ঙীষ্ = ক্ষত্রিয়া / ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া / ক্ষত্রিয়াণী + সুপ্ = ক্ষত্রিয়া / ক্ষত্রিয়াণী > ক্ষত্রিয়া / ক্ষত্রিয়াণী (বাংলা রূপ)

আচার্য + আন + ঙীষ্ = আচার্যা / আচার্যানী, আচার্যা / আচার্যানী + সুপ্ = আচার্যা / আচার্যানী > আচার্যা / আচার্যানী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৮। অর্থ-বিশেষে হিম, অরণ্য এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য আন্ (আনুক্) ও ঙীষ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি,

২০১২ : তদেব) যেমন–

হিম + আন্ + ঙীপ্ = হিমানী, হিমানী + সুপ্ = হিমানী > হিমানী (বাংলা রূপ) [অত্যধিক জমান বরফ]

অরণ্য + আন্ + ঙীপ্ = অরণ্যানী, অরণ্যানী + সুপ্ = অরণ্যানী > অরণ্যানী (বাংলা রূপ) [বৃহৎ অরণ্য]

৯। বহুব্রীহি সমাস হলে অবয়ব-বাচক (অংশ-বাচক) প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঙীষ্ হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩১) যেমন–

সুকেশ + ঙীষ্ / টাপ্ = সুকেশী / সুকেশা , সুকেশী / সুকেশা + সুপ্ = সুকেশী / সুকেশা > সুকেশী / সুকেশা (বাংলা রূপ)

চন্দ্রমুখ + ঙীষ্ / টাপ্ = চন্দ্রমখী / চন্দ্রমুখা , চন্দ্রমুখী / চন্দ্রমুখা + সুপ্ = চন্দ্রমুখী / চন্দ্রমুখা > চন্দ্রমুখী / চন্দ্রমুখা (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১০। সংজ্ঞা বুঝালে নখ, মুখ এই দুই অবয়ব-বাচক (অংশ-বাচক) প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীষ্ হয় না, টাপ্ হয়।

আর সংজ্ঞা না বুঝালে ঙীষ্ হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩২) যেমন–

সংজ্ঞা বুঝালে :

শূর্পণখ + টাপ্ = শূর্পণখা, শূর্পণখা + সুপ্ = শূর্পণখা > শূর্পণখা (বাংলা রূপ)

গৌরমুখ + টাপ্ = গৌরমুখা, গৌরমুখা + সুপ্ = গৌরমুখা > গৌরমুখা (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

সংজ্ঞা না বুঝালে :

শূর্পণখ + ঙীষ্ = শূর্পণখী, শূর্পণখী + সুপ্ = শূর্পণখী > শূর্পণখী (বাংলা রূপ)

গৌরমুখ + ঙীষ্ = গৌরমুখী, গৌরমুখী + সুপ্ = গৌরমুখী > গৌরমুখী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

ঊঙ্ (ঊ) প্রত্যয় :

১। ঊ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঊঙ্ প্রত্যয় হয়। ঊঙ্-এর ঙ্ ইৎ যায়, ঊ-কার থাকে। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৩) যেমন–

বন্ধু + ঊঙ্ = বন্ধূ, বন্ধূ + সুপ্ = বন্ধূঃ (স্ত্রী বন্ধু) > বন্ধূ (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

২। রজ্জু প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঊঙ্ প্রত্যয় হয় না। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৩) যেমন–

রজ্জু, রজ্জু + সুপ্ = রজ্জুঃ > রজ্জু (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

৩। তনু প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঊঙ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : তদেব) যেমন–

তনু + ঊঙ্ = তনু / তনূ, তনু / তনূ + সুপ্ = তনুঃ / তনূঃ > তনু / তনূ (বাংলা রূপ)

চঞ্চু + ঊঙ্ = চঞ্চু / চঞ্চূ, চঞ্চু / চঞ্চূ + সুপ্ = চঞ্চুঃ / চঞ্চূঃ > চঞ্চু /চঞ্চূ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় :

১। যুবন্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৩৫) যেমন–

যুবন্ + তি = যবতি, যুবতি + সুপ্ = যুবতিঃ > যুবতি (বাংলা রূপ)

উল্লেখ্য, ক্তিন্ (ক্তি) প্রত্যয় নিষ্পন্ন ই-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঙীপ্ (ঈপ্) হয় না। (পাণিনি, ২০১২ : ১৮৭) যেমন–

√মন্ + ক্তি = মতি, মতি+ সুপ্ = মতিঃ > মতি (বাংলা রূপ)

√ভজ্ + ক্তি = ভক্তি, ভক্তি + সুপ্ = ভক্তিঃ > ভক্তি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

তল্ (তা) প্রত্যয় :

১। তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ২৫৮-২৫৯) যেমন–

জন + তল্ + স্ত্রিয়াং টাপ্ = জনতা, জনতা + সুপ্ = জনতা > জনতা (বাংলা রূপ) প্রভৃতি।

২। দেব শব্দের উত্তর স্বার্থে তল্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি, ২০১২ : ৩৯৬) যেমন–

দেব + তল্ + স্ত্রিয়াং টাপ্ = দেবতা, দেবতা + সুপ্ = দেবতা > দেবতা (বাংলা রূপ)

নি ও মিক্ (মি) প্রত্যয় :

১। নি ও মি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। (ভট্টোজিদীক্ষিত, ২০০৫ : পরিশিষ্ট, ১) যেমন–

নি প্রত্যয়ান্ত শব্দ : √গ্লৈ+ ক্তি = গ্লানি, গ্লানি + সুপ্ = গ্লানিঃ > গ্লানি (বাংলা রূপ)

মি প্রত্যয়ান্ত শব্দ : √ভূ + মিক্ = ভূমি, ভূমি + সুপ্ = ভূমিঃ > ভূমি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

প্রত্যয়বিহীন একাক্ষর বিশিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

সংস্কৃতে প্রত্যয়বিহীন একাক্ষর বিশিষ্ট কিছু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে যেগুলো বাংলা ভাষায় নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয়। (ভট্টোজিদীক্ষিত, ২০০৫ : পরিশিষ্ট, ২) যেমন–

শ্রী, শ্রী + সুপ্ = শ্রীঃ > শ্রী (বাংলা রূপ)

ভূ, ভু+ সুপ্ = ভূঃ > ভূ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এভাবে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যার ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দের গুরুত্ব ও ব্যবহার বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজ আমাদের উভয় ভাষার প্রত্যয় ও প্রত্যয়জাত শব্দ এবং শব্দের সঠিক বানান জানার জন্য প্রত্যয়ের জ্ঞান আবশ্যক।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রত্যয়ের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এটি শুধু উভয় ভাষায় নতুন শব্দ গঠনই করে না শব্দের রূপ পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন, শব্দের বানান শুদ্ধ করা প্রভৃতি কাজ করে। তাই উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যয়ের অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা

ভাষায় প্রত্যয়সহ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের বিচার-বিশ্লেষণে অনেকটা শূন্যতা দেখা যায়। তাই এ শূন্যতা আজ সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে অনেকটা দূর করেছে। সংস্কৃতে প্রত্যয়ের নিয়ম বা সূত্র সুনির্দিষ্ট, কিন্তু সংখ্যায় অনেক। পক্ষান্তরে বাংলায় প্রত্যয়ের নিয়ম স্বল্প এবং সংখ্যায়ও অল্প। তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা প্রত্যয়কে পথ দেখিয়ে চলছে। এ প্রবন্ধটি উভয় ভাষার সকল পাঠক ও গবেষককে গাণিতিকভাবে পথ দেখাবে কীভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় ও প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ করা যায়। আর এজন্য প্রবন্ধে প্রত্যয়ের পূর্বোল্লিখিত নিয়ম বা সূত্র ঠিকভাবে বুঝে বেশি বেশি দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) হাতে-কলমে চর্চা করা প্রয়োজন। এখানে উভয় ভাষার ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ, নিয়ম, দৃষ্টান্তসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটেছে শুধু শব্দের বিভক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলায় সে ব্যতিক্রম মুখ্য নয়। বর্তমানে সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার শব্দগঠনসহ শুদ্ধ বানান লিখনে প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিশেষে বলা যায়, আমরা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রত্যয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উভয় ভাষারই মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবো।

টীকা

১. **পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী :**

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের মধ্যমণি পাণিনি। তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে অনেক মতভেদ লক্ষ করা যায়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম কিংবা তারও বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *'অষ্টাধ্যায়ী'* (অষ্টানাম্ অধ্যায়ানাং সমাহারঃ)। **আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ার কারণে এই নাম। প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থটি সূত্রাকারে নিবদ্ধ। সূত্রের মোট সংখ্যা ৩৯৯৬। মতপার্থক্যে ৩৯৮৩।**

উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে পাণিনির সূত্রগুলো উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর স্ত্রী-প্রত্যয়সম্পর্কীত উদাহরণগুলো সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার স্বনামধন্য ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।
সূত্রগুলোর ব্যবহারক্রম নিম্নরূপ :

i. ক) এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬) [পাণিনি মতে অল্ এর রূপান্তর অপ্ ও অচ্]
খ) ঋদোরপ্ (পা. ৩/৩/৫৭)।

ii. ক) প্রত্যয় ঃ (পা. ৩/১/১)।
খ) পরশ্চ (পা.৩/১/২)।

iii. ক) অজাদ্যতষ্টাপ্ (পা. ৪/১/৪)।
খ) শূদ্রা চামহৎপূর্বা জাতিঃ (বা)।

iv. প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ(পা. ৭/৩/৪৪)।

v. ঋন্নেভ্যো ঙীপ্(পা. ৪/১/৫)।

vi. জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ (পা. ৪/১/৬৩)।

vii. ক) উগিতশ্চ (পা. ৪/১/৬)।
খ) বিদেঃ শতুর্বসুঃ (পা. ৭/১/৩৬)।

viii. ক) জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ (পা. ৪/১/৬৩)।
খ) যোপধপ্রতিষেধে হয়-গবয-মুকয়-মনুষ্য-মৎস্যানামপ্রতিষেধঃ (বা)।

ix. টিড্ঢাণঞ্-দ্বয়সজ্-দঘ্নঞ্মাত্রচ্-তয়প্-ঠক্-ঠঞ্-কঞ্-কুরপঃ (পা. ৪/১/১৫)।

x. ক) ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ(পা. ৪/১/৪১)।
খ) যস্যেতি চ (পা. ৬/৪/১৪৮)।

xi. ক) কৃদিকারাদক্তিনঃ (বা)।
খ) ইতো মনুষ্যজাতেঃ (পা. ৪/১/৬৫)।

xii. বোতো গুণবচনাৎ (পা. ৪/১/৪৪)।

xiii. পুংযোগাদাখ্যায়াম্ (পা. ৪/১/৪৮)।

xiv. ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাচার্যাণামানুক্ (পা. ৪/১/৪৯)।

xv. ক) ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাচার্যাণামানুক্ (পা. ৪/১/৪৯)।
খ) মাতুলোপাধ্যায়য়োরানুগ্বা (বা)।

xvi. ক) ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাচার্যাণামানুক্ (পা. ৪/১/৪৯)।
খ) অর্যক্ষত্রিয়াভ্যাং বা স্বার্থে (বা)।
গ) আচার্যাদণত্বং চ (বা)।

xvii. ক) ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাচার্যাণামানুক্ (পা. ৪/১/৪৯)।
খ) হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্বে (বা)।

xviii. স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জনাদসংযোগোপধাৎ (পা. ৪/১/৫৪)।

xix. নখমুখাৎ সংজ্ঞায়াম্ (পা. ৪/১/৫৭)।

xx. ক) ঊঙুতঃ (পা. ৪/১/৬৬)।
খ) ঊঙাবন্তশ্চ। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন)

xxi. ক) ঊঙুতঃ (পা. ৪/১/৬৬)।
খ) অপ্রাণিজাতেশ্চারজ্জ্বাদীনামিতি বক্তব্যম্ (বা)।

xxii. ক) ঊঙুতঃ (পা. ৪/১/৬৬)।
খ) তস্বাদের্বা ইতি কেচিৎ (বা)।

xxiii. যুনস্তিঃ (পা. ৪/১/৭৭)।

xxiv. ক) স্ত্রিয়াং ক্তিন্ (পা. ৩/৩/৯৪)।
খ) কৃদিকারাদক্তিনঃ (বা)।
গ) ক্তিন্নন্তঃ। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন)

xxv. ক) তস্য সমূহঃ (পা. ৪/২/৩৭)।
খ) গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্ (পা. ৪/২/৪৩)।
গ) তলন্তঃ। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন)

xxvi. ক) দেবাত্তল্ (পা. ৫/৪/২৭)।
খ) তলন্তঃ। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন)

উল্লেখপঞ্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৯৯৯)। *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী*। [সম্পা. আশুতোষ দেব], কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটির (প্রা. লি.)

জ্যোতিভূষণ চাকী (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.

ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭)। *বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*। গোপালগঞ্জ : বেদবাণী প্রকাশনী

প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী (২০০৮)। *পাণিনীয়ম্ A higher Sanskrit Grammar and Composition*। কলিকাতা : দি স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

পাণিনি (২০১২)। *অষ্টাধ্যায়ী*। [সম্পা. অধ্যাপক তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য], কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো

বিশ্বরঞ্জন পণ্ডা (২০১৪)। *প্রত্যয়ঃ*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো

বিশ্বরূপ সাহা (১৯৯৭)। *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ* । কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

ভট্টোজিদীক্ষিত (২০০৫)। *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (বৈদিকপ্রকরণ)* [পরিশিষ্ট, লিঙ্গানুশাসন] [সম্পা. শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ] কলকাতা : সদেশ [উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে পাণিনির লিঙ্গানুশাসন সূত্রগুলো উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে] মিন্যন্তঃ। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন) য়ন্তমেকাক্ষরম্। (পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন)

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০০২)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

মুহম্মদ এনামুল হক (২০০৩)। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

Ashoke kumar Bandyopadhyay, (2004)। *পাণিনীয় Helps to the study of Sanskrit Grammar and Composition* | Kolkata : Sadesh

বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর শিক্ষা বিশ্লেষণ ও তার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ

মুহাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

Abstract : Turkey is known as one of the most liberal, harmonious and tolerant countries in the world. It has the centuries-old tradition to live in peace and harmony with other faith communities during the Ottoman era. However, from the last phases of the Ottoman to modern Turkey, northern (Russian) and western (European) atheistic currents had imported anarchy, radicalization, terrorism and revolt against religion in the name of progress, development and nationalism to Turkey. Given this information, there were some questions raised by the conscious masses of Turkey: what are the causes that instigate the children of Turkey to get involved in radicalization and terrorism? Who are the masterminds of terrorism and radicalization behind the screen? And what are the solutions to terrorism? In this regard, an investigation is attempted to find the causes and their solutions from the *Risale-i Nur* (henceforth, *Risale*) of *Bediuzzaman* Said Nursi (1877-1960). Consequently, readers of this article will get a holistic understanding of the root causes of terrorism and radicalization and their remedies in the light of *Risale*. Furthermore, there are some recommendations to prevent future radicalization and terrorism so that these unexpected incidents will not repeat in anywhere of the world. This research has been accomplished in the context of Turkey. Yet Bangladesh can also be benefited from it as terrorism, anarchy and radicalization are no more territorial or a single country's problems; rather these are considered global problems now. In this research descriptive, analytical and content analysis methods have been employed. The primary and secondary sources of this work are the Qur'an, *Hadith* and *Risale* and related research materials on terrorism and radicalization. Thus, this work will add new understanding and findings of terrorism from multiple dimensions to the body of existing knowledge. Along with other existing policies and findings, this research can be helpful for policymakers, members of parliament, cabinet ministers, journalists, and members of law enforcement units, all detective branches, lawyers and members of the judicial sector of Bangladesh to formulate policies and further preventive measures.

১. ভূমিকা

গোটা মুসলিম বিশ্বে অনেক সমস্যার মধ্যে অশিক্ষা, দরিদ্রতা, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং দুর্নীতিসহ নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদই

* সহকারী অধ্যাপক, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে, ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আজ গোটা বিশ্বের মিডিয়া ও প্রাচ্যবিদগণ প্রচার করছেন যে, মুসলিমগণই দুনিয়ার শান্তি নষ্ট করছে এবং ইসলামই গোটা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষদের একমাত্র সমস্যা। আপাত দৃষ্টিতে কিছু বিপদগামী মুসলিম নামধারীদের কর্মকাণ্ডে ও মিডিয়ার প্রচারণায় পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষদের একাংশের এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, মুসলিমগণই আসলে গোটা বিশ্বের মূল সমস্যা। অথচ কুরআনে বর্ণিত মুসলিমদের চরিত্র, ইতিহাসে বর্ণিত আসহাবে রাসুলদের (রা.) চরিত্র, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ এবং অমুসলিম দেশে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও চরিত্র দেখে অন্য মুসলমানদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে চিনে নিতে পারা সহজ হলেও বর্তমানে বিপদগামী কিছু মুসলিমদের কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপক প্রচার ও প্রপাগান্ডা মুসলিমদের হাজার বছরের সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ উদাহরণের সে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মানুষ আজ ভুলতে বসেছে।

তুরস্কে ৬০০ বছরব্যাপী বিরাজমান ওসমানি খিলাফত মাত্র ৬ বছরের (১৯২৩-১৯২৮) মধ্যে মুস্তাফা কামালের হাতে চূড়ান্তরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুসলিম সালতানাত ফিরিয়ে আনার নামে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের আলিম শেখ সাঈদ (১৮৬৫-১৯২৫) ও তাঁর অনুসারীগণ মোস্তফা কামাল ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেন। শেখ সাঈদ ১৯২৫ সালে সাঈদ নূরসীকে মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান ও প্রয়োজনীয় লোকবল সরবরাহ এবং তার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানানোর জন্য আহবান জানালেও তিনি (নূরসী) সে আহবানে সাড়া দেননি। বরং তিনি তাকে নিবৃত করার জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু শেখ সাঈদ নূরসীর কথা শুনলেন না এবং বিদ্রোহ করে বসলেন। ফলে, শেখ সাঈদসহ তাঁর ৪৭ জন অনুসারী ও তাঁর মতের অনুসারী অনেক আলিমকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়, অনেককে সীমাহীন জুলুম ও অত্যাচার করে হত্যা করা হয়। (নূরসী, ২০১৩, পৃ. ৩৮৩)

সাঈদ নূরসী কুরআনের আলোকে মুসলিমদের সমকালীন সমস্যার সমাধান ও কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। এ খিদমত ও নূরসীর তৎপরতা তৎকালীন সরকার মোটেও ভাল চোখে দেখত না। সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে নিবৃত করার জন্য শত প্রলোভন তিনি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখান করেছিলেন। সরকার আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করে পরবর্তীকালে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি নানাবিধ বাধা, নিপীড়ন ও জুলুম আরোপ করে। তৎকালীন প্রশাসনের কাছে নিরাপরাধ হবার পরও তাঁর ওপরে চাপিয়ে দেয়া জুলুম ও নির্যাতনের বিপরীতে তিনি ধৈয ও নিষ্ঠার একটা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তবু জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি স্বল্প সময়ের জন্যও হলেও নিজে অথবা তাঁর ছাত্রদের কাউকে আইন হাতে উঠিয়ে নিতে দেননি। বরং আইনকে শ্রদ্ধা দেখাতে যেয়ে তাকে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তুরস্কের বিভিন্ন প্রান্তে কারান্তরীণ অথবা নজর বন্দি থাকতে হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি ১৫০০ (নূরসী, ২০১৬খ, পৃ. ৪১০, আলম, ২০০৪, পৃ. ১৪,) বারেরও বেশি তুরস্কের বিভিন্ন কোর্টে হাজিরা দিয়েছেন এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কারো মতে ৯ বার (আলম, ২০০৪, প্রাগুক্ত) বিষ প্রয়োগ করা হলেও তার প্রতিবাদে তিনি কলমের জিহাদ (*মানভী জিহাদ*) এবং আল-কুরআনে বর্ণিত '*সবরুন জামিলের*' অনুশীলন করে গেছেন। সরকার ও কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি কখনো আইন নিজের হাতে তুলে নেননি। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.), আসহাবে রাসুল ও সলফে সালেহীনদের অনুসরণে ধৈর্যের প্রবাদ পুরুষ হিসেবে আধুনিক পৃথিবীর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। উক্ত দিকগুলো বিবেচনায়, বাংলাদেশের জনগণের

জন্য তাঁর জীবনী ও লেখনীতে পর্যাপ্ত রসদ আছে যা ভবিষ্যতের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের আমূল উৎপাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ প্রবন্ধে সাঈদ নূরসীর জীবনী সংক্ষেপে তুলে ধরেছে। তাছাড়াও তৎকালীন তুরস্কে ও আধুনিক বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় শান্তি স্থাপন ও দীর্ঘমেয়াদি সন্ত্রাসবাদ দমনে তাঁর কৌশল ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। আল কুরআনের রেফারেন্সসহ নূরসীর জীবন ও "রিসালায়ে-ই-নূর" এ প্রতিফলিত নূরসীর চিন্তাধারা থেকে সন্ত্রাসবাদের কারণ ও সমাধান আলোচিত হয়েছে। সুতরাং, এ প্রবন্ধ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে:

ক. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী কে এবং "রিসালায়ে-ই-নূর" কী?

খ. তৎকালীন তুরস্কে ও আধুনিক বিশ্বে শান্তি স্থাপনের চালেঞ্জগুলো কী কী?

গ. দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপন ও সন্ত্রাসবাদ দমনে নূরসীর ধারণাগুলো কীভাবে সে চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে?

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক. সাঈদ নূরসী এবং তাঁর রচনা "রিসালায়ে-ই-নূরের" এর পরিচয় দেওয়া;

খ. তৎকালীন তুরস্কে ও আধুনিক বিশ্বে শান্তি স্থাপনের চালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করা;

গ. সে চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য "রিসালায়ে-ই-নূর"-এ বর্ণিত সাঈদ নূরসীর ধারণাগুলো অধ্যয়ন করা।

২. গবেষণার পদ্ধতি

যেহেতু এই গবেষণার প্রকৃতি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক নূরসীর ধারণাগুলো অধ্যয়ন করা, যা কুরআনের বিশেষ রেফারেন্সসহ তাঁর "রিসালায়ে-ই-নূর" নামক রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনামূলক। আল কুরআন ও রিসালায়ে-ই-নূরকে বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিছু অন্যান্য মাধ্যমিক উৎসগুলোও সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন এবং সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. সাঈদ নূরসীর পরিচয়?

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ১৮৭৭ (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ১৭) সালে পূর্ব তুরস্কের 'বিতলিস' প্রদেশের 'নূরস' নামক গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর পিতা-মাতা তার নাম রাখেন সাঈদ। 'বদিউজ্জামান' তাঁর জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির জন্য তাকে তাঁর শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। আর 'নূরসী' তাঁর জন্মস্থান ও গ্রামকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হয়। ছোটবেলায় তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতা-মাতাকে ছেড়ে আশ-পাশের প্রায় সব নামী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণের জন্য ভর্তি হন। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তৎকালীন মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণির দীর্ঘ সিলেবাস ও কারিকুলাম তিনি খুব কম সময়ে রপ্ত করেছেন। ফলে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বেশী দিন নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর মেধা ও ধীশক্তি ছিল খুবই

প্রখর। তিনি মাত্র ১৪ দিনে কুরআন মুখস্ত করেন এবং তৎকালীন মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কঠিন কঠিন ৯০ টিরও বেশি প্রাচীন পুস্তক মুখস্ত করতে সক্ষম হন।(নূরসী, ২০০৩, পৃষ্ঠা. ৫২) ১৮৯২ সালে তাঁর অসাধারণ মেধার জন্য তার শিক্ষক 'সিরিতের' মোল্লা ফতেহুল্লাহ এফেন্দি তাকে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর *'বদিউজ্জামান'* (কালের বিস্ময়) উপাধিতে ভূষিত করেন। (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ২৭) তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা, দারুল হিকমাহতে বিশেষজ্ঞ আলিম এবং কলম যোদ্ধা। কিন্তু হঠাৎ করে একটি ঘটনা তাঁর ব্যক্তি জীবনের বাঁক বদলে দেয়। ১৮৮২ সালে যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী লর্ড গ্লাডস্টোন ব্রিটিশ সাধারণ পরিষদে ঘোষণা দেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল কুরআন মুসলিমদের হাতে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব মুছে দেয়া বা এর থেকে মুসলিমদের সম্পর্কচ্ছেদ ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই।" (নূরসী, ২০১৬খ, পৃ. ৪৮৮, ওয়াহিদা, ২০০৫, পৃ. ২৭) এর সাথে যোগ হয় মুস্তাফা কামালের শাসন ও তুরস্কের আভ্যন্তরীন নোংরা রাজনীতি। খেলাফতের শেষ অধ্যায় তৎকালীন মুসলিমদের মনে এক ভয়াবহ কাপুরুষতা ও ইমানহীনতার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। ১৯২২-১৯২৪ সালের মাঝে মোস্তফা কামাল ইসলামের সকল প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রবিন্দু ও অনুপ্রেরণার সকল উৎসকে বন্ধ করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে নূরসী সিদ্ধান্ত নেন যে, "আমি আমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করব যে আল কুরআন একটি সূর্য, কেউ এটাকে নিভিয়ে ফেলতে পারবে না। (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ৪৬) সে থেকেই তিনি 'নতুন সাঈদ' রূপে আর্বিভূত হলেন এবং ৩০ বছরের সীমাহীন জেল-জুলুম-নির্যাতন ও বহুবার বিষ প্রয়োগ সত্ত্বেও বিশ্ববাসির জন্য রচনা করলেন 'রিসালায়ে নূর' সমগ্র। (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ১০)

৪. সন্ত্রাস এর সংজ্ঞা

বর্তমান মতবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ একপ্রকার অসম্ভবই বটে। কারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা যে কোনো বিষয় বা মতবাদের সংজ্ঞার ভিন্নতাও নির্দেশ করে। তাই তো দেখা যায়, এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে যে কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসের মতো নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কর্ম বলে বিবেচিত হয়, অপর গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সে কর্মকাণ্ডই স্বাধীনতা কিংবা স্বাধিকার আদায় সংগ্রামের মতো মহৎ ও প্রশংসনীয় কর্ম। সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে বিতর্ক থাকলেও বক্ষ্যমাণ আলোচনার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে সন্ত্রাসের একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় নির্ধারণ আবশ্যক। সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ উদ্ভূত। যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা। (হক ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩) কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি। (হক ও অন্যান্য (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩)। ভীতিজনক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ। (আহমদ, ২০০৮, পৃ. ২৬২)

৫. সন্ত্রাসবাদ নিরসনে নূরসীর লেখনি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের হেফাজাতের নামে তিনি কোন ধরনের সহিংস পদক্ষেপ নিজে গ্রহণ করেননি, ছাত্রদেরকে গ্রহণ করতে বলেননি এবং কাউকে করতে দেখলে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন: খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুসলিম সালতানাত ফিরিয়ে আনার নামে পালাওয়ের শেখ সাঈদ (১৮৬৫-১৯২৫) ও তাঁর অনুসারীগণ তুরস্কের তৎকালীন শাসক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেয়। শেখ সাঈদ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে নূরসীকে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহবান ও প্রয়োজনীয়

লোকবল সরবরাহ এবং তার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানানোর জন্য আহবান জানালে তিনি সে আহবানে সাড়া দেননি। বরং তিনি তাকে নিবৃত করার জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু শেখ সাঈদ নূরসীর কথা শুনলেন না বরং বিদ্রোহ করে বসলেন। ফলে সরকার মাত্র দু'মাসের মধ্যেই শেখ সাঈদসহ ৪৭ বিদ্রোহী ও তাঁর মতের অনুসারী অনেক আলিমকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং অনেককে জুলুম ও অত্যাচার করে হত্যা করা হয়।

নূরসীর শিক্ষা ও তাঁর লেখনি রাজনৈতিক ইসলাম (political Islam) এবং সহিংস আন্দোলনের বিরোধী। তাঁর শিক্ষা ও লেখনি কুরআন, হাদীস ও রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং আসহাবে রাসুল (রা.) জীবন ধারারই আধুনিকতম পরিবেশনা মাত্র। সমাজ সংস্কার ও সংশোধনে নূরসী রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত নিম্ন থেকে উর্ধমূখী (down to top) সংস্কার নীতি অবলম্বন করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর যে কোনো মুসলিম দেশ ও ইসলামী সংগঠন নূরসীর প্রচারিত শিক্ষা ও আন্দোলনকে তাদের দেশের ও সংগঠনের জন্য আদর্শ মনে করতে পারে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটে তাঁর লেখনি আমাদের সমাজকে ঈমানের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে ও সমাজ থেকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস, ভিন্নমত ও পথের প্রতি বৈষম্য ও ঘৃণা এবং সব ধরণের বিশৃংখলা দূর করবে এবং সমাজকে আবারো সম্প্রীতি ও সহনশীলতার সমাজে পরিণত করবে।

৬. সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নূরসী

৬.১. মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়

সাঈদ নূরসী কখনোই শেখ সাঈদের অনুসারী কিংবা সহমতের ছিলেন না। তিনি প্রাথমিকভাবে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের সমর্থক ছিলেন যতদিন না নূরসী তাঁর ভেতরের চরিত্র দেখতে পেয়েছেন। তিনি মুস্তাফা কামালের ইসলাম বিরোধী ও পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেজন্য তিনি সরাসরি আতাতুর্ককে বুঝানো, সতর্ক করা, এবং এহেন ধ্বংসাত্নক কর্মনীতি পরিহারের আহবান জানান। সে জন্য অনেকে তাঁকে আতাতুর্কের সমালোচক ও বিরোধী হিসেবে জানেন। এ হেন প্রেক্ষাপটে শেখ সাঈদের বিদ্রোহ হয়ত সাঈদ নূরসীর প্রকাশ্য সমর্থন থাকলে সরকারের জন্য একটি বড় ধরনের বিপদ এমনকি সরকার ক্ষমতা ছাড়তেও বাধ্য হতেন। সে বিশ্বাসে হয়ত শেখ সাঈদ নূরসীর কাছে তাঁর এ বিদ্রোহ সমর্থনের ও প্রয়োজনীয় লোকবলের সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। নূরসী তখন কারাগারের অন্তরীণে রিসালায়ে নূর লেখার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস শেখ সাঈদের বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য নূরসীকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে।

সাঈদ নূরসীর জবানীতে শুনুন, "আমি ভ্যানে থাকা অবস্থায়, আমার কাছে কিছু সংখ্যক ধার্মিক, আল্লাহ ভীরু লোক আসলেন। তারা আমাকে বললেন, "কিছু সংখ্যক সেনা কমান্ডার ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমাদের সাথে আসে এবং যোগদান কর, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি।" আমি তাদেরকে বললাম, "এমন কিছু খারাপ কাজ এবং অধর্ম তাদের মত কিছু কমান্ডারের কাজ; গোটা আর্মি এগুলোর জন্য দায়ী নয়। ওসমানী সেনাবাহিনীতে সম্ভবত লক্ষ লক্ষ দরবেশ আছে; আমি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করতে পারব না। আমি তোমাদের সাথে (বিদ্রোহে) যোগদান করব না।" তারা আমাকে ত্যাগ তরবারী উন্মুক্ত করে চলে গেল এবং পরবর্তিকালে বিতলিসের **'অসার ঘটনা'** ঘটে গেল।(নূরসী, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ৩৮৩)

নূরসীও ছিলেন শেখ সাঈদের মতো এক জন কুর্দিশ বংশোদ্ভূত আলিম। অনেকে তাকে কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে জানেন। নূরসী ওসমানি খিলাফতের শেষ বছরগুলো অভিজ্ঞতা করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষিতদের বড় একটি অংশ বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে এসে ইসলাম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ, সংশয় এবং অনেক ভুল ধারণা প্রকাশ ও প্রচার করছে। তাদের মতে ইসলাম সেকেলে এবং বিজ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায়। যার ফলে যুবসমাজ ও যুবমানসে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সুদুরপ্রসারী সমস্যা সমাধান কল্পে নূরসী দ্বিতীয় সুলতান আব্দুল হামিদকে 'মাদরাসাতুজ্জাহরা' স্থাপনের অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান নূরসীকে 'মাদরাসাতুজ্জাহরার' প্রস্তাবের কারণে পাগল সাব্যস্ত করেন এবং তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এ ঘটনায় নূরসী ক্ষিপ্ত হন ও অনেক কষ্ট পান। তবু তিনি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি এমনকি লেখালেখি পর্যন্ত করেননি বরং সবর করেছেন। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে পরবর্তী সুলতানদের কাছে তার প্রস্তাবনা 'মাদরাসাতুজ্জাহরার' পেশ করেছেন।

৬.২. অমুসলিমদের প্রতি কোনো হামলা নয়; বরং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

নূরসী একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণ সমাজের জন্য আহ্বান জানান, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিতে পাশাপাশি বসবাস করবে। মুসলিম রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কোনো মুসলিম নাগরিক অমুসলিমদের প্রতি তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক কোনো ব্যাবহার ও আচরন প্রদর্শন করতে পারবে না। নূরসী শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিম ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে। অমুসলিমদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচরণের কারণে তাদের উপর কোনো কঠোরতা ও বাধ্যবাধকতা নেই। যদি তারা ইসলামি রাষ্ট্র এবং এর নিয়মের প্রতি অনুগত থাকে, তাহলে তারা নিরাপদ থাকবে এবং কেউ তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। নূরসী বলেন,

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে, যুদ্ধে একজন অবিশ্বাসীর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। যদি দেশের বাইরে থাকে এবং সে শান্তি স্থাপন করে, অথবা যদি দেশের অভ্যন্তরে থাকে এবং প্রধান কর প্রদান করে, তাহলে তার জীবন ইসলাম অনুযায়ী সুরক্ষিত। কিন্তু একজন ধর্মত্যাগীর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কারণ তার বিবেক কলুষিত হয় এবং সে সমাজ জীবনে বিষের মত হয়ে যায়। কিন্তু একজন খ্রিস্টান এখনও সমাজে অবদান রাখতে পারেন, এমনকি যদি তিনি ধর্মহীন হন। তিনি কিছু পবিত্র বিষয় গ্রহণ করতে পারেন এবং কিছু নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেন এবং কিছু ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে সম্মতি দিতে পারেন। (নূরসী, ২০১৪, পৃ. ৫১২)

৬.৩. ইসলামের প্রকৃত শত্রু কারা?

নূরসীর মৌলিক তত্ত্ব ও সারা জীবনের অনুশীন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ঢালাওভাবে সকল অমুসলিমদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেননি। তিনি মুসলিমদের তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমগণ তারা তাদের দ্বীনের জ্ঞানহারা হবার কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যা সাধারণত শত্রু পক্ষ করে থাকে। নূরসী বলেন, "অশিক্ষা, দরিদ্রতা, এবং কলহ মুসলিমদের শত্রু।" তিনি আরো বলেন,

এই ইউনিয়নের পথ হল প্রেম; এর শত্রুতা কেবল অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং কলহের জন্য। অমুসলিমদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে এই ইউনিয়ন শুধু সেই তিনটি ঘটনাকে আক্রমণ করে। অমুসলিমদের প্রতি আমাদের ক্রিয়াকলাপ শুধু প্ররোচনা দ্বারা গঠিত, কারণ আমরা জানি তারা সভ্য। এবং আমরা তাদের ন্যায্য মনের অধিকারী মনে করি, তাই আমাদের দেখানো উচিত যে ইসলাম প্রেমময় এবং উন্নত। শিথিল এবং অবহেলিতদের জানা উচিত যে তারা ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ইউরোপীয়দের সাথে নিজেদের অকৃতজ্ঞ করতে পারে না, কারণ তারা কেবল দেখায় যে তারা নীতিহীন। এবং কেউ নীতিহীনতা এবং নৈরাজ্য পছন্দ করে না। যারা যথাযথ তদন্তের পর এই ইউনিয়নে যোগদান করবে, তারা এই ধরনের লোকদের অন্ধভাবে অনুকরণ করে ছেড়ে যাবে না। আমরা জনমতকে মুহাম্মদান ইউনিয়নের ধারণা, উপায় এবং বাস্তবতা উপস্থাপন করি, যা ইসলামী ঐক্য। যদি কারও কোন আপত্তি থাকে, তবে সে তাদের কথা বলুক; আমরা তাদের উত্তর দিতে প্রস্তুত। (নূরসী, ২০১০, পৃষ্ঠা. ৮১)

৬.৪. নূরসীর বিরুদ্ধে মামলা ও 'সবরুন জামীলে'র উদাহরণ

তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার নূরসীর জনপ্রিয়তা ও দেশাত্ববোধ দেখে তাঁকে রাজনীতিতে ব্যাবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২১ সালে তিনি সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর প্রতি উদাসীনতা দেখে রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে বিতলিসে চলে যান। সরকার তাকে রাজনীতির জন্য ব্যাবহার করতে না পেরে একের পর এক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মামলা দিতে থাকেন এবং নূরসী ও তাঁর ছাত্রদের ধরপাকড়সহ নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকেন। বলতে গেলে মোস্তফা কামালের গোটা সময়টাতে নূরসীকে এক জেল থেকে অন্য জেলে কাটাতে হয়েছে। মুস্তাফা কামালের সময়ে (১৯২৩-১৯৩৯) নূরসীর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখের কাছাকাছি ছিল। চাইলে নূরসী পালাওয়ের শেখ সাঈদের মতো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নূরসী যদি শেখ সাঈদের মতো বিদ্রোহ করতেন তবে সরকারের পক্ষে সে পরিস্থিতি সামাল দেয়া খুবই দুরুহ হয়ে পড়ত। এহেন পরিস্থিতিতে নূরসী ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে কোনো ধরনের সংঘাতের পথে না যেয়ে বরং 'সবরুন জামীলে'র উদাহরণ হিসেবে নিজেকে এবং তাঁর ছাত্রদেরকে পেশ করেছেন।

৬.৫. প্রকৃত ঈমানদার কখনো সন্ত্রাস করতে পারে না

প্রকৃত ঈমানদার কখনো সন্ত্রাস করতে পারে না। কারণ তিনি জানের প্রতিটি মানুষ তারই মতো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলআমীনেরই সৃষ্ট। বিনা অপরাধে কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (আল কুরআন, ৫:৩২) সন্ত্রাসী মুসলিম নয়, বরং সে তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুসলিম সাজে। নূরসী বলেন,

"কোনও সত্য মুসলমান কখনোই ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে উঠতে পারে না। সর্বাধিক এ, তারা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম হারান এবং অরাজকতাবাদী হয়ে ওঠে। শিক্ষা ও বিচার মন্ত্রীদের মতো ঈশ্বর ইচ্ছুক, সরকারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবেন। ডান ও বাম ধারার পরিবর্তে, তারা কুরআন ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করবে এবং দেশকে পরম অবিশ্বাস, অরাজকতা, নাস্তিকতা এবং তাদের ভয়ংকর ধ্বংস থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আমরা আমাদের সমগ্র জীবন এবং আত্মা দ্বারা ঐশ্বরিক রহমত থেকে এই প্রয়াস, এবং এটি জন্য আশা করি।"(নূরসী, ২০১৬খ, পৃ. ৩৩৯)

৬.৬. আইন শৃংখলা নিয়ে সাঈদ নুরসীর বক্তব্যে

৬.৬.১. জাহাজে একজন অসৎ অথবা পাপী মানুষের কারণে পুরো জাহাজকে ধ্বংস না করা

মানব সমাজ শুধু ভাল মানুষদের নিয়ে তৈরি হয় না। সেখানে কিছু খারাপ, অসৎ ও ভয়ংকর মানুষও থাকতে পারে। সবার উপস্থিতিতে আমাদের এ সমাজ। সমাজে এক বা একাধিক খারাপ মানুষের কারণে গোটা সমাজকে ধ্বংস করে দেয়া কোন ভাবেই ন্যায় সঙ্গত ও ন্যায় বিচার হতে পারে না। কারণ, সাধারণত: একটা সমাজে খারাপ মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য হয়ে থাকে। নূরসী চমৎকার একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। তিনি এ সমাজকে একটি জাহাজের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্কৃতিকারীকে শায়েস্তা করতে যেয়ে যদি আমরা সমাজ নামক জাহাজটাকে ডুবিয়ে ফেলি তাহলে এ জাহাজরূপী সমাজে বাসরত অন্যান্য নিরীহ মানুষেরও সলীল সমাধি হতে বাধ্য। (নূরসী, ২০১৪, পৃ. ৩০৭; ২০১৬খ, পৃ. ৪২৭, ৪৪০)

৬.৬.২. *'মুসবেতে হারাকাতের'* (ইতিবাচক আন্দোলন)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার পর্যালোচনা এবং অনুসারীদের জন্য নূরসী একটি চিঠি লেখেন। যা মুসবেত হারাকাত (ইতিবাচক আন্দোলন) হিসেবে পরিচিত। এ চিঠিতে নূরসী রাশিয়ান সেনাপতির সাথে তাঁর আচরণের পর্যালোচনা করেন এবং এক অর্থে অনুতপ্ত হন। মুসবেত হারাকেত বলতে, "আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বাজায় রেখে বিশ্বাসের খেদমত করাকে ইতিবাচক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।"(নূরসী, ২০১৬খ, পৃ. ৫০৭, ৫১০; ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ৩৪৮, ৩৬৯, ৩৮৬, ৪০১) এ আন্দোলনের লক্ষ্য হলো গঠন মূলক, ক্ষতি কাটিয়ে উঠা, এবং ভবিষ্যতে ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

৬.৬.৩. সেনা অভ্যুত্থান রুখে দেয়া

১৯০৯ সালের ১৩ এপ্রিল সেনা বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে নূরসীকে সামরিক আদালতের ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। (আস-সালিহী, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৩১) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি সেনাবহিনীকে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছেন। যদিও তিনি কঠিন প্রচেষ্টায় সেনাদেরকে তাদের ছাউনিতে ফিরে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন। তার ভূমিকা ছিল শান্তিপূর্ণ। তিনি সেনাদেরকে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতে। সামরিক আদালত তাকে অনেক জেরা করার পর বেকসুর খালাস দেয়। (আস-সালিহী, ২০১৫, পৃ. ৩৩) উল্লেখ্য, একই আদালত অন্য দশজনকে ফাঁসির রায় দিয়েছিল।

৬.৬.৪. ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মিদের অধিকার ও নিরাপত্তা

৬.৬.৪.১. সাধারণ অবস্থায়

সাধারণ অবস্থায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যেমন অন্যান্য মুসলিমদের উক্ত রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে অধিকার রয়েছে। জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে একজন অমুসলিম তিনি এবং তাঁর গোটা পরিবার মুসলিম রাষ্ট্রে জান ও মালের নিরাপত্তা উপভোগের পাশাপাশি স্বাধীন মত প্রকাশ ও ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করে থাকে। নূরসী বলেন, "জিম্মিকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে জিম্মিকে কষ্ট দেয় সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না"। (নূরসী, ২০০৭, পৃ. ১০২)

৬.৬.৪.২. যুদ্ধাবস্থায়

যুদ্ধাবস্থায় সাধারণত সকল প্রকার মানবিক ও মৌলিক অধিকারসমূহ লংঘিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাত ও দ্বন্দ্বে অগণিত বনি আদম প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম যুদ্ধের মতো অস্বাভাবিক ও জরুরি অবস্থায়ও মানুষের মানবিক ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। নূরসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিজে ৫০০০ কমান্ডো বাহিনীর প্রধান হিসেবে যুদ্ধে আটক নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে রাশিয়ার সীমান্ত পার করে দিয়ে অনন্য এক নজির স্থাপন করেছিলেন। (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃ. ১৩৫) ইচ্ছে করলে তিনি প্রত্যেক যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করতে পারতেন।

৭. বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

ইসলাম আল্লাহ ভীতির যে চর্চা করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিল তা আজ মুসলিম জীবন থেকে প্রায় বিদায়ের পথে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ বিমুখ হয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে ফেরাউনি কায়দায় আজব শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার মুসলিম শাসকগণ আজ তাদের গদি রক্ষার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে পশ্চিমা বিশ্বের সন্তুষ্টির জন্য হীন থেকে হীনতর সব কিছু করছে। গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও দলাদলির কালো মেঘে আচ্ছন্ন।

৭.১. আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কখনও নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবে না। যখন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা মানুষকে সিসিটিভি ও পুলিশের ভয়ে আইন মানতে অভ্যস্ত করে তোলে সেখানে নৈতিক অনুশাসন একেবারে শূন্যের ঘরে। একটু নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে সেখানে সংঘটিত হয় অকল্পনীয় সব ভয়ানক অপরাধ। অথচ একজন বিশ্বাসী সে জানে যে, দুনিয়ার কোন পুলিশ বা কোন শক্তি, যন্ত্র বা সিস্টেম তাঁর অপরাধ সংঘটনের তথ্য সংরক্ষণ করছেনা ঠিকই; কিন্তু তাঁর স্রষ্টা ঠিকই দেখছেন, তিনি দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে সে তথ্যগুলো রেকর্ডও করছেন এবং সেগুলোর হিসেবের জন্য অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আখেরাত। সে দিন প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের হিসেব হবে। নূরসীর মতে, "উত্তর (রাশিয়া) থেকে নাস্তিকতার ধারা এসেছে যা ধ্বংসাত্মকভাবে নৈরাজ্যকে (সন্ত্রাস) উৎসাহিত করছে।"(নূরসী, ২০১৬ক, পৃ. ২৩০) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কেউ আল্লাহর অপছন্দের কোনো কাজ করতে পারেনা। কেবল আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসীই নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও হানাহানিতে লিপ্ত হতে পারে।

৭.২. আখেরাতে অবিশ্বাস

নূরসী বিশ্বাস করতেন যে আখেরাতে বিশ্বাস মানুষের মূল চালিকা শক্তি। যদি কোনোভাবেই সে বিশ্বাস লোপ পায় তবে মানুষকে দিয়ে সব কিছু করারো সম্ভব। আখেরাতে অবিশ্বাসীই কেবল সন্ত্রাসী হতে পারে। নূরসী বলেন,

> গ্রাম ও শহর এমনকি গোটা দেশ অচিরেই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রতিটি পরিবার, গ্রাম ও শহর এমনকি গোটা দেশে যদি আখিরাতে জবাবদিহিতে বিশ্বাস না থাকে, তবে সেই বড় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মিথ্যা প্রচার, স্বার্থপরতা, কৃত্রিমতা, ভন্ডামি, ঘুষ এবং প্রতারণা বাসা বাঁধবে এবং এগুলো, আন্তরিকতা, সততা, উদ্যোগ, আত্মবলিদান, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং

> আখেরাতের পুরস্কার চাওয়া, যা ভাল আচরণ এবং নৈতিকতার ভিত্তি স্থান অধিকার করে বসবে। ফলে শহরের অশান্তি এবং বর্বরতা, বিষাক্ত আদেশ এবং মানবতার অধীনে পরিচালিত হবে, শহর জীবন বিষাক্ত হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করবে, যুবকেরা মদ পান করবে, ক্ষমতাবানেরা জোরপূর্বক অত্যাচার করবে এবং বয়স্করা কাঁদতে শুরু করবে। (নূরসী, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ২৪৬-২৪৭)

৭.৩. ধর্মীয় বহুত্ববাদে অবিশ্বাস

এ সব সন্ত্রাসীদেরকে শেখানো হয় যে, এ জমীন আল্লাহর এবং এখানে শুধুই তারই আইন চলবে। (আল কুরআন, ৬: ৫৭) এখানে কোনো ভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকতে পারবে না। তাদেরকে শেখানো হয় যে, এ দুনিয়া শুধু আল্লাহর মনোনীত বান্দাহ তথা মুসলিমদের বসবাসের জন্য আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এখানে অন্য কারে হুকুম চলবে না। সুতরাং যারা আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিবর্তে ব্রিটিশ বা অন্য কারো আইনের শাসন বাস্তবায়ন করছে তারা ইসলামের শত্রু। ঠিক এমনই মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে হিন্দু বিচারকদের প্রতি জেএমবির হামলাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

৭.৪. দরিদ্রতা

ইসলাম তো এসেছিল সমাজে ধনী-গরিবের ব্যাবধান ঘুচিয়ে একটি সাম্য ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে। সে সমাজে সুদের মত অর্থনৈতিক কোন জুলুম থাকবে না প্রয়োজনে মানুষকে '*করজে হাসানাহ*' দিয়ে তাকে তাঁর প্রয়োজন মিটাতে পাশে এসে দাঁড়াবে। মহানবী (সা.) ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী সাহাবীগণ পৃথিবীর বুকে এমন একটি সমাজ উপহার দিয়েছিলেন যে, সেখানে জাকাত নেবার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। জাকাত দাতা খুঁজে ফিরতেন সম্ভাব্য জাকাত প্রার্থীকে। এমন সমাজে প্রথমে আব্বাসীগণ সীমিত অর্থে তথাকথিত জাতীয়তাবাদ চর্চা শুরুর অব্যবহিত পর থেকে মুসলিম দুনিয়ার বুক থেকে 'মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই' এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদায় হওয়া শুরু হল। বাড়ল শত্রুতা, ঘৃণা এবং দলাদলি। অথচ বর্তমানে মুসলিমগণই পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যাগ্রস্ত এবং তাদেরই পরস্পরকে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত প্রকৃত জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের কে আজব একটি জাতিতে পরিণত করে দিল। তারা তাদের অন্য মুসলিম ভাইদের কাছে হয়ে গেল অপরিচিতের মতো এবং নিজেরাও তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয় বর্তমানের মধ্য প্রচ্যের দিকে তাকালে আমরা তাদের কে দেখি যে একে অপরে তারা তাদের জানের দুশমনে পরিণত হয়েছে। নিজেদের খেয়াল-খুশিকে বিজয়ী করতে যেয়ে তারা ভয়াবহ রকমের ভূমিকা গ্রহণ করছে। সে কারণে মুসলিম আজ মুসলিমকে ভাই হিসেবে তার দুরাবস্থায় পাশে না দাঁড়িয়ে এমন ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে যার ফলে লক্ষ লক্ষ বনি আদম ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, দরিদ্রতায় এবং রোগে ভূগে আল্লাহর দরবারে হাজির হচ্ছে। (নূরসী, ২০১৪, পৃষ্ঠা. ৩৭৩-৩৭৪) আমাদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে এ পথে যুক্ত হয়েছেন। যদিও এ পথে জীবনের অনেক ঝুকি আছে, তবু অনেকেই ইচ্ছে করে, কেউ নিরুপায় হয়ে, আবার কেউ অনিচ্ছায় এ পথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

৭.৫. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

এখানে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কথা বুঝানো হয়নি। এখানে মূলত দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষার উপস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ যদি কারো দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা না থাকে, তাহলে যে কেউ যে কোনো সময়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে কোনটি ঠিক সেটি পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখে না, সেজন্য সে কোনো নামধারী কোন বড় আলেমের (?) দ্বারা বা যে কারো দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে নূরসী বলেন,

> ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত, পরম নিরপরাধবিষয়ক এবং পরম ঘুষের মাধ্যমে মুসলমানদের শাসন করা যাবে না। বর্তমান পর্যন্ত যে কোন মুসলমান কখনও ভাল খ্রিস্টান বা ইহুদি হয়ে ওঠে না, বরং তারা ধর্মবিরোধী ও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; তাই একজন মুসলিম কমিউনিস্ট হতে পারে না; তিনি একটি অরাজকতা মধ্যে পরিণত এবং পরম নিন্দাবিধান ছাড়া অন্য কিছুই দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। (নূরসী, ২০১৩, পৃ. ৫১৩)

৭.৬. শত্রুদের মুসলিম যুবসমাজ ও দেশকে টার্গেট বানানো

সাঈদ নূরসী পর্যবেক্ষণ করেন যে ইউরোপ ও রাশিয়া অনেক সময় ওসমানী খেলাফতের মধ্যে বাসরত অমুসলিমদেরকে অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিত এবং তাদেরকে স্বধীন একটি রাষ্ট্র দেবার ও প্রতিশ্রুতি দিত। যার ফলে, আরমোনিয়ানগণ সন্ত্রাসবাদ, গুপ্তহত্যা ও গণহত্যার মতো ভয়াবহ দেশদ্রোহী কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে নূরসী বলেন,

> অতীতেও ব্রিটিশ কর্তৃক ওসমানিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে আরমেনিয়ানদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কে দেবার মতো ঘটনা ঘটেছে। তারা প্রচারণার জন্য প্রাথমিকভাবে সন্ত্রাসবাদ ও গণহত্যাকে বেছে নিয়েছিল। তাদের টার্গেট ছিল এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদেরকে সৎ ও নিষ্পাপ প্রমাণ করা এবং এর মাধ্যমে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইউরোপের আর্শীবাদ প্রাপ্তি ও পূর্ব আনাতোলিয়াতে আর্মেনি রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন প্রবল ছিল এবং আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তারা এ কাজে রাশিয়া ও ব্রিটেনকে সম্পৃক্ত করার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। (ওয়াহিদা, ২০১০, পৃষ্ঠা. ১০৭)

নূরসী আরো বলেন, "এমনকি রাশিয়া আর্মেনিয়ানদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র, এবং নৈতিক সমর্থন দিয়ে ওসমানিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছিল।"(ওয়াহিদা, ২০১০, পৃষ্ঠা. ১২৮) যাতে করে তুর্কি খেলাফত মুখ থুবড়ে পড়ে এবং নানা ভাবে খেলাফতকে ভেঙ্গে দুর্বল করে ফেলা যায়।

৭.৭. ইসলামি বাস্তবতাকে গ্রহণে দুর্বলতা অসমর্থতা

নূরসী তাঁর খুতবায়ে শামিয়ায় জাপানী সেনাপতির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আর এ ঘটনা আমাদের এও দেখিয়ে দেয় যে, যদি আমরা নিজেদের দুর্বলতার কারণে এই বাস্তবতা (ইসলামকে) যথাযথ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের ভাগ্যে ভবিষ্যতে অনেক নির্মমতা, পশ্চাদপদতাসহ নানা প্রকার অপমান-অপদস্থতা অপেক্ষমাণ। কারণ, ইসলামের বাস্তবতা না বোঝার কারণে আমাদের বিপর্যয় অনিবার্য। (নূরসী, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৩৬)

ইসলাম শান্তির ধর্ম হলেও মুসলিম বিশ্বে কেন অশান্তি এবং অশান্তির এ বিশ্বে ইসলাম কেন শান্তি আনতে পারছে না? নূরসী এ অশান্তির কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। নূরসীর মতে, "... ইতিহাস আমাদের এটিও দেখিয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক ইসলামি বাস্তবতাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ দুর্বলতা থাকবে, সে পরিমান ভয়ভীতি, পশ্চাদগামীতা ও বিলুপ্তি এবং বিলীনতা তাদের পেয়ে বসবে এবং তারা নিপতিত হবে ফেতনা-ফাসাদ, মারামারি, হানাহানি ও বিভিন্ন বিশৃংখলা এবং অশান্তির মধ্যে। আর তারা পরাজিত হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে।"(নূরসী, ২০১৫, পৃ. ৩৭)

৮. সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়

৮.১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সে কুরআন ও হাদীসের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ কে মান্য করার চেষ্টা করবে। যদি সে তাঁর বিশ্বাস মতে কাজ করতে নাও পারে, তবে সে অন্তত কুরআন ও হাদীসের বিধানাবলির বিরেধিতা করবে না। সে দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করবে এবং মান্য করবে যে, মানুষকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হানাহানি করার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাগণ এক প্রকার আপত্তির সূরে আল্লাহকে বলেছিলেন যে, মানুষ সৃষ্টি করলে তারা পৃথিবীতে রক্তপাত ও ফাসাদ (নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস) সৃষ্টি করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। মানুষকে আল্লাহ তাঁর খলিফা হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। (আল কুরআন, ২:৩০) যারা হবে পৃথিবীতে শান্তির বার্তাবাহক।

৮.২. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অনিবার্য ও চুড়ান্ত পরিণাম হল আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। আখেরাতে বিশ্বাসী সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে মানুষের প্রতিটি কর্মকান্ডের সূক্ষ্ম ও সুচারুরূপে রেকর্ড করে রাখছেন। (আল কুরআন, ৫০:১৬-১৮,৮২: ১০-১২) উক্ত দু'জন ফেরেশতা নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আমৃত্যু মানুষের সকল কর্মকাণ্ড এভাবে রেকর্ড হতে থাকে। কেবল আখেরাতে জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস মানুষকে সকল নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, হানাহানির মতো সকল মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আখেরাতে অবিশ্বাসীই কেবল সন্ত্রাসী হতে পারে।

৮.৩. রিসালায়ে নূর পঠন ও পাঠন

নূরসীর কাছে কেউ দেখা করতে গেলে তিনি তাকে রিসালায়ে নূর পড়তে বলতেন। তিনি নিজের চোখে এ পুস্তকের প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে তুর্কি যুবকেরা কীভাবে তাদের জীবন রিসালায়ে নূরের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছেন। তিনি বলেন, "রিসালায়ে-ই নূর আল কুরআনের মু'জিজাকে সংরক্ষণ করে। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাসকে হেফাজত করেছে। তাই এ রিসালায়ে-ই নূর অরাজকতা থেকে মানবতাকে রক্ষা করেছে। এ পুস্তক তুর্কি ও আরবদের দু'টি বীর জাতিকে একত্র করার এবং এই কোরআনের আইন-কানুনকে উৎসাহিত করার উপায়। (নূরসী, ২০১৬ক, পৃ. ২৪৩)

৮.৪. আল কুরআনের সত্য সন্ত্রাসের প্রতিশেধক

আল কুরআন মানুষের কোনো কথা নয়। এটি মহান রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তাঁরই বাণী সমগ্র। মানবতাকে সত্য ও সরল পথ দেখানের জন্য আল্লাহ পাক আল কুরআন নাযিল করেছেন। (আল কুরআন, ২:৩৮) আল কুরআনে সব ধরনের নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, হানাহানি কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সে জন্য নূরসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, নৈরাজ্য ও সবধরণের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কুরআনে সত্য ও শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল বিলোপ করা সম্ভব। তিনি বলেন, "নাস্তিকতা, অধর্ম এবং নৈরাজ্য মোকাবিলায় শুধু একটিমাত্র সমাধান, যা বর্তমান সময়ের সবেচেয়ে ভয়ংকর বিপদ এবং তা হলে আল-কুরআনের সত্যকে আঁকড়ে ধরা।"(নূরসী, ২০১৬খ, পৃ. ৩৩৫)

৮.৫. ইসলামি ঐক্য

মুসলিম সংখ্যগরিষ্ট দেশগুলোতে আজ অশিক্ষা, দরিদ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের মত বড় বড় সমস্যার মূলে আছে তাদের মাঝে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নানা বিভাজন। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদগার ও ঘৃণামূলক বাক্য ও আচরণ করে থাকে যা সাধারণত: শত্রুগণ পরস্পর করে থাকে। এমনকি তারা একে অপরকে অমুসলিম বলেও মনে করেন। কখনো কখনো তারা রক্তপাতও করেন। অথচ কুরআন ও হাদীসে মুমীনগণকে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে (আল কুরআন, ৪৯:১০) এবং তাদেরকে আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্ত করে আকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। (আল কুরআন, ৩:১০৩) মুসলিমগণ ঐক্যের পথ অবলম্বন করলে এ সব সমস্যা থেকে খুব সহজেই বেরিয়ে আসতে পারতেন।

৯. উপসংহার

সন্ত্রাসবাদ এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। মানুষ সন্ত্রাসী হিসেবে জন্ম নেয় না কিন্তু এই সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, পরিবেশ, সঙ্গ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়ে আমাদের প্রিয় জনই কেউ হয়ত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাস্তান, নেশাখোর, নতুবা জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এ শেষ সময়ে মানবজাতির সামনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসহীনতার পরে নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদই সবচেয়ে বড় সমস্যা। যা অবিশ্বাসী, সংশয়ী ও কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব ও ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই বহি:প্রকাশ।

নূরসী তাঁর গোটা জীবন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তুরস্ক ও আধুনিক বিশ্বের মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ইসলাম প্রচার ও দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আখিরাতে শান্তির জন্য তাঁর লেখাগুলো সহায়ক। বর্তমান বিশ্বে যদিও ইসলামে শান্তির প্রসঙ্গটি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, নূরসীর শান্তি প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। তাঁর মতে, আধুনিক বিশ্বের স্থায়ী শান্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামের যথাযথ জ্ঞান অর্জন ও যথাযথ অনুশীলন। ইসলাম মানুষকে ভালবাসতে, প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করতে, ভিন্ন মত ও পথের মানুষ ও তাদের উপাস্যদের উপহাস ও গালি না দিতে এবং শত্রুকে ভাল বাসতে বলে। আর এ সব কিছু একজন মুসলিম আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে কল্যাণের জন্য করবে। উপসংহারে, তাই বলা যেতে পারে যে, নূরসীর মতামত এবং ধারণা তুরস্ক এবং আধুনিক বিশ্বের

মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও সন্ত্রাসবাদকে আমূলে নির্মূলে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে। আগামীর বিশ্ব সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে ভিন্ন মত ও পথের সহাবস্থান ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে; মানবতার হবে জয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জগুলো নূরসীর শিক্ষা ও দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলে হয়ত গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং বাংলাদেশের আগামীর প্রজন্ম প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাবে।

উল্লেখপঞ্জি

আলম, এ. জেড. এম. শামসুল (২০০৪), *তুর্কী দরবেশ সাঈদ নূরসী (র)*, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন

আস-সালিহী, ইহসান কাসিম (২০১৫), *বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর জীবন ও দর্পণ*, অনু. ডক্টর মুহাম্মদ মসিহুর রহমান (প্রথম প্রকাশ), ঢাকা: সোজলার পাবলিকেশন

আহমদ, রিয়াজ (২০০৮), *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস

ওয়াহিদা, শুকরান (২০০৫), *আধুনিক তুরস্কে ইসলাম: বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনী*, আমেরিকা: স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক প্রেস

ওয়াহিদা, শুকরান (২০১০), *বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী*, নতুন সংস্করণ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক: সোজলার পাবলিকেশন্স

নূরসী, সাঈদ (২০০৩), *মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব*, অনু. মুহসীন মুবারক, আংকারা: ইখলাস নূর নেছরিয়াত

নূরসী, ব. সাঈদ (২০০৭), *মুনাজারাত*, ইস্তাম্বুল: সোজ বেসিম লিমিটেড

নূরসী, ব. সাঈদ (২০১৩), *রেইজ সংগ্রহ*, অনু. শুকরান ওয়াহিদা, ইস্তাম্বুল: সোজলার পাবলিকেশন্স

নূরসী, ব. সাঈদ (২০১৪), *চিঠিসমূহ ১৯২৮-১৯৩২*, অনু. শুকরান ওয়াহিদা, ইস্তাম্বুল: সোজলার পাবলিকেশন্স

নূরসী, সাঈদ (২০১৫), *উম্মতের মরণে জীবনের আর্তনাদ*, অনু. আহমদ বদরুদ্দীন খান, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স

নূরসী, ব. সাঈদ (২০১৬ক), *এমিরডা চিঠি*, খন্ড. ১. অনু. শুকরান ওয়াহিদা, ইস্তাম্বুল:: সোজলার পাবলিকেশন্স

নূরসী, ব. সাঈদ (২০১৬খ), *এমিরডা চিঠি*, খন্ড. ২. অনু. শুকরান ওয়াহিদা, ইস্তাম্বুল:: সোজলার পাবলিকেশন্স

হক, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল ও অন্যান্য সম্পাদিত (১৯৯২), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হেনরি বার্গসনের হাসির দর্শনঃ জীবন এবং নাট্যের সংযোগ স্থাপনের অভিব্যক্তি নিরীক্ষণ

মো. আশিকুর রহমান লিয়ন*

Abstract : French philosopher Henri-Louis Bergson`s (1859-1941) book *Laughter: An Essay on the Meaning* presents a ground-breaking analytical review of the philosophy of laughter. According to Bergson's philosophical deliberation, the following essay examines the theory of laughter and that theoretical framework-based causal analysis of the creation of humorous moments in the plays. In need of illustration and contextualisation, this analysis has taken characters, mannerisms, actions, and language references from our daily life, comic works of literature, and theatre productions. This study assessed the causes of laughter in daily-life and performances according to Bergson's philosophy, precisely comedy in the context of a group and its social significance, laughter is strictly human, emotional rigidity, Etc. He pointed out three elements that create laughter - movement, speech, and character traits. These elements constitute active laughter in mechanical inelasticity, repetition, inversion, and reciprocal interference of series analysed in the context of various comic performances and daily life events. As a human expression, laughter is also capable of correcting societal flaws. Laughter can be identified as a cohesive correctional expression between life and art. Therefore, laughter is a path somewhere between life and art. Hence, analysing the presence of laughter in plays in the context of Henri Bergson's philosophy of laughter, the essay presents an empirical review of the importance and causes of laughter in our society.

ভূমিকা

হাসি মানুষের জীবনে এক সহজাত অভিব্যক্তি। যাপিত জীবনের এই হাসি শিল্পের ক্ষেত্রেও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। হাসি বিষয়ক তত্ত্ব নির্মাণ সহজসাধ্য নয়। হাসির তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ বিষয়ে ডেভিড হেইড বলেন–

> Laughter is a human phenomenon which seems to resist theorization. Although it is one of the most widespread-indeed, universal-responses of human beings to comic and also non-comic stimuli, theoreticians have found it hard to explain its nature and even harder to specify the conditions of its arousal. (Heyd, 1982, P. 285)

* সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্রুপদী গ্রেকো-রোমান কাব্যতত্ত্ব থেকে শুরু করে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগের নাট্যকলা বিষয়ক তত্ত্বাবলি এমনকি আধুনিক নাট্যতত্ত্ব ও প্রাসঙ্গিক দর্শনের বিভিন্ন ঘরানার নানা দার্শনিক ও তাত্ত্বিকদের নিকট হতে হাসির বিশ্লেষণী পর্যালোচনা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিশ শতকে হাসি ও হাস্যরস বিষয়ক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়েছে। মার্ক উইক্স বলেন "There is no question that in the latter decades of the twentieth century philosophical, literary, and cultural studies were infected with something of a comic spirit." (Weeks, 2004, p. 01)

এই পরম্পরায় ফরাসি দার্শনিক হেনরি-লুই বার্গসন (১৮৫৯-১৯৪১) রচিত *Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic* গ্রন্থটি আধুনিক নাট্যকলার এক মৌলিক অভিব্যক্তি হাসি সম্পর্কিত বিশ্লেষণে যুগান্তকারী প্রভাব সঞ্চার করে। হাসি সম্পর্কে বার্গসনের চিন্তার মৌলসূত্রটি উপজীব্য হয়ে ওঠে তাঁর এই বক্তব্যে: "(…) we shall not aim at imprisoning the comic spirit within a definition. We regard it, above all, as a living thing. However trivial it may be, we shall treat it with the respect due to life." (Bergson, 2007, p.1) বার্গসনের দার্শনিক অনুধ্যান অনুযায়ী অনুধাবন করা যায় যে, হাসি জীবনের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত, এটি মনুষ্য প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। জীবন্ত কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার সময় যতটুকু সচেতন হতে হয়, হাসি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমন সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। এই সংবেদনশীলতার অনুসরণে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নিরীক্ষিত হবে বার্গসনের হাসি বিষয়ক তত্ত্ব এবং সেই তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে নাট্যে হাস্যরসাত্মক মুহূর্ত সৃষ্টির কার্যকারণ বিশ্লেষণ। আর এই বিশ্লেষণটিকে লক্ষ্যভেদী ও প্রাসঙ্গিকীকরণের প্রয়োজনে উদাহরণ হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা চরিত্র, আচার-আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও ভাষা প্রভৃতি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট হাস্যরসাত্মক নাট্যসাহিত্য ও নাট্যপ্রযোজনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করা হবে। হাসি সংক্রান্ত দার্শনিক পর্যালোচনায় হেনরি বার্গসন তার বিশ্লেষণকে প্রধান দুটো প্রশ্নের সাপেক্ষে অনুধাবনে ব্রতী হয়েছেন। যেমন, সমাজে অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হাসির গুরুত্ব কী এবং কী প্রক্রিয়ায় হাসির উদ্রেক ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে বার্গসন তিনটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। প্রথমত হাসি উৎপন্নের সংঘবদ্ধ প্রেক্ষাপট ও এর সবিশেষ সামাজিক গুরুত্ব; দ্বিতীয়ত হাসি সর্বদাই মনুষ্য-বিষয়ক এবং তৃতীয়ত আবেগের অসাড়তা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পর্যায়ক্রমে শৈল্পিক ও দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টান্তের আলোকে হেনরি বার্গসনের হাসির দর্শন তথা তাত্ত্বিক কাঠামো নিরীক্ষিত হবে।

সামষ্টিক অভিব্যক্তিস্বরূপ হাসি

বার্গসনের চিন্তা অনুযায়ী "Our laughter is always the laughter of a group." (Bergson, 2007, p. 3) অর্থাৎ মানুষের হাসি মূলত একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির হাসি। অর্থাৎ মানুষের হাস্যময় প্রকাশের সঙ্গে সেই মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধ অস্তিত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ বার্গসনের চিন্তা অনুযায়ী হাসি সর্বদা ব্যক্তিমানুষের সংঘবদ্ধ সমাজে সংঘটিত হয়। বার্গসনের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ পরিবেশনায় তথা পারফরম্যান্সে। যেমন কোনো ট্রেনে ভ্রমণের সময় পাশের সারির আসনে বসা একাধিক ভিনদেশি

যাত্রী যে কোনো একটা বিষয়, কথা বা আচরণের উপর ভিত্তি করে একত্রে হেসে উঠতে পারে কিন্তু ঐ সময়ে আমার বা আপনার কিন্তু হাসি আসবে না। কারণ উভয় পক্ষের সমাজ ভিন্ন, তাছাড়া ঐ মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ বিপরীতে আমি অথবা আপনি স্বতন্ত্র। হাসি উৎপন্নের সংঘবদ্ধ প্রেক্ষাপট বার্গসনের চিন্তায় শিক্ষামূলক তাৎপর্যসহ বিধৃত হয়েছে। বার্গসনের ভাবনা অনুযায়ী হাসি সমাজ এবং ব্যক্তির বিচ্যুতি শুধরে দেয়। সকল বিচ্যুতি আইনের শাষণ দ্বারা শোধরানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ঐ সকল বিচ্যুতি শোধরানোর শক্তিশালী সামাজিক হাতিয়াররূপে হাসিকে গণ্য করা যায়। কারণ একমাত্র হাসিরই ঐ বিশেষ শক্তি আছে, যা দিয়ে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বিচ্যুত ব্যক্তি বা বিষয়কে বেদনাহত না করে শোধরানো সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বার্গসনের মতামতের উপর ভিত্তি করে বেলজিয়াম জেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এমিলি হেরিঙ্গি বলেন: "The philosopher recognized that laughter doesn't always bring out the best in us- it can be used to mock and degrade others. But at its core, its function is to remind us that to be human is to be alive and free." (Herring, 2020)

হেরিঙ্গির বিশ্লেষণ অনুযায়ী বার্গসনের দর্শন অনুধাবন করে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ করলে করলে ঐ ব্যক্তি মনে আঘাত পাবে যা কমেডির মূল উদ্দেশ্য নয় বরং প্রকৃত হাসি মানুষের জীবনকে করে জীবন্ত এবং মুক্ত। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগ (তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগ) প্রযোজিত, অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত দেশজ নাট্যাঙ্গিকের *সং ভং চং* নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এই নাটকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ, আইন-প্রশাসন-চিকিৎসা-শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, হত্যা-গুম, ধর্মীয় ভণ্ডামির মতো বিভিন্ন রকম অসঙ্গতি এবং বিচ্যুতি উপজীব্য করে হাস্যরসাত্মক নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। এই প্রযোজনায় অভিনেতারা সং সেজে এই সকল বিচ্যুতি নিয়ে অতিরঞ্জিত ঠাট্টাতামাসা আর হাস্যরসাত্মক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে দর্শকদের নির্মল হাসির অবতারণা করে। ফলে দর্শক অনুধাবন করে, এ সকল অসঙ্গতি হতে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে রক্ষা করে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রযোজনা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সমাজের কোনো একক ব্যক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা বিষয়কে কেন্দ্র করে হাসি উৎপন্ন হয়ে সংক্রমকের মতো দর্শকের সংঘবদ্ধ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মনে হয় যেন হাসির প্রাণ আছে এবং হাস্যময় অভিব্যক্তি সমাজকে প্রাণবন্ত করে তোলে। কারণ বার্গসনের দর্শন অনুযায়ী: "Laughter must answer to certain requirements of life in common. It must have a SOCIAL signification." (Bergson, 2007, p. 4). এভাবেই হাসি জনসাধারণের সুনির্দিষ্ট কিছু চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে এর অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক তাৎপর্য অর্জন করে।

মানবীয় প্রপঞ্চস্বরূপ হাসি

হাসির সঙ্গে মনুষ্য-অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে বার্গসনের দার্শনিক পর্যালোচনায় প্রতিফলিত হয় একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই প্রসঙ্গে বার্গসন বলেন: "The first point to which attention should be called is that the comic does not exist outside the pole of what is strictly HUMAN. [...] You may laugh at an animal, but only because you have detected in it some human attitude or expression." (Bergson, 2007, p. 2). পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী মানুষ, যারা হাসতে জানে। মনুষ্য বিষয় ব্যতীত হাসি হয় না।

অন্য কোনো পশু বা প্রাণীকে দেখে আমরা হেসে উঠতে পারি, কিন্তু তার কারণ হিসেবে দেখা যাবে কোনো না কোনভাবে ঐ পশু বা প্রাণীর সাথে মনুষ্য আচরণের মিল আছে। আবার যে কোনো জড় বস্তু যেমন একটা খড়ের তৈরি টুপি দেখেও হাসি পেতে পারে, যা কোনো নির্দিষ্ট মনুষ্য আচরণকে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে। যেমন– কোন ব্যক্তি এমন ধরনের একটি টুপি পরে সমাজের সামনে উপস্থিত হলো, যার কারণে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ একটা বানর, কিংবা হনুমান, কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া একটা পেট মোটা কুমড়া। এই পরিস্থিতিতে হাসি উৎপন্ন হয় কারণ হাস্যরত মানুষ এর মধ্যে মানবীয় প্রবৃত্তি, প্রবণতা বা অভিব্যক্তি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এই বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতেই বার্গসন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, হাসি সর্বদা মনুষ্য-সম্পর্কিত একটি অভিব্যক্তি।

আবেগ-রহিত দশা-স্বরূপ হাসি

হেনরি বার্গসনের হাসি সম্পর্কিত দার্শনিক পর্যালোচনার তৃতীয় ও সর্বশেষ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শিরোনামাঙ্কিত করা যায় "আবেগের অসাড়তা" (Anesthesia of Heart) রূপে। এ সম্পর্কে বার্গসন বলেন– "Here I would point out, as a symptom equally worthy of notice, the ABSENCE OF FEELING which usually accompanies laughter. (…) Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion." (Bergson, 2007, p. 2). বার্গসনের দর্শনে আবেগকে অভিহিত করা যায় হাসির মৌলিক শত্রুরূপে। কেননা হাসির উদ্রেকের জন্য এমন একটা প্রেক্ষাপট প্রয়োজন যেখানে আবেগ ও অনুভূতিমূলক বিষয়গুলো বিশেষভাবে অনুপস্থিত (ABSENCE OF FEELING) থাকবে। বার্গসনের এই বক্তব্য অনুধাবনের প্রয়োজনে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশনায় দৃষ্টিপাত করা যায়। যেমন, কোনো ব্যক্তি লোক দেখানো নায়কোচিত ভাব নিয়ে রাস্তা দিয়ে শিস বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাচ্ছে যেন কাউকে সে পাত্তাই দিচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ একটি কলার খোসায় পা পিছলে ঐ ব্যক্তি পড়ে গেলেন। তখন রাস্তায় উপস্থিত অন্যান্য অপরিচিত ব্যক্তিরা তাকে দেখে হেসে উঠল। কারণ এখানে বার্গসনের মতে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে উপস্থিত জনতার কোনো আবেগ সক্রিয় থাকছে না। কিন্তু অপরিচিত জনতা যদি পরক্ষণে বুঝতে পারে যে, রাস্তায় কলার খোসায় পিছলে পড়ে যাওয়া ব্যক্তিটি কিডনি কিংবা হৃদযন্ত্রের গুরুতর রোগী, তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদের হাসি থেমে যাবে। এক্ষেত্রে হাসি রুদ্ধ হয়ে যাবার কারণ হলো আবেগের উপস্থিতি। এ কারণেই বার্গসনের যুক্তি অনুযায়ী হাসি উৎপন্নের সঙ্গে মানুষের আবেগরহিত দশার নিবিড় একটি সম্পর্ক রয়েছে। তাই বার্গসনের চিন্তা অনুযায়ী: "To produce the whole of its effect, then the comic demands something like a momentary anesthesia of the heart. Its appeal is to intelligence, pure and simple." (Bergson, 2007, p. 3). একটি সার্থক হাস্যরসাত্মক নাট্যপ্রযাজনার জন্য এমন একটি মুহূর্ত জরুরি যেখানে আবেগ থাকবে অসাড়, আবেগীয় উপাদান ব্যতিরেকে মুহূর্তের জন্য নির্বিকার ও অনুপস্থিত। অর্থাৎ বার্গসনের দর্শন অনুযায়ী হাসির আবেদন কখনেই মানুষের হৃদয়ের কাছে নয়, হাসি সবর্দাই একটি বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি।

হাসির উপাদান: চলন, বচন ও চরিত্র

হেনরি বার্গসনের দর্শনে হাসির উপাদানসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে মানুষের চলনের ধরন, যাপিত জীবনে তার উচ্চারিত শব্দ তথা ভাষা এবং মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূত্রে। বার্গসন

তাঁর *Laughter An Essay on the Meaning of the Comic* গ্রন্থে তিনটি প্রেক্ষাপটে হাসির উপাদানসমূহ নিয়ে তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন:

১. The comic in general – The comic element in forms and movements- expansive force of the comic
২. The element in situations and the comic element in words
৩. The comic in character

এই তিনটি অধ্যায়ে নির্ধারিত তিনটি প্রেক্ষাপটে হাসি কেন এবং কী প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে পদ্ধতিগত এবং দার্শনিক আলোচনায় হাসির উপাদানসমূহ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই উপাদানসমূহ চলনে, বচনে ও চরিত্রে প্রযুক্ত হয়ে হাসির উদ্রেক ঘটায় বলে হেনরি বার্গসন উল্লিখিত তিনটি অধ্যায়ে প্রতীতি হাজির করেছেন। হাসি উদ্রেকের কারণ সম্পর্কিত মানুষের চলন, বচন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যের সাপেক্ষে অনুপুঙ্খভাবে আরো চারটি উপাদান বার্গসন চিহ্নিত করেছেন। যেমন: (i) যান্ত্রিক অনমনীয়তা (Mechanical Inelasticity), (ii) পুনরাবৃত্তি (Repetition), (iii) বিপ্রতীপ সংঘটন (Inversion), (iv) পারস্পরিক একাধিক ঘটনার চলমানতা (Reciprocal Interference of Series)।

মানবজীবনে লক্ষণীয় যান্ত্রিক অনমনীয়তা, পুনরাবৃত্তি ও বিপ্রতীপ সংঘটনময়তা এবং পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক ঘটনার যুগপৎ প্রবাহ নামক হাসির উপাদানগুলোর সম্পৃক্ততা আলোকপাত করতে গিয়ে বার্গসন বলেন:

> Life presents itself to us as evolution in time and complexity in space. Regarded in time, it is the continuous evolution of a being ever growing older; it never goes backwards and never repeats anything. Considered in space, it exhibits certain coexisting elements so closely interdependent, so exclusively made for one another, that not one of them could, at the same time, belong to two different organisms: each living being is a closed system of phenomena, incapable of interfering with other systems. A continual change of aspect, the irreversibility of the order of phenomena, the perfect individuality of a perfectly self-contained series: such, then, are the outward characteristics--whether real or apparent is of little moment--which distinguish the living from the merely mechanical. Let us take the counterpart of each of these: we shall obtain three processes which might be called REPETITION, INVERSION, and RECIPROCAL INTERFERENCE OF SERIES. Now, it is easy to see that these are also the methods of light comedy, and that no others are possible. (Bergson, 2007, p. 39)

অর্থাৎ বার্গসনের দার্শনিক ভাবধারা অনুযায়ী মানুষের জীবন সব সময় বিবর্তনশীল। পরিবর্তনের এই ধারায় জীবনের কোন মুহূর্ত, কথা কিংবা কার্যকলাপ কখনো হুবহু বারবার ঘটে না কিংবা তাৎক্ষণিক ভাবে উল্টোটিও ঘটে না এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ থাকে। আর যখনই এই স্বাতন্ত্র্য ও তাৎপর্যের ব্যত্যয় ঘটে তখনই সেখানে যান্ত্রিকতা পরিস্ফুট হয়। বার্গসনের মতে, যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় কথা, আচরণ ও মুহূর্ত সর্বদা হাস্যকর। সুতরাং

মানুষের জীবনে– কথা, মুহূর্ত, আচরণ এবং ক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি, বিপরীত ঘটন এবং পারস্পরিক একাধিক ঘটনার চলমানতা হাস্যরস উৎপাদনের মৌলিক উপাদান।

(i) যান্ত্রিক অনমনীয়তা

অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা সব প্রাণীর সমান নয়। পৃথিবীর যে সকল প্রাণী পরিস্থিতির সাথে অভিযোজিত হতে পেরেছে সেই সকল প্রাণীই শুধু টিকে আছে বর্তমান পর্যন্ত। আবার সমাজের সব মানুষের খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতাও সমান নয়। বার্গসন হাসি প্রসঙ্গে লেখার আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সমাজে টিকে থাকতে হলে মানসিক ও শারীরিকভাবে নমনীয় বা সম্প্রসারণশীল হওয়া জরুরি। খাপ খাইয়ে টিকে থাকার সবচেয়ে প্রধান শত্রু হলো– অনমনীয়তা (rigidity)। মানুষের চিন্তা কিংবা শরীরে এই অনমনীয়তা কাজ করলে, সে একটি যন্ত্রের মতো আচরণ করে। তখন ঐ ব্যক্তি বা তার দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া হাস্যকর হয়ে যায়। আবার হাসি দিয়েই এই বিচ্যুতিকে শোধরানো যায়। বার্গসনের এই চিন্তার বিষয়ে গবেষক এমিলি হেরিঙ্গির বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। হেরিঙ্গির মতে:

> Throughout the history of life, organisms that have failed to adapt to environmental challenges have gone extinct. Both at the individual and at the species level, survival has depended on organisms 'ability to demonstrate' a certain elasticity', enough adaptability to find ways around material obstacles. These questions were already on Bergson's mind when he was writing Laughter. He envisioned the comical, and the laughter it provokes, as a sophisticated solution to a particularly human problem. As a product of biological evolution, human societies were also concerned with the struggle between vital and material (or mechanistic) tendencies. Social life, wrote Bergson, requires a 'delicate adjustment of wills' and constant 'reciprocal adaptation' between the members of the group. Society therefore needs its members to display 'the greatest possible degree of elasticity and sociability', and needs to guard itself against 'a certain rigidity of body, mind and character'. These ossified expressions of human life are, according to Bergson, at the source of the comical, because this is precisely what laughter seeks to correct. (Herring, 2020)

অনমনীয় ধরনের চরিত্র, আচরণ, মুহূর্ত, কার্যকলাপ আমাদের সমাজে হরহামেশাই দেখা যায়। যেমন– খিটখিটে মেজাজি, একরোখা অথবা ছিঁচকাঁদুনে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা সমাজে হাসির পাত্র হিসেবে বিবেচিত। এমন ধরনের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের মানুষেরা সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট চিন্তা বা ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে আটকে যান, এবং ঘুরপাক খেতে থাকেন। বেশিরভাগ সময়ই এইসব চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি বা তথ্য হয়ে থাকে সমাজের দৃষ্টিতে নিছক ঠুনকো, গুরুত্বহীন এবং ভুল। অথচ এই ধরনের ব্যক্তিরা এই অমূলক চিন্তায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যান, যখন তাদের দেখলে মনে হয় যেন ভেতরে ভেতরে একটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, যেন তার এই চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই ভুল। তখন এই ধরনের মানুষেরা চিন্তা ও শারীরিক ভাবে অনমনীয় হয়ে পড়েন। এই অনমনীয়তা তখন প্রকাশ পায় তার

আচার-আচরণ, চলাফেরা, ভাব-ভঙ্গি, অভিব্যক্তি এবং কথা-বার্তায় ঠিক যেন ব্যঙ্গাত্মক একটা যন্ত্রের মতো আচরণ করতে থাকেন। তখন এই সকল ব্যক্তি এবং তাদের সৃষ্ট যাবতীয় কার্যকলাপ হাস্যকর হয়ে ওঠে। সাধারণত এই ধরনের মানুষ কখনও নিজেকে জানতে বা বুঝতে পারেন না অথবা নিজ সম্পর্কে বোঝাপড়ার বিষয়ে সবসময় অজ্ঞ থেকে যান। তাদের আচরণ ও অভিব্যক্তি যে হাস্যকর হয়ে উঠছে সেটিও অজানাই থেকে যায়। বার্গসন হাসির এই উপাদানটি সম্পর্কে বলেন– "The laughable element in both cases consists of a certain MECHANICAL INELASTICITY, just where one would expect to find the wide awake adaptability and the living pliableness of a human being" (Bergson, 2007, p. 5)

> অভিযোজন ক্ষমতা এবং নমনীয়তা এই দুটি বিষয়ের অনুপস্থিতিতে যেকোন ব্যক্তি বা চরিত্র, মুহূর্ত বা কার্যকলাপ অনমনীয় যন্ত্রে বা দ্রব্যে পরিণত হয়, যা হাস্যকর। এই যুক্তির সূত্রে বার্গসন অভিমত প্রদান করেন যে, "We laugh every time a person gives us the impression of being a thing." (Bergson, 2007, p. 25)

হাসির কারণ স্বরূপ যান্ত্রিক অনমনীয়তা অনুধাবনের লক্ষ্যে *সং ভং চং* নাট্য পরিবেশনার একটি দৃশ্যের অবতারণা করা যায়। নাট্যপ্রযোজনার বিশেষ দৃশ্যটিতে দেখা যায়, ডিম চুরির অভিযোগে আটককৃত জোকাররূপী এক চোরকে ছয়জন সং বা জোকাররূপী র‍্যাব ক্রস ফায়ার করে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐ চোরকে বলে– "তোর কত্ত বড় সাহস, তুই আমাদের স্যারের ডিম চুরি করসিস!" (আহমেদ, ২০০৯)। তখন দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন, ডিমটি র‍্যাবের স্যার পেড়েছে। ঐ মুহূর্তে দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে। এই হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির যে সকল কারণ পরিলক্ষিত হয় তা হলো– নিছক ডিম চুরির মতো ক্ষুদ্র অভিযোগে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়ার দৃশ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের আইন আর আইনের শাসন ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। এখানে হাসির উপাদানের বিবেচনায় যান্ত্রিকতা (mechanical arrangement) পরিলক্ষিত হয়। বার্গসন-এর দৃষ্টিতে

> Lack of proportion between cause and effect, whether appearing in one or in the other, is never the direct source of laughter. What we do laugh at is something that this lack of proportion may in certain cases disclose, namely, a particular mechanical arrangement which it reveals to us, as through a glass, at the back of the series of effects and causes. (Bergson, 2007, p. 38)

যেমন র‍্যাবের বাহিনীর অভিযান দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল এক অপরাধীকে তারা আটক করেছে, কিন্তু একটু পর দর্শক বুঝতে পারল এই অপরাধী নিছক একটা ডিম চোর। সামান্য ঘটনায় বড় আয়োজনের থেকে প্রশাসন ব্যবস্থার যান্ত্রিক আচরণ এখানে হাস্যরসের বড় কারণ।

(ii) পুনরাবৃত্তি

পুনরাবৃত্তির ধর্ম হলো একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের বিন্যাসের মতন। কারণ একটি যন্ত্র একই আবর্তে অথবা একই স্থানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলতে থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটলে স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। ফলে ব্যক্তির আচরণে, কথায় কিংবা কোনো ঘটনা বা মুহূর্তের বেলায় যদি এমনটা ঘটে, তবে তখন তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। হাসি সব সময় জীবন এবং মনুষ্য

বিষয়ক এবং হাসি তখনই কেবল সংঘটিত হয় যখন জীবনের মোহময় রূপ এবং একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা এক সূত্রে গ্রথিত হয়:

> Any arrangement of acts and events is comic which gives us, in a single combination, the illusion of life and the distinct impression of a mechanical arrangement. (Bergson, 2007, p. 31)

বার্গসনের এই ভাবনার নাট্যিক দৃষ্টান্তরূপে ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের রচিত *তার্তুফ* কমেডি নাটকের একটি দৃশ্য উল্লেখ করা যায়। নাটকের ঐ দৃশ্যে দেখা যায় যে, বাড়ির কর্তা অঁগ বাড়িতে ফেরার পর তার স্ত্রী এল্মিরের শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে কথা বলতে থাকে বাড়ির দীর্ঘদিনের পরিচারিকা দোরিন। কিন্তু মি. অঁগ তার নিজ স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে বরং বারবার তার বাড়িতে অবস্থানরত ভণ্ড ধার্মিক *তার্তুফ*-এর খবর নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দোরিনের প্রতিটি কথার পিঠেপিঠে বারবার যন্ত্রের মতো বলে যেতে থাকে: 'আর তার্তুফ' 'আর তার্তুফ' 'আর তার্তুফ'। চিন্তা এবং ধারণার দিক থেকে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মি. অঁগ'র পুনঃপুনঃ একই কথা উচ্চারণের জন্য সে হাসির পাত্র হয়ে ওঠে। এরূপ শব্দ, কথা কিংবা সংলাপে পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্ট হাসির কারণে যে কমেডি হয়, তাকে বলে ভাষাগত কমেডি।

হাসি উৎপাদনে 'পুনরাবৃত্তি'র বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য বার্গসন Jack in the box নামের একটি খেলনার কথা বলেছেন। যেখানে দেখা যায় যে, একটি বাক্সের মধ্যে স্প্রিংয়ের মাধ্যমে আটকানো মি. জ্যাক নামের একটি পুতুলকে যতই চেপে বাক্সের মধ্যে ঢুকানো হোক না কেন, সে বার বার বাক্স থেকে দ্বিগুণ গতিতে বের হয়ে আসে,

> In a comic repetition of words, we generally find two terms: A repressed feeling which goes off like a spring, and an idea that delights in repressing the feeling anew. (Bergson, 2007, p. 32-33)

বার্গসন আরও একটি চমকপ্রদ খেলনার উদাহরণ দিয়েছেন। খেলনাটির নাম Dancing Jack –এই খেলনাটির প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় থাকে মি. জ্যাক নামের একটি পুতুল। অবশ্য এমন খেলনা আমাদের দেশের গ্রামীণ মেলাতেও দেখা যায়, শুধু মি. জ্যাকের জায়গাটি দখল করে যোদ্ধা বা জোকার। একটি ছোট্ট কাঠ বা প্লাস্টিকের ভিত্তির উপর স্প্রিং-এর মাধ্যমে মি. জ্যাক নামের পুতুলটি আটকানো থাকে। যখন খেলনাটি হাতে নিয়ে ডানে-বামে নাড়ানো হয়, তখন মি. জ্যাক পেন্ডুলামের মতো ডানে-বামে পুনঃপুনঃ যান্ত্রিকভাবে ধারাবাহিক নাচতে থাকে। সমাজেও এমন চিত্র কিন্তু হরহামেশাই দেখা যায়, যান্ত্রিকভাবে অনমনীয় বোকা মানুষটি কিন্তু কখনই বুঝতে পারেনা যে, অন্য কেউ তাকে ইচ্ছেমতো নাচাচ্ছে। কারণ ঐ বোকা মানুষটি তার নিজ চিন্তার ক্ষেত্রে সবসময় অনড় এবং অনমনীয় (rigidity) থাকে। সে সবসময় মনে করে, সে যা করছে তাই একমাত্র উত্তম, সঠিক এবং সে সবচেয়ে সুখি ও স্বাধীন। তখন সে সমাজের নিকট হাসির পাত্র হয়ে ওঠে কারণ অবচেতনভাবে সে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বার বার একই ধরনের ভুল কাজ করে যাচ্ছে। টম এন্ড জেরি কার্টুনে যেমন– টম সবসময় মনে করে সে, জেরি'র তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান, অথচ জেরি সব সময় টমকে ধারাবাহিকভাবে হেনস্থা করে চলে, তখন বোকা টমকে দেখে দর্শক হাসতে থাকে।

মানুষের কোন শারীরিক ত্রুটি বা বদ অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিও হাসি উৎপাদন করতে পারে। যেমন, কেউ হয়ত ঢিলেঢালা প্যান্ট বারবার টেনে তুলছে কিংবা একই স্থানে বারবার চুলকাচ্ছে। আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির এই ত্রুটি দর্শকের নিকট হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে।

(iii) বিপ্রতীপ সংঘটন

যেমনটা হওয়ার কথা বা ঘটার কথা কিংবা যেমনটা বলার কথা, কিন্তু আকস্মিকভাবে ঠিক তার উল্টোটা ঘটলে বা বললে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেমন– ছোট বাচ্চা যদি বুড়োদের মতো আচরণ করে বা বয়স্ক লোক যদি বাচ্চাদের মতো ন্যাকামো করে, ভৃত্য যদি মালিকের মতো আচরণ করে কিংবা বৃহৎ কিছুর স্থলে ক্ষুদ্র আবার ক্ষুদ্র কিছুর স্থলে বৃহৎ কিছু ঘটলে হাসি পায়। বার্গসন উদাহরণ দিয়ে বলেন,

> If you reverse the situation and invert the roles, you obtain a comic scene. (...) Thus, we laugh at the prisoner at the bar lecturing the magistrate; at a child presuming to teach its parents; (...) The plot of the villain who is the victim of his own villainy, or the cheat cheated, forms the stock-in-trade of a good many plays. (Bergson, 2007, p. 41-42)

একটি প্রচলিত চিন্তা বা ধারণার জায়গায় যদি আকস্মিক নতুন কিংবা বিপরীত চিন্তা বা ধারণা প্রযুক্ত হয় তখন হাসি সৃষ্টি হয়। যেমন– টম এন্ড জেরি কার্টুনে আমরা দেখতে পাই বিশেষ কোনো কেমিক্যালের গুণে টম জেরির থেকেও ছোট হয়ে গেছে আর জেরি টমের থেকে অনেক বড় দানব হয়ে গেছে। অবস্থান আর আকৃতির এই বৈপরীত্য কার্যত হাসির উদ্রেক ঘটায়। আবার ভাষাগত কারণেও যখন কেউ বিপরীত কোনো অর্থ বুঝে নেয় তখনও হাসির সৃষ্টি হয়। যেমন– ওস্তাদ তাঁর শিষ্যকে ডেকে বলল– "শোনো, সাবধান হয়ে যাও, জুয়া খেলবে না। জুয়াতে একদিন জয়ী হবে কিন্তু পরের দিন সব টাকা হারিয়ে ফেলবে।" তখন তাঁর ঐ শিষ্য উত্তরে বলল– "তাহলে আমি, একদিন বাদে বাদে জুয়া খেলতে যাব!" বার্গসন এক্ষেত্রে চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন– "The plot of the villain who is the victim of his own villainy (…)." (Bergson, 2007, p. 42) অর্থাৎ ঘটনার খলনায়ক যখন মনের অজান্তে নিজের খলনায়কোচিত ফাঁদে নিজেই পতিত হয়। *সং ভং চং* প্রযোজনায় দেখা যায় একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ডাক্তার রোগীকে টেবিলের উপরে চিত করে শোয়ায়। অতঃপর ডাক্তার অপারেশন আরম্ভ করে এবং দেখা যায় যে, রোগীর পেট থেকে মেয়েদের অন্তর্বাস, জুতার হিল, লেইস ফিতা, লিপস্টিক ইত্যাদি নারীদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বের হতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় দর্শকের মধ্যে বাঁধভাঙা হাস্যরস উৎপন্ন হয়। এখানে বার্গসনের মতে, হাসির উপাদান উল্টো ঘটন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ পেট থেকে যা বের হবার কথা, তার বদলে অন্যকিছু বের হতে দেখা যায়, যা দর্শকের কল্পনাতেও ছিল না। পাশাপাশি, নারীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পুরুষের পেট হতে বের করার মাধ্যমে চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পুরুষ সমাজ যে নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে, সেই বিচ্যুতির দৃষ্টিভঙ্গিকেও হাসির মাধ্যমে সমালোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছাপূরণ গল্পের উদাহরণ উল্লেখ করা যায় যেখানে পিতা সুবল ও পুত্র সুশীল যখন ইচ্ছাঠাকুরনের ইচ্ছা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতা পুত্রের মতো এবং পুত্র পিতার ন্যায় আচরণ শুরু করে। ফলে দর্শকের মনে হাস্যরস তৈরি হয়।

(iv) পারস্পরিক একাধিক ঘটনার চলমানতা

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনারই রয়েছে স্বতন্ত্রতা। কিন্তু বিশেষ করে, মুহূর্ত এবং ঘটনার ক্ষেত্রে হাস্যরস বা হাসির উদ্রেগ ঘটে যখন দুটি ভিন্ন অর্থের বা ধরনের দুই বা ততোধিক মুহূর্ত বা ঘটনা আলাদা প্রেক্ষাপটে চলতে চলতে একটি মুহূর্তে মিলে সম্পূর্ণ নতুন বা বিপরীত অর্থের বা ধারণার পরিস্থিতি তৈরি করে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক। যেমন– একজন লোক ও তার স্ত্রী শুধু ঠুনকো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে, অথচ তারা বুঝতে পারে না যে তারা অনেকের চেয়ে সুখি। এক পর্যায়ে জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে সুখি হওয়ার জন্য তারা তাদের সংসারের ইতি টানল এবং লোকটি একটা সুখি জীবনের আশায় অনেক দূরে চলে গেল। দুজনের জীবনের গতিপথ হয়ে গেল ভিন্ন। এরপর মাঝ বয়সী এই লোকটি অনেক খুঁজে খুঁজে তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একজন তরুণীকে বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ে করার পর সে জানতে পারলো যে, তার বিয়ে করা এই তরুণী হলো, তার প্রাক্তন স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে। অর্থাৎ লোকটির প্রাক্তন স্ত্রী এখন সম্পর্কে তার শাশুড়ি। ভাবা যায় কি জটিল পরিস্থিতি! সুখ অধরাই থেকে গেল আর সঙ্কট আরো তীব্র হয়ে উঠল।

পারস্পরিক একাধিক ঘটনার চলমানতা একটি নাট্যে কিভাবে প্রযুক্ত হয় এবং দর্শক কি প্রক্রিয়ায় বিষয়টির সাথে বোঝাপড়া করে, সে বিষয়ে বার্গসনের বক্তব্যকে ডাচ গবেষক অ্যান্টন নিজহল্ট ব্যাখ্যা করে বলেন:

> Bergson introduces his notion of reciprocal inference (l'interférence des series) which he defines as a situation where a series of events can be interpreted in different ways. Since Bergson focuses on comedy on stage, he distinguishes interpretations put forward by the actors who only know part of the story, and the audience, that has been given a more complete view of the events happening on stage and therefore are assumed to have the correct interpretation. So, we have different sequences of events or storylines, but there are overlapping situations, where these storylines meet, and diverge again, until the next overlapping situation. The spectators enjoy the different interpretations of these sequences of events and how these different interpretations are resolved in the overlapping situations. Obviously, there can be one actor that has more knowledge than other actors and for his own benefit tries to knit sequences together whenever there is the chance that the conflict in the storylines is resolved too early. Similarly, the play writer can hide one storyline from the audience during the play and only at the end of the play the hidden storyline emerges when also all other storylines are resolved. (Nijholt, 2015)

বার্গসনের দর্শন ব্যাখ্যা করে নিজহল্ট যা বলেন তার সারাৎসার হলো যে, একটি নাটকে বিচিত্র ধরনের ঘটনা থাকে কারণ দর্শক বিচিত্র ধারণা ও ব্যাখ্যা আস্বাদন করতে পছন্দ করে। নাটকের ঘটনা প্রবাহে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাপুঞ্জ একে অপরকে কখনও টপকে যায় আবার কখনও দ্বন্দ্ব তৈরি করে, যার ফলে দর্শক প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। নিজহল্ট ব্যাখ্যা

করে বলেন যে, ঘটনাপুঞ্জের এই জটিল জালের উন্মোচন বা ঘটনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা হয়তো একজন অভিনেতা জানেন। চরিত্রাভিনেতা নিজ স্বার্থের জন্য কিংবা গল্পের সমাপনীর জন্য, গল্প অনুযায়ী অন্য চরিত্রের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, নাট্যকার দর্শকের নিকট গল্পের আকর্ষণ তীব্র করার লক্ষ্যে যেকোন একটি ঘটনা দর্শকের নিকট হতে গোপন রাখেন, যে ঘটনাটি সবশেষে অন্যান্য সকল যৌগিক ঘটনাপুঞ্জের সাথে উন্মোচিত হয়।

এক্ষেত্রে হাসি আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে যখন ঘটনা বা মুহূর্তগুলো ক্ষুদ্র জায়গা বা ধারণা থেকে আরম্ভ হয়ে শেষমেশ বিশাল আকার ধারণ করে। বার্গসন এই বিষয়টিকে বলেছেন– The snow-ball effect. অর্থাৎ একটি ছোট্ট বরফের টুকরো যখন একটি পাহাড় থেকে বলের মতো গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে তখন কিন্তু এটাকে দেখে তেমন কিছুই মনে হয় না, কিন্তু বরফের বল সদৃশ টুকরোটি যত গড়াতে থাকে ততো বড় হতে থাকে। একসময় ছোট্ট এই বরফের বলটি বিশাল আকার ধারণ করে। যেমন: মলিয়ের রচিত তার্তুফ নাটকে দেখা যায় একটা বাড়িতে তার্তুফ নামের এক ব্যক্তির আগমনে পরিবারের অন্য সদস্যদের ছোট ছোট প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যে, ঐ বাড়িতে রাষ্ট্রের, প্রশাসনের, আইনের এবং পুলিশের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে। ঘটনার সামান্যতা ঘটনা পরম্পরায় বিশেষ ও বিশাল হয়ে ওঠার মাধ্যমে হাসি উৎপন্ন হয় কারণ এখানে ঘটনার পারস্পরিকতা একক প্রবাহে বয়ে চলে। অন্যদিকে, *সং ভং চং* নাট্যপ্রযোজনার প্রতিটি চরিত্রকে চড়া রঙের রূপসজ্জা আর পোশাকের ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরঞ্জিত করে জোকার বা সং-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। বার্গসনের মতে, স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত সব কিছুই হাস্যকর। এই লক্ষ্য থেকেই কমেডি বা হাস্যরসাত্মক প্রযোজনায় বাস্তবতাকে ব্যঙ্গ করার জন্য একটি ক্ষুদ্র বিষয়কে বৃহৎরূপে অতিরঞ্জিত (exaggerat) করে উপস্থাপন করা হয়। এ সম্পর্কে বার্গসনের ব্যাখ্যা,

> To speak of small things as though they were large is, in a general way, TO EXAGGERATE. Exaggeration is always comic when prolonged, and especially when systematic; then, indeed, it appears as one method of transposition. (Bergson, 2007, p. 55)

উপসংহার

হেনরি বার্গসনের হাসি বিষয়ক দর্শনের কাঠামো বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, হাসি উৎপন্নের প্রেক্ষাপট ব্যক্তিক নয়, সামষ্টিক। সামাজিক কাঠামোর সাপেক্ষে উৎপন্ন সর্বদাই মানবিক এবং তা আবেগ-রহিত মান-দশায় সৃষ্ট হয়। হাসির অভিব্যক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বার্গসন তিনটি উপাদান যথা চলন, বচন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন। এই উপাদানগুলো যান্ত্রিক অনমনীয়তা, পুনরাবৃত্তি, বিপ্রতীপ সংঘটন এবং একাধিক পরস্পর ছেদী ঘটনার চলমানতায় সক্রিয় হাসির কার্যকারণভিত্তিক অভিব্যক্তিকে নির্মাণ করে যা উপর্যুক্ত আলোচনায় গৃহীত হাস্যরসাত্মক নাট্য ও দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ পরিবেশনার আলোকে অনুধান করা যায়। মানবীয় অভিব্যক্তিস্বরূপ হাসি সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতেও সক্ষম। বার্গসনের তত্ত্ব অনুসরণে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,

> Comedy lies midway between art and life. It is not disinterested as genuine art is. By organising laughter, comedy accepts social life as a natural environment, it even obeys an impulse of social life. And in this respect, it turns its back upon art, which is a breaking away from society and a return to pure nature. (Bergson, 2007, p. 75)

অতএব, জীবন ও শিল্পের মধ্যবর্তী এক পন্থায় কমেডি বা হাস্যরত্মক নাট্যের অবস্থান। এক্ষেত্রে কমেডি শৈল্পিক কাঠামোতে হাসির অভিব্যক্তি তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজকে একটি সাধারণ বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে, সমাজের যৌথ সত্তাকে মান্য করেই উৎপন্ন হয় এবং হাসির নাট্য যা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতারই স্মারক। বস্তুত, হাসিকে চিহ্নিত করা যায় জীবন ও শিল্পের মধ্যকার এক সংযোগশীল সংশোধনমূলক অভিব্যক্তিস্বরূপ।

উল্লেখপঞ্জি

আহমেদ, সৈয়দ জামিল। (২০০৯) *সং ভং চং* (তাৎক্ষণিক অভিনয়ে নির্মিত দৃশ্য)। ঢাকা : বাংলাদেশ

Bergson, Henry. (2007). *Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic*, Translated by Cloudesley Brereton and Fred Rothwell. Gloucester: DODO PRESS.

David Heyd. (1982). *The Place of Laughter in Hobbes's Theory of Emotions*, Journal of the History of Ideas, Vol. 43, No. 2. 285-295. Rtrieved from https://doi.org/10.2307/2709204

Herring, Emily. (2020, 7th July). *Laughter is vital for philosopher Henri Bergson, laughter solves a serious human conundrum: how to keep or minds and social lives elastic*. Retrieved from https://aeon.co/essays/for-henri-bergson-laughter-is-what-keeps-us-elastic-and-free

Nijholt, Anton. (2015). A Conferrence paper: *Incongruity Humor in Language and Beyond: From Bergson to Digitally Enhanced Worlds*, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269810529_

Weeks, Mark. (2004). *Beyond a Joke: Nietzsche and the Birth of "Super-Laughter"*, The Journal of Nietzsche Studies, Issue 27, Spring. Published by Penn State University Press. Rtrieved from https://doi.org/10.1353/nie.2004.000

রবীন্দ্রগল্পে বাংলাদেশের চার প্রকৃতিকন্যা : স্বরূপ ও রূপান্তর

মো. রাফাত আলম মিশু*

Abstract : East Bengal as well as Bangladesh is an important chapter in the story literature of Rabindranath Tagore. As in Rabindra novels the city and citizenship predominate; the village, nature and people of the village predominate in his short story. The attempt to create nature and man continuously is noticeable in Tagore's short stories. Tagore's philosophy about rural life of East Bengal was active behind this effort . He is nature-sheltered in the creation of women characters of East Bengal. For that reason, these women can be read separately from other female characters in Tagore's fiction. These characters are also distinct in terms of transformation. The construction of Bangladeshi women's characters, juxtaposition of nature and man in Tagore's short stories are indicative of special spirit of his Literary works.

বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্রসৃজনের উর্বরভূমি। কাদা-মাটি-জলের এই জগৎ কেবল একটি বিশেষ স্থানিক পটভূমিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রথম পরিচয়ের ভূমিকা পালন করেছে এই পূর্ববঙ্গ, বর্তমানের বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে জেনেছেন বিশ্বপ্রকৃতিকে; এই জনাঞ্চলের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করেছেন বিশ্বমানবের চিরায়ত রূপ। বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান তাই রবীন্দ্রজীবনের বড় ঘটনা। বাংলাদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি থেকে তিনি পেয়েছেন জীবন ও সাহিত্য-উপাদানের অপার সম্ভার। কবিতায়, গানে ও চিঠিপত্রে এর পরিচয় মিলবে। কিন্তু ছোটগল্প রচনার আধার ও আধেয় – উভয় ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তানদের ভূমিকা সবিশেষ।

রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশে আসতে হয়েছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনা-সূত্রে। পূর্ববঙ্গে ছিল ঠাকুর পরিবারের 'ঠাকুর এস্টেটে'র জমিদারি। উনিশ শতকের বাংলার ভাব-জাগরণের অন্যতম চিন্তক, বিদ্যায়-জ্ঞানে সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচর্চায় নিবিষ্টচিত্ত, বৈষয়িক কর্মক্রিয়া ও সম্পদের সুষম বণ্টন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সচেতন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারির পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পূর্ববঙ্গে পাঠান। এর আগেও শৈশবে তিনি অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে (১৮৭১) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে (১৮৭৬) শিলাইদহে এসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় এই অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। (শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ১৯৭৪ : ৩৮-৪০) চিঠিপত্র বিশেষত *ছিন্নপত্র* (১৩১৯) থেকে অনুমেয়, ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন, ১৮৯১ সাল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এইসূত্রে রবীন্দ্রজীবনের চতুর্থ দশককে রবীন্দ্রনাথের

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'বাংলাদেশ-অধ্যায়' বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের জীবন শুরু করেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল তিনটি জমিদারির দেখাশোনা করা – যশোর (জশোহর) জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া) বিরাহিমপুর, রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ) কালীগ্রাম ও পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) সাজাদপুর। পদ্মার পারে শিলাইদহ ছিল বিরাহিমপুরের কাছারি, নাগর নদীর তীরে পতিসর ছিল কালিগ্রামের কাছারি আর যমুনার অদূরে সাজাদপুরের কাছারি। এই তিন জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই জনাঞ্চলই হয়ে উঠেছিল তাঁর স্থায়ী নিবাস। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামকে ও গ্রামের মানুষকে এত নিবিড় করে, এত অন্তরঙ্গ হয়ে ও বিস্তৃত পরিসরে দেখেছেন। দেখেছেন চালচ্চিত্রিক পরিচর্যায়। ধরা পড়েছে সৌন্দর্যের পশরা। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বড় উপাদান।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের একান্ত সম্পদ ছোটগল্প। ছোটগল্পরচনার উপাদান ও উপকরণ এই পূর্ববঙ্গের উদার জমিন রবীন্দ্রনাথকে উজাড় করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামকে ও গ্রামের মানুষকে চালচ্চিত্রিক পরিচর্যায় এত নিবিড় করে, এত অন্তরঙ্গ হয়ে ও বিস্তৃত পরিসরে দেখেছেন। ধরা পড়েছে সৌন্দর্যের পশরা। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বড় উপাদান। 'কবির চেতনায় গল্পকারের আবির্ভাবের জন্য যে উপকরণ ও পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, পদ্মা এবং তার জনপদ ও নিসর্গ সেই প্রয়োজনীয় উৎস ও পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।' (আহমদ রফিক ২০০৩ : ৪৮) নগর কলকাতার বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের জগৎকে উন্মোচন করলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> যার জন্যে *গল্পগুচ্ছ*কে আমরা একান্তভাবে পূর্ববঙ্গের ফসল বলে গণ্য করি, তা হলো – সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তা সাহিত্যিক রূপ লাভ করে এমন বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে অন্য কোথাও প্রকাশ পায়নি। (গোলাম মুরশিদ ১৯৮১ : ১১০)

রবীন্দ্রছোটগল্পের সকল চরিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। প্রতিটি মানুষই পৃথিবীর সন্তান, প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু পূর্ববঙ্গ পর্বে রবীন্দ্রগল্পের চরিত্রসমূহ, বিশেষত নারী চরিত্রসমূহ প্রকৃতির সমান্তরালে হয়েছে বিকশিত ও রূপান্তরশীল। 'রবীন্দ্রগল্পে নারীরই প্রাধান্য; মিলনে-বিরহে-অভিমানে-বিদ্রোহে কিংবা নীরব-নিঃসঙ্গ অন্তর্ধানে নারীর জীবন-রূপায়ণ *গল্পগুচ্ছে*র বহুকৌণিক দীপ্তির অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি।' (ভীষ্মদেব চৌধুরী ১৪১২ : ৪৬) বিশ শতকের রবীন্দ্রগল্পের মৃণাল, কল্যাণী, অনিলা, সোহিনী প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে যে আত্মনির্ভর স্বকণ্ঠের উচ্চারণ শোনা যায়, তার প্রারম্ভিক পর্ব পূর্ববঙ্গের নারীরা। বিশশতকের নারীরা যেখানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, নাগরিক সংস্কৃতিতে যাপিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, রুচিতে উনিশ শতকীয় আধুনিক, অধিকারসচেতন, বয়সেও পরিণত; বিপরীতে উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের নারীরা স্বল্পশিক্ষিত বা শিক্ষাহীন, গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, বৈশিষ্ট্যে সাধারণ, বয়সে বালিকা। রবীন্দ্রগল্পের প্রায় সব নারীই রূপান্তরশীল। এ-কথা পূর্ববঙ্গীয় নারীচরিত্রদের ক্ষেত্রে আরও বিশেষভাবে বলা যায়। এই পর্বের নারীরা বেশিরভাগই বালিকা। প্রকৃতির পরিচর্যায় তারা গঠিত ও বর্ধিত। আর প্রকৃতির অনুষঙ্গেই তারা বালিকা থেকে রূপান্তরিত হয় নারীতে – দেহে, মনে, চেতনায় – সর্বতোভাবে। আবার কখনও নারীর সারল্য ও অবগুণ্ঠন ভেদ করে প্রকাশিত হয় ব্যক্তিত্বসচেতন রেনেসাঁসীয় নারীর দৃঢ় রূপ।

পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগমন তাঁর স্থানিক পরিবর্তনমাত্র নয়। তিনি প্রবেশ করলেন এক নতুন জগতে, যেখানে খুঁজে পেলেন সহজ মানুষকে। এই সহজ মানুষ এই বাংলার মাটি দিয়ে গড়া।

মানুষ এখানে প্রকৃতির সন্তান। কখনও কখনও প্রকৃতি ও মানুষ লীন হয়ে যায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্যে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ভৌগোলিক ও নৃতত্ত্বগতভাবে সবসময়ই অখণ্ড বাংলা থেকে স্বতন্ত্র। এ-প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য :

> বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চললীলা। (হুমায়ূন কবির ১৯৯২ : ২)

এই কর্মচঞ্চল বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে ব্যঞ্জনাবহুল অনেকগুলো গল্প। সাতান্ন বছর পরিব্যাপ্ত (১৮৮৪-১৯৪১) রবীন্দ্রসৃষ্ট মোট ১১৮টি গল্পের (প্রমথনাথ বিশী ১৪২০ : ৪) মধ্যে দশ বছরের কালপরিসরে (১৮৯১-১৯০০) পূর্ববঙ্গ-পর্বে রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা উনষাট। (আহমদ রফিক ২০০৩ : ৬৩) এই কালপর্বে তাঁর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃজনের কাল, কবিজীবন ও কবিসত্তার গুরুত্বের বিচারে এই পর্বকে 'সোনার তরী-চিত্রা পর্ব' বলেও চিহ্নিত করা যায়। সাহিত্যসৃজনে এই বাংলাদেশের মূল্য কবির জীবনে কত গভীর তার কথা বলেছেন জীবনের অন্তিম পর্বে (বৈশাখ ১৩৪৭, ১৯৪০) *সোনার তরী*র সূচনাকথনে:

> বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা-শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে; যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪১১ : ৭)

বাংলাদেশ বলতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতেও বর্তমানের বাংলাদেশ ভূখণ্ডকেই বুঝিয়েছেন, রাজনৈতিক পরিচয়ে যা বাংলাদেশ রাষ্ট্র। স্বীকৃতি দিয়েছেন এর স্বতন্ত্র সত্তাকে, চিনে নিয়েছেন এর নতুনত্বকে। এবং এই জনভূমি থেকে পাওয়া অভ্যর্থনা, পরিচয়ের আন্তরিকতা প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ এই জনভূমি থেকে দূরবর্তী নন। এই জনভূমি তাঁর মানসগঠনে ও সাহিত্যসৃজনে ভিত্তিভূমির ভূমিকা পালন করেছে।

এই পর্বের সব গল্পের পটভূমি পূর্ববঙ্গ নয়, কিন্তু সমগ্রটা জুড়ে পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গীয় উদার ও বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির সতেজ নির্যাস। একইভাবে সক্রিয় নারীচরিত্রে পরিপূর্ণ *গল্পগুচ্ছে*র পূর্ববঙ্গ অংশে যে নারীদের পাওয়া যায়, তা পরবর্তী নারীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। খুব সহজেই প্রকৃতির অনুষঙ্গে, হৃদয়ের সংবেদনায়, গতি ও স্থিতির মিথস্ক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের প্রকৃতিকন্যাদের আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়। এই শনাক্তির পেছনে কাজ করে পূর্ববঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতির যৌথায়ন। রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতি বিচিত্র প্রভাবসঞ্চারী ও বহুমাত্রিক। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব করা, তাহাদের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আপনাকে একান্তভাবে নির্লিপ্ত করিয়া দিয়া একমনে জীবনটিকে প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া উপভোগ করা – এসমস্তই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেও অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। (নীহাররঞ্জন রায় ১৩৬৯ : ৩৪৯)

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিদর্শনে নিসর্গ ও মানুষ সমানভাবে উপস্থিত থাকে। রবীন্দ্রগল্পে তারা পরস্পর প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জননিরপেক্ষ করে দেখেননি, জন ও জনপদের রূপও তাঁর

প্রকৃতিচেতনার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-অনুধ্যানে প্রকৃতি থেকে তার মানুষের উৎসারণ বা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ সমান্তরাল। রবীন্দ্রগবেষক সৈয়দ আকরম হোসেন *গল্পগুচ্ছের* প্রধান প্রবণতাকে পরিচিহ্নিত করেন এভাবে :

> পটভূমির পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রকৃতি এবং সময়ের গতিবৈচিত্র্য অনিবার্যভাবে নির্ধারণ করে ছোটগল্পের চরিত্রচিত্তের গভীরতা, বিস্তৃতি ও স্তরসমূহ। এই পরস্পরিত সংযোগ-প্রক্রিয়ায়, বিন্যাস-প্রতিন্যাসের সূক্ষ্মতায় এবং বিপ্রতীপ গতির সম্বন্ধসূত্রে শিল্পিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছের* জীবনদর্শন। (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৯৭ : ১৫)

চলমানতার ভেতরে খণ্ড খণ্ড ছবি দিয়ে একেকটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলাদেশকে দেখেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চলতে চলতে, বজরার জানালা থেকে, কাছারির বৈঠকে বসে আর বাকিটা হৃদয়ের অনুভব দিয়ে। তাই গল্পকারের অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলো ছোটগল্প নির্মাণের একটি অংশ, আর বড় অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কল্পনা, ব্যঞ্জনা ও কবিসত্তার সংবেদনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে (১৮৭৩-১৯৬০) পূর্ববঙ্গের নানা স্মৃতি, দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের পাশাপাশি ছোটগল্প লেখার প্রস্তুতির অনেক তথ্য তাঁর পত্রসংকলন *ছিন্নপত্রের* বিভিন্ন চিঠিতে জানিয়েছেন। 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'অতিথি', 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'সহ আরও অনেক গল্পের পটভূমি *ছিন্নপত্রের* বিভিন্ন চিঠি থেকে জানা যায়। একথা সকলেই স্বীকার করছেন যে, গল্পগুচ্ছে প্রকৃতি কেবল পটভূমিরূপে নয়, রবীন্দ্রগল্পের অনিবার্য অঙ্গরূপে উপস্থিত। বাংলাদেশ-পর্বের ছোটগল্পে অনেকগুলোতে মানুষ প্রকৃতির অংশ হিসেবে উপস্থিত। 'ছুটি' গল্পের ফটিক, 'অতিথি' গল্পের তারাপদ কিংবা 'বলাই' গল্পের বলাই চরিত্রসমূহ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশবাদী প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিকোণ কাজ করেছে। চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে প্রকৃতিসন্তান। আর নারীরা হয়ে ওঠে প্রকৃতিকন্যা। রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্প – 'পোস্টমাস্টার', 'সুভা', 'শাস্তি' ও 'সমাপ্তি'তে দেখা যেতে পারে চার পূর্ববঙ্গীয় নারী চরিত্র রতন, সুভা, চন্দরা ও মৃন্ময়ীর রূপ-রূপান্তরে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব ও নারীর প্রকৃতিকন্যা হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। বাংলাদেশের প্রকৃতিকন্যা হিসেবে রবীন্দ্রগল্পের এই চার চরিত্রকে নির্বাচন করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে, তারা রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-পর্বে অবস্থানকালে সৃষ্ট, তারা বাংলাদেশেরই মানুষ এবং তাদের রূপান্তরেও কাজ করেছে বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশ-পর্বে রচিত রবীন্দ্রসৃষ্ট আরও অনেক নারী চরিত্র আছে; কিন্তু যে অর্থে এই চারজনকে প্রকৃতিকন্যা বলে অভিহিত করা হচ্ছে, এবং বাংলাদেশেরই প্রকৃতিকন্যা বলা হচ্ছে, সে-অর্থে অন্যদের তা বলা যায় না।

রতন

'পোস্টমাস্টার' পূর্ববঙ্গপর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্প। প্রকাশিত হয়েছিল 'হিতবাদী' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু পোস্টমাস্টার নয়, এক বালিকা – রতন। গল্পের প্রথমে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী যুবক পোস্টমাস্টারের চোখে পূর্ববঙ্গের একটি নিভৃত গ্রামের চিত্র আঁকেন গল্পকার। এরপর পরিচয় দেন একটি বালিকার যার 'নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।' এই সাধারণ বালিকাটির প্রথম পরিচয় পাঠকচিত্তে তেমন কোনো আকর্ষণ তৈরি করে না, অনেকটা বাংলার অতি সাধারণ প্রকৃতির মতো। কিন্তু বাংলার সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে যে গ্রহণক্ষমতা ও আস্থার জায়গাটি আছে, রতনের মধ্য দিয়ে যেন তা ক্রমশ উন্মোচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ *ছিন্নপত্রের* ২১, ৫৯, ১১৯ সংখ্যক পত্রে এক পোস্টমাস্টারের উল্লেখ করেন। সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির নিচতলায় ছিল পোস্ট-অফিস। কোনো কোনো সন্ধ্যায় কবির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন সেই পোস্টমাস্টার। সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে তিনি পোস্টমাস্টারকে পেলেন গল্পের একটি উপাদান হিসেবে মাত্র। কিন্তু তা গল্প হয়ে ওঠে তখনই, এর সঙ্গে যখন কবির মানসলোক-উৎসারিত রতন যুক্ত হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের গল্পকারসত্তার আভ্যন্তর রূপটি হচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ। বহির্বাস্তবতার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্বাস্তবতার কবিসত্তার মিলিত রূপ তাঁর ছোটগল্প। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে যে 'কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না', সে-ই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতিরূপ রতনের মধ্যে আত্মিক যোগ খুঁজে পায়। পোস্টমাস্টারের অপরিচয়ের সংকটটি পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ প্রকৃতির নয়, বরং তা শাহরিক বিচ্ছিন্নতার। পোস্টমাস্টারের প্রাথমিক অভিব্যক্তি থেকে অন্তত তা-ই অনুধাবন করা যায়। পোস্টমাস্টারের প্রাথমিক অভিযোজন অভিজ্ঞতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারবিচ্ছিন্ন জীবনের মনোগত অবস্থার সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার উদার প্রকৃতি এবং তার জনপদের মানুষ অচিরেই পোস্টমাস্টারের অপরিচয়ের সংকটকে মুছে দেয়, যেমনটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। রতনের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি যুবক পোস্টমাস্টারের নিবেদন ও সমর্পণ প্রতীকায়িত হয়। রতন তখন কেবল ক্ষুদ্র বালিকাটি থাকে না, হয়ে ওঠে প্রকৃতির সমরূপ, নারী এবং পরিপূর্ণ মানুষ। রতন বয়সে ছোট হলেও সে হয়ে উঠে পোস্টমাস্টারের নির্ভরতার জায়গা :

> সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত – যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্পন উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। ('পোস্টমাস্টার')

রতনের মনোলোকে পোস্টমাস্টারের প্রশ্রয়ে ভেসে ওঠে মা-বাবা-ছোট ভাইয়ের স্মৃতিপ্রবাহ। একইভাবে পোস্টমাস্টারের ছোটভাই, মা, দিদির কথা শোনারও একমাত্র শ্রোতা হয়ে রতন এই জনবিরল আটচালার পোস্ট-অফিসের পোস্টমাস্টারের শূন্যতার আশ্রয় হয়ে ধরা দেয় : 'যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না।' রতন সেবার মধ্যদিয়ে অর্জন করেছে জননীর পদ। জ্বরতপ্ত পোস্টমাস্টারের সেবাব্রতী রতন বালিকা হয়েও নারীর আরও একটি স্তরে উন্নীত হয় :

> বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি। ('পোস্টমাস্টার')

কিন্তু সম্পর্কের এ অসীমতা জাগতিক সীমার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। আরোগ্যলাভের পর পোস্টমাস্টার আর এই 'অস্বাস্থ্যকর' গ্রামে কোনোভাবেই থাকতে চাইল না। ফলে অপরাপর জাগতিক নিয়মের মতো সে রতনকে জানিয়ে দেয় : 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।' অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধ। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় একটি বালিকা হৃদয়ের উত্তরহীন-প্রতিকারহীন রক্তক্ষরণ জাগতিক চোখে দেখা সম্ভব নয়। তাই গল্পকার আশ্রয় নেন প্রকৃতি ও পরিপার্শ্বের : 'মিট্‌মিট্

করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।' যুবক পোস্টমাস্টার মানবিক বোধ নিয়েই রতনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিল। কিন্তু রতনকে বোঝার ক্ষমতা হয়তো কারওই নেই। গল্পকার বলছেন : 'এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে।' আবার যখন বিদায় নেবার পর পোস্টমাস্টারের ভাসমান উদাস মনে উদিত হচ্ছিল 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।', ওই মূহূর্তে 'বোধ করি তাহার (রতনের) মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে – সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়।' রতন ঠিক এই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য হলেও রূপান্তরিত হয় ট্র্যাজেডির নায়কে। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> গল্পটিতে একটি গরীব অসহায় গ্রাম্য বালিকার হৃদয়বেদনার পরিস্ফুট ছবির পাশাপাশি রয়েছে প্রকৃতির রহস্যঘন সত্তার প্রতিফলন। ছোট এতটুকু জীবনের গণ্ডিবদ্ধ বেদনা বিশ্বব্যাপী ক্যানভাসের বিশালতায় গভীর ট্রাজেডির প্রতীকে মুক্তি পেয়েছে। (আহমদ রফিক ২০০৩ : ১০৫)

সৈয়দ শামসুল হকের মতে 'পোস্টমাস্টার' পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পমাত্র নয় বরং অনুভব ও নির্মাণের দিক থেকে জটিলতম গল্প। তাঁর বিশ্লেষণে উঠে আসে রতনের স্বরূপের আরও কয়েকটি দিক :

> রতনের প্রেম তার আপনার গড়া; রতনের প্রেম তার আপনার ভেতরেই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত; আমরা করুণ আর কাকে বলবো যদি একে না বলি, যখন রতন একবার, মাত্র একবার 'উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া ওঠে'? আমরা জীবনের কঠিন সত্য আর কাকে বলবো যদি একে না বলি যখন আমাদের 'দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে'? (সৈয়দ শামসুল হক ২০০৫ : ১৩৩)

এখানে রতনের কেবল বালিকা থেকে নারীতে রূপান্তর ঘটেনি, তার নারীহৃদয় মানবহৃদয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। রতনের চরিত্রের পরিণতি নির্মাণে রবীন্দ্রমানসে কাজ করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতা। কারণ কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত পোস্টমাস্টারের স্বাভাবিক আচরণ বালিকা রতনের কাছে তখন মীমাংসাহীন আচরণ। মধ্যবিত্তের এই সংবেদনহীন আচরণ আঘাতরূপে রতনকে সর্বমানবিক বোধে উন্নীত করে। গল্পের শুরুতে যে বিশেষ কেউ নয়, গল্পশেষে তারই মুখচ্ছবি বিশ্বব্যাপী অব্যক্ত মর্মকথার প্রতিরূপ হয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়। 'পোস্টমাস্টার' গল্পপাঠে আরও একটি ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলো – ঔপনিবেশিকতায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে মিলন অসম্ভব। ঔপনিবেশিক আবহে বড়ো হওয়া পোস্টমাস্টার এবং প্রকৃতির অনুষঙ্গে বেড়ে ওঠা রতনের এই বিচ্ছিন্নতা সে-কথাই প্রমাণ করে। রতন শুধু গ্রামীণ একজন বালিকাই থাকে না, বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতায় সে বিঔপনিবেশিক চারিত্র্যকেও ধারণ করে।

সুভা

'সুভা' গল্পের সুভা পূর্ববঙ্গীয় প্রকৃতির এক নির্বাক প্রকৃতিকন্যা। সুভার মূল নাম সুভাষিণী। অথচ সুভা বাক্‌হীন। নামের মধ্যে আছে এক করুণ বৈপরীত্য। ভাষণ বা সুভাষণ সুভা থেকে বহু দূরে। এই বিপ্রতীপতাও প্রকৃতি-উৎসারিত। প্রকৃতিও সময়ে সময়ে এমন বাকহীন রূপ নিয়ে আবির্ভূত

হয়। সুভার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন প্রকৃতির মহত্তর ব্যঞ্জনা : 'এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।' এই-সূত্রে আমরা পেয়ে যাই নদীময় বাংলাদেশের শান্ত-স্নিগ্ধ শব্দহীন এক গ্রামচিত্র :

> নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে। ('সুভা)

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেছেন নদীপথে। তাই তাঁর দেখার মধ্যে আছে 'প্যানোরোমিক' দৃষ্টিকোণ; তিনি ব্যষ্টিকভাবে দেখেতে চাননি, দেখছেন সামগ্রিকভাবে। বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪২২ :২২৬) তাঁর কাছে এক অজানিত কিন্তু বহু-কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের প্রকৃতি; বিশেষত পল্লিপ্রকৃতি ও নদীময় প্রকৃতি। কাজের অবসরে নদী সুভার একান্ত সঙ্গী। সুভা বাংলাদেশের প্রকৃতিকন্যার আরেক স্বতন্ত্র রূপ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> 'সুভা'র বয়নে প্রকৃতি যেমন অন্তরঙ্গভাবে এসেছে, তেমনি এসেছে আমাদের বহু চেনা দুপুর, স্তব্ধ নির্জন ঘুঘু-ডাকা গ্রামীণ দুপুর। যে দুপুরের স্তব্ধতারও নিজস্ব একটি ভাষা আছে, রূপ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, আর যে বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের কবি-গীতিকারদের হাতে চমৎকার মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে। (আহমদ রফিক ২০০৩ : ৫৭)

সুভা চরিত্রের অনুষঙ্গী চরিত্র গ্রাম্য যুবক প্রতাপের চরিত্র অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বৈরাগ্য রূপটিকেও সংযোজিত করেন। বৈরাগ্যের মধ্যে আছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় – মানুষের কর্মপ্রবাহ। কলকাতার মতো অস্থিরতা নেই বটে, আছে সহজ জীবনের আবাহন। 'নদী এবং গ্রামীণ জীবনধারায় এমনি ধরনের শিথিলতা, ধীরগামিতা ও এক ধরনের উদাসী বাউল মানসিকতা একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।' (আহমদ রফিক ১৯৯৮ : ২৭) বাংলার গ্রামে দুপুর বেলার যে এক আশ্চর্যরকম সৌন্দর্য আছে, তা রবীন্দ্রনাথের চোখেই বোধ হয় প্রথম ধরা পড়ে। এমনই প্রকৃতি চিত্রে তিনি স্থাপন করেন সুভার প্রতিমারূপ। 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়।' মধ্যদুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে বোবা প্রকৃতি ও বোবা মেয়ে সুভা সম্পূরক সত্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির এমন রূপটিকেই আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি *ছিন্নপত্রে* বলছেন : 'ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি –' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪২২ : ১৮)। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মতো সুভার ভেতরে তিনি নির্মাণ করেন ধ্বনিহীন-বাক্‌হীন ভাষা। প্রকৃতি একমুখী যে নয়, তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত সুভা ও সুভার প্রকৃতি। সারল্যঘেরা প্রকৃতির কন্যা সুভার বিবর্তনটিও রবীন্দ্রনাথ বালিকা থেকে নারী হয়ে ওঠার পরিচর্যায় উপস্থাপন করেন :

> সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিয়াছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত ভাসিয়া আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ('সুভা')

কিন্তু সুভার বিবাহ ও বিবাহোত্তর সামাজিক বিন্যাস তাকে নিক্ষেপ করে নিরস্তিত্ব সত্তায়। লক্ষণীয়, সুভা পূর্ববঙ্গের নির্বাক প্রকৃতির মাঝেই সর্বশী ও পাঙ্গুলি নাম্নী দুই গাভি ও কর্মহীন প্রতাপের সাহচর্যে স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। বাকহীন চোখের ভাষা বুঝত সবাই। কিন্তু যখনই সে পূর্ব (পূর্ববঙ্গ) থেকে পশ্চিমে (কলকাতারও পশ্চিমে, রাচি, পুরি প্রভৃতি শহর) যাত্রা করে স্বামীসহযোগে, তখনি সে হয়ে পড়ে প্রকৃতিচ্যুত। প্রকৃতিই ছিল সুভার আশ্রয় ও বিশ্রামের নিরাপদ স্থান। প্রকৃতির কাছে আছে সুভার গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু সে যখন প্রকৃতিচ্যুত, তখন সে নিরস্তিত্ব। কারণ বোবা নারীর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। অনিবার্য হয়ে উঠল প্রকৃতিবিরহিত প্রকৃতিকন্যার আত্মার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ সুভার মধ্য দিয়ে নারীর প্রাকৃতায়নের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন।

চন্দরা

'শাস্তি' গল্পের চন্দরা বাংলা কথাসাহিত্যে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশের আরেক প্রকৃতিকন্যা। প্রকৃতির রূপ সবসময় অখণ্ড নয়। রুদ্ররূপী প্রকৃতির মতো নারীপ্রকৃতিও এখানে দৃঢ়চেতা। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মত উল্লেখ্য :

> রবীন্দ্র-ছোটগল্পে প্রকৃতি মানুষের আত্মীয়। আত্মীয় সকল ক্ষেত্রেই মানুষের প্রিয়জন হবে এমন কোনো কথা নেই, সে শত্রুতাও করে। কখনো সহানুভূতি, কখনো বিদ্রূপ, কখনো আগ্রহ, কখনো ঔদাসীন্য – এমনি নানা ভূমিকায় প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের বিষয়টি গল্পের মধ্যে বিধৃত ক'রে রাখা হয়েছে। (আনোয়ার পাশা ১৪১৩ : ৯২)

পারিবারিক জীবনের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের পটভূমি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও হয়েছেন প্রকৃতি-অনুষঙ্গী। 'শাস্তি' গল্পের মানুষগুলো বসবাস করে বহুবঙ্কিম জটিল মনস্তত্ত্বের মধ্যে। এই মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নদী ও প্রকৃতি। পদ্মার ভাঙনে, জমিদারতন্ত্রের পেষণে তারা সবাই আক্রমণাত্মক। তখন উন্মত্ত পদ্মাও আক্রমণাত্মক। প্রাকৃতিক ক্রূরতা ও অর্থনৈতিক ক্রূরতা তাদের মানসিকভাবে ক্রূর করে তোলে। গল্পের পরবর্তী অংশে তিনি যে ব্যক্তির এক বৈনাশিক ভংকরতার পরিচয় দেবেন তা-ই বৈনাশিক পদ্মার রুদ্রমূর্তি অঙ্কনের মধ্যে ইঙ্গিতায়িত হয়েছে :

> অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ('শাস্তি')

এমন ভাঙনোন্মুখ প্রকৃতি এই গল্পের পুরুষ চরিত্রের ব্যক্তিসত্তার পতনোন্মুখতাকে যেমন দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলে, তেমনি তার বিপরীতে চন্দরা এক অটল ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি সম্ভব হয়েছে সে নারী বলে। পূর্ববঙ্গীয় সরল ও গার্হস্থ্য নারীর ভেতর এই ব্যক্তিচেতনা রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীকালের পঠন-পাঠনের ফলাফল, একই সঙ্গে সময়ের চেয়েও অগ্রবর্তী চিন্তন ক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীর নির্মমতা, বীভৎসতা ও ভংকরতার ব্যস্তানুপাতে চন্দরার মানসিক পরিবর্তন পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারমূলক সমাজের প্রতি এক সাহসী প্রতিবাদ হয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। এ-প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান:

> উনিশ শতকের সময়সীমায় রচিত গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্র নির্মাণে ততটা স্বাতন্ত্র্য দেখাননি, যতটা দেখিয়েছেন বিশ শতকের গল্পে। আলোচ্য সময়ের গল্পে মৃন্ময়ী এবং চন্দরা চরিত্র এ-ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। *সবুজপত্র*-যুগের গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারী ব্যক্তিত্বের যে বিশিষ্টরূপ নির্মাণ করেছেন, তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি যেন শাস্তি গল্পের চন্দরা। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০২ : ৫৭)

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের বিচারে উনিশ শতকের নারীরাই উজ্জ্বল। কারণ বিশ শতকের রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীরা নাগরিক ও আধুনিক বটে, কিন্তু তারা গ্রামীণ নারীদের চেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রকৃতির ভেতর থেকে নির্যাসিত গ্রামীণ নারীরা সহজাতভাবে সাহসী, প্রতিবাদী ও সংগ্রামশীল। অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও পাওয়া যায় ব্যক্তি চন্দরার শরীরী রূপের উপস্থাপন, যে রূপের সঙ্গে অনায়াসেই মিলিয়ে পড়া যায় বাংলাদেশের প্রকৃতিচিত্রকে :

> চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীর অনতিদীর্ঘ; আঁটসাঁট; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। ('শাস্তি')

এই সদাচঞ্চল প্রকৃতিকন্যা মনুষ্যনির্মমতায় হয়ে পড়ে বিমূঢ় ও বাক্‌হীন। পারিবারিক ও সামাজিক এবং অংশত ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে হন্তারক পতিভ্রাতার দায় চন্দরাকে স্বীকার করতে বললে চন্দরার সহজিয়া রূপটি আর থাকে না। তার সহজতার গতি রুদ্ধ করে দেয় সমাজ আরোপিত প্রতারণা :

> চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। ('শাস্তি')

এই বিমুখতা তাকে নারীত্বের আরেক স্তরে উন্নীত করে। সে আর নিছক গ্রাম্য কুললক্ষ্মী হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বসচেতন মানুষ। এই মানুষ আধুনিক মানুষ। হত্যার দায় স্বীকারকে শুধু জেদ বলে তুচ্ছ করবার বিষয় নয়। এখানে চন্দরা দাঁড়িয়ে যায় বিদ্রোহী পদ্মার মতো এক অনিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বে। চন্দরার বারবার হত্যার দায়স্বীকারোক্তি শ্রবণপূর্বক জজসাহেব যখন তাকে জানায় হত্যাকারীর শাস্তি ফাঁসি, তখন চন্দরা বলে, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো। আমার তো আর সহ্য হয় না।" পদ্মাতীরবর্তী সংগ্রামশীলতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিত্যযুদ্ধ তাকে এই সাহস যুগিয়েছিল। কিন্তু গল্পান্তে এবং চন্দরারও জীবনান্তে সিভিল সার্জন যখন স্বামী ছিদামের সাক্ষাৎপ্রার্থনার কথা জানায়, তখন চন্দরার একটিমাত্র উচ্চারণ, বলা যায় জীবনের শেষ একটি শব্দের উচ্চারণ তাকে জীবনের অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। আর তা হলো – 'মরণ'। এই উচ্চারণ নিছক একটি শব্দমাত্র নয়। একটি শব্দের মধ্য দিয়ে শত-সহস্র বছরের পুরুষতন্ত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও নারীর ব্যক্তিত্ববান হয়ে ওঠা ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিকেও এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে চন্দরা নির্দেশ করে দেয়। কারণ কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী গ্রামেও ঔপনিবেশিক শাসন সক্রিয় ছিল, আইন-আদালতসূত্রে। এই ঔপনিবেশিক আইন আদালত বা জমিদারতন্ত্র বা চিরাচরিত সামাজিক পুরুষতন্ত্র কেউই চন্দরার প্রতি ন্যায়বিচার করেনি। ফলে চন্দরার একটি উচ্চারণের উদ্দেশ

অনেকগুলো পক্ষ। পদ্মাতীরবর্তী বিদ্রোহী কোনো নারীর উচ্চারণও যেন এতোটা শানিত হয় না। এ যেন এক রেনেসাঁসীয় নারীর দীপ্র উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথ এক অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূর কণ্ঠে এই উচ্চারণ স্থাপন করে নারীব্যক্তিত্বের বিশেষত প্রান্তিক নারীসত্তার নব-উদ্বোধন ঘটালেন।

চন্দরা নিশ্চিতভাবেই অন্য নারীদের থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামের অন্য নারীর সৌন্দর্যের প্রতি ছিদামের আগ্রহ চন্দরাকে প্রতিরোধ-সচেতন করে; চন্দরার ব্যক্তিত্বের জায়গাটি চিহ্নিত হয়ে যায়। 'শাস্তি' গল্পে দুই নারী থাকলেও চন্দরাই রবীন্দ্রনারীভাবনার প্রেমিকা রূপ, রাধা গার্হস্থ্য নারী। প্রেমিকা সত্তা চন্দরার ব্যক্তিত্বের অংশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তি' গল্পে পুনর্জাগরিত নারীর একটি রূপ পূর্ববঙ্গের পদ্মাপারের এক সাধারণ কুলবধূর মধ্যে দেখতে চাইলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির লড়াই, প্রকৃতিসন্তানদের সংগ্রামশীলতার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়।

মৃন্ময়ী

সাজাদপুরে অবস্থানকালে ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখখানি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। ... অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল-হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে – নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪২২ : ৭৭-৭৮)

এই বর্ণনায় বারবার 'বোধ হয়' শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে বুঝে নেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ শুধু দেখছেন, কিছু শুনতে পাচ্ছেন না; অনেকটা কল্পনা সহযোগে ঘটনা বুঝবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বর্ণনার কেন্দ্র যে সপ্রতিভ কিশোরী, তাঁর পরিচয় স্পষ্ট। অন্তর্লোকে আপনা-আপনি নির্মিত হয়ে যায় 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীর অন্তর্কাঠামো :

> মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। ('সমাপ্তি')

পূর্ববঙ্গের নারী বলেই হয়ত মৃন্ময়ীর ওপর পশ্চিমবঙ্গীয় বা বঙ্কিমীয় সামাজিক বিধি রবীন্দ্রনাকে আরোপ করতে হয়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-যৌবনের মানসগঠনে নারীমুক্তির পথে সামাজিক বিধির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে, যার দৃষ্টান্ত তাঁর রচিত অন্যান্য অনেক গল্প-উপন্যাস-নাটকে পাওয়া যাবে। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য:

> মৃন্ময়ী মাটির পৃথিবী; মৃন্ময়ী নারী নয়, বালিকা। তার শরীরের ভাষাও প্রাকৃতিক। তবে নারীদেহ তৈরি হয় শরীর ও মনের বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথও এই বর্ণনায় দেহের সামাজিক সৃষ্টি ও উপযোগিতার প্রক্রিয়া মেনে নিয়েছেন। (সিরাজ সালেকীন ২০১২ : ৭৫)

এই পর্যবেক্ষণে মৃন্ময়ী চরিত্র নির্মাণের পেছনে রবীন্দ্রমানসের নাগরিক মানসিকতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু আদরের মিনু অর্থাৎ মৃন্ময়ী প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির অকৃপণ উদার মৃত্তিকায় গড়া মানবপ্রতিমা। প্রকৃতির সারল্যের সমান্তরালে মৃন্ময়ীর সারল্যের নানা রূপ বিচিত্র অনুষঙ্গে ধরা পড়েছে :

> পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক-একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। ... এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না। ('সমাপ্তি')

রবীন্দ্রনাথ সীমা-অসীমের তাত্ত্বিক জায়গা থেকে প্রথমেই মৃন্ময়ীর ব্যক্তিত্বের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেন। এরপর রূপান্তর। যে মৃন্ময়ী ছিল মুক্তজীবনের অধিকারিণী, বিবাহ তাকে করে তোলে সীমায়িত; কিন্তু প্রাকৃতায়নের সূত্র ধরে সে আবারও মুক্তপ্রকৃতির নারী হয়ে ওঠে। অসীম-সীমা-অসীমা এই তিন স্তরের রূপান্তর মৃন্ময়ীর চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেমন, স্বামী অপূর্ব কলকাতায় যাবার পরপরই স্বামীর জন্য মৃন্ময়ী এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকে নারীর শরীরী বোধ। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের মতো মানবমনস্তত্ব বিশেষত নারী মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নেন প্রকরণকলার সর্বোচ্চ চূড়ায়:

> গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য–অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল। ('সমাপ্তি')

এ হলো মৃন্ময়ীর শরীরী উন্মোচনের শিল্পিত প্রকাশ। বালিকা মৃন্ময়ী নারী হয়ে উঠল। মৃন্ময়ীর এই রূপান্তর প্রকৃতির মুক্ততার হাত ধরে। মৃন্ময়ী মুক্ততার জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হলো। তাই দেখা যায়, বিয়ের পর 'এক রাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল। ... সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' অপরদিকে অপূর্বের প্রশ্রয়ে পিতার উদ্দেশে নৌযাত্রায় 'পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে।' অপূর্ব যে ভালোবাসা আদায় করতে চেয়েছিল মৃন্ময়ীর কাছ থেকে, তা জোরপূর্বক অর্জিত হয়নি। সেই ভালোবাসা মৃন্ময়ীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রকৃতির সহজাত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, শরীরী মুক্তির প্রশান্ত পথ ধরে। রূপের মধ্যেই অরূপের সন্ধান দিয়ে রাখেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতিকন্যা মৃন্ময়ী জাগতিক ও পারিবারিক পরিচর্যায় এবং বিশেষত অপূর্বের ব্যক্তিত্বের অনুষঙ্গে হয়ে উঠলো ব্যক্তি-নারী :

> এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। ('সমাপ্তি')

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অনুষঙ্গে নারীর শরীরী সত্তাকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করেন ও স্বীকৃতি দেন। অনুরাগ ও অনুভবের প্রবলতা দিয়ে যে স্বামী অপূর্বকৃষ্ণকে চিঠি লিখেছে, কিন্তু সে জানে না এই ঠিকানা সর্বস্ব জগৎসংসারে ঠিকানা বিহীন চিঠি মূল্যহীন। তাই চিঠিটিও পৌঁছায় না, অপূর্বও ফেরে না। অপূর্ব কলকাতায় গেলে মৃন্ময়ীর চিরপরিচিত মাতৃগৃহকে আর আপন মনে হয় না। তাঁর এই পরিবর্তন প্রকৃতির অমোঘ দান। এই পরিবর্তন বহিরারোপিত নয়, প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ অনিবার্য পরিবর্তনের অনুবর্তী। যে বালিকা-পুত্রবধূকে তার শাশুড়ি শত চেষ্টাতেও সমাজশাসিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি, সেই পূত্রবধু সহজাত নারীসত্তা নিয়ে প্রত্যাবর্তিত হয়। প্রকৃতির নবপ্রাণ সঞ্চারের মতোই মৃন্ময়ীর এই আভ্যন্তর-পরিবর্তন। পূর্ববঙ্গীয় কন্যা বলেই তার ওপর সামাজিক কঠোরতা জেঁকে বসতে পারেনি, ছুঁয়ে গেছে মাত্র। অঙ্কুরিত বীজ থেকে তৃণ হয়ে উঠবার প্রাকৃতিক জীবনগতির মতোই মৃন্ময়ীর এই রূপান্তর।

নদী ও নারী যেন রবীন্দ্রমানসে বেণীবন্ধনে আবদ্ধ। *ছিন্নপত্রের* একাধিক পত্রে নদীর ও নারীর এই মিথস্ক্রিয়ার রূপটি অনুভব করা যায়। একইভাবে বাংলাদেশ-পর্বের ছোটগল্পের নারীর চারিত্র্যগতি নদীর গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যময় বলে মনে হয়। কখনও কখনও নারীরা যেন নদীরই মানবী সত্তা হিসেবে ধরা দেয় গল্পের আধারে। কখনও কখনও মনে হয় গল্পের নারীরা অনেক বেশি নদীনিয়ন্ত্রিত; নিকটবর্তী নদী ওই জনপদের নারীর স্বভাব ঠিক করে দেয়। আলোচ্য চারটি গল্পেও নদী আছে সদর্পে। এইসব নদীর মতোই নারীরা গতিশীল। 'শাস্তি' গল্পের নদীর ভংকর ভাব, অপরদিকে 'সুভা' গল্পের নদী 'গৃহস্থ মেয়েটির মতো' শান্ত ও স্নিগ্ধ; আবার পোস্টমাস্টারের বিদায় বেলায় রতনের নদী বর্ষাবিস্ফারিত, 'ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল'; মৃন্ময়ী নদীর বুকে ভাসমান নৌকায় অনুভব করে মুক্তির আনন্দ। বাংলাদেশ-পর্বের গল্পে প্রকৃতি ও নারীর সম্পর্কসূত্র সন্ধানে নদী এক প্রভাবক অনুষঙ্গ।

পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও এই অঞ্চল থেকে উপাদান গ্রহণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রগল্প হয়ে ওঠে সর্বজনীন, বিশ্বজনীন। এই বাংলার স্বরূপই এমন। রবীন্দ্রসৃষ্ট বাংলাদেশের আলোচ্য চার 'আইকনিক' প্রকৃতিকন্যার রূপ ও তাদের রূপান্তরে ধরা পড়ে অব্যক্ততা ভাষাহীনতার মধ্যে গূঢ় বক্তব্য, বালিকার নারী হয়ে ওঠা, নারীর মানুষ হয়ে ওঠা। রবীন্দ্রগল্পের পূর্ববঙ্গের নারীরা স্বল্পবাক। কিন্তু রূপ এবং অরূপ তথা সৌন্দর্য মিলে তৈরি হয়েছে তাদের ব্যক্তিত্ব। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করেই দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন নারীকে। জমিদারি দেখাশোনাসূত্রে পূর্ববঙ্গের সাধারণ গ্রামীণ ও কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অগভীর ছিল না। নানা প্রয়োজনেই পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও জনপদের মতোই প্রাত্যহিক নানা মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার কিংবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সাধারণ কোনো নারীর বাস্তব ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে রবীন্দ্রনাথকে নারী চরিত্র নির্মাণে আশ্রয় নিতে হয়েছে প্রকৃতিরই। আর প্রকৃতির আশ্রয়ে সাধারণ বালিকারা যে ব্যক্তিত্বসচেতন ও বিশ্বজনীন চরিত্রে পরিণত হয়েছে, তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীর ধারণা। বাংলাদেশ-পর্বের গল্পে নারী ও প্রকৃতি কখনো

কখনো সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই পর্বের নারীরা শারীরিক সংজ্ঞায় যেমন সুস্থ, সবল ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন, তেমনি ব্যক্তিত্বের গড়নেও বলিষ্ঠ ও গতিশীল। প্রকৃতির নীরব-সরব-প্রতিবাদী ও উত্তাল রূপের মতোই রবীন্দ্রসৃষ্ট বাংলাদেশের নারীর চারিত্র্যরূপ আবিষ্কার করা যায়। তাদের এই এই চারিত্র্য পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। তারা হয়ে ওঠে প্রকৃতিকন্যা, বাংলাদেশের প্রকৃতিকন্যা।

উল্লেখপঞ্জি

আনোয়ার পাশা, ১৪১৩। *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা*, ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ

আহমদ রফিক, ১৯৯৮। *রবীন্দ্রভুবনে পতিসর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ

আহমদ রফিক, ২০০৩। *ছোটগল্পের শিল্পরূপ : পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প*, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লিমিটেড

গোলাম মুরশিদ, ১৯৮১। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলিকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রমথনাথ বিশী, ১৪২০। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০২। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

ভীষ্মদেব চৌধুরী, ১৪১২। *দু-চারিটি অশ্রুজল :* ঢাকা: *রবীন্দ্রগল্পের ভিন্নপাঠ*, নবযুগ প্রকাশনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১১। *সোনার তরী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪২২। *ছিন্নপত্র*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, ১৯৭৪। *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৯৭। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৫। *মার্জিনে মন্তব্য*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ

সিরাজ সালেকীন, ২০১২। *রবীন্দ্রচেতনায় নারী*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ

হুমায়ূন কবির, ১৯৯২। *বাঙলার কাব্য*, ঢাকা: অনির্বাণ

বাঙালি দার্শনিক শেখ মুজিবুর রহমান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বেল্লাল আহমেদ ভূঞা*

Abstract : Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), the Father of the Nation, dubbed with the honorific title of "Bangabandhu", the architect of independent Bangladesh. From the very beginning of his political life he was proud of his Bengali national identity and he transformed the Bengali nationalist movement into a movement for independence. The research question of this article is how Sheikh Mujibur Rahman became a Bengali philosopher and the greatest Bengali soul of all time. The root of all the thoughts and philosophy of Bangabandhu is the humanistic philosophy of emancipation of the mass people of Bengal. As a 'man of the people' Bangabandhu had dedicated his life for the betterment of the masses, economic and political emancipation and above all the establishment of the philosophy of mass people liberation through the development of human values and consciousness. Methodologically, this paper used the approach of descriptive analysis through the philosophy of history and textual contexts. This paper intends to analyse. Bengali, Bangabandhu, Liberation War and Bangladesh are inseparable. It has been established by this research that, Mujibur Rahman is a contemporary Bengali philosopher. He is a pragmatic political philosopher and greatly enlightened by the philosophy of Bangali.

গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রবন্ধটিতে প্রধানত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌলিক উৎস হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থসমূহ এবং গৌণ উৎসের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নাল, এডিটরিয়াল, পত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তিনটি গ্রন্থ পর্যালোচনা, ৬৬-র ৬ দফা, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে দলীয় ফোরামে ভাষণ, ৭ মার্চের ভাষণ, ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষণ, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের ভাষণ, জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম, বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ ও অভিভাষণ, স্বাধীনতাত্তোর ও স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালনা, বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকার তথ্য, বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বিভিন্ন মৌলিক গবেষণা, গ্রন্থ, জার্নাল প্রভৃতি এ প্রবন্ধের মূল উপাদান।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালির দর্শন

বাঙালি একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় জাতি। বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম কোন সময়ে মানব বসতি স্থাপিত হয় এর সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, তবে ধরে নেওয়া হয় যে, বাঙালির জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই। প্লাওসিন যুগে পৃথিবীতে নরাকার জীবের বিবর্তন ঘটে, ভূতত্ত্ববিদগণের মতে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল প্লাওসিন যুগে (অতুল, ২০১৮)। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। আদিম অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'অস্ট্রিক' আর দক্ষিণ ভারতের জনগোষ্ঠী 'দ্রাবিড়' নামে অভিহিত করা হয়। মুখ্যত অস্ট্রিক-দ্রাবিড় (ভেড্ডিড) ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি। নীহার রঞ্জন রায়ের (১৪০৬ ব.) মতে, "এই ভেড্ডিড বা ভেড্ডিড প্রতীম মানুষেরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী। শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা ভারতবর্ষেই একসময়ে তাদের বিস্তৃত বসবাস ছিল" (পৃ. ৬)। বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক বিকাশের ধারায় 'ভেড্ডিড' উপাদানই মূল ও প্রধান বলে অনুমান করা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে জলপথ কিংবা উপকূলীয় স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক-মঙ্গোল। এরাই অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নিগ্রো, আর্য, শক, হুন, গ্রিক, মঙ্গোল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে মূলত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, আলপীয় আর্য এবং মঙ্গোলরক্ত (আহমদ শরীফ, ২০১৬)। সুতরাং আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব হয় অস্ট্রিক, আলপাইন, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে।

বাঙালি মিশ্র বর্ণ ও রক্তসঙ্কর জাতি। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীগণ ব্যতীত, পৃথিবীর অন্য সকল জাতিই মিশ্র জাতি। আদিকাল থেকে নানা গোত্রের-রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে বাঙালির জীবনে। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার আজও ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবুও গবেষণা-অনুমানে ও প্রমাণে বলা যায় শতকরা সত্তরভাগ অস্ট্রিক, বিশভাগ ভোটচীনা, পাঁচভাগ নিগ্রো এবং বাকি পাঁচভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালি শিরা-উপশিরাতে (আহমদ শরীফ, ২০১৬)। মিশ্র রক্তপ্রসূত হবার কারণে বাঙালির চিন্তা-চেতনা, দর্শন, মনন, চরিত্র ও সংস্কৃতি অনন্য।

বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটেছে বাঙলা ভাষার ভিত্তিতে। আদি বঙ্গদেশের বাঙলা ভাষী মানবগোষ্ঠীই বাঙালি জাতি। অতুল সুরের (২০০৮) মতে-" বাঙালী বলতে আমরা মাত্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা ও যারা বাঙলাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। তার মানে, বাঙলার এক স্বকীয় ভাষা ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে" (পৃ. ৩৩)। এই ভাষা বৈশিষ্ট্য বাঙালি জাতিকে অন্য জাতি বর্হিভূত গোষ্ঠী থেকে আমরা আলাদা করতে পারি। তাইত সুকুমার সেন তাঁর *বঙ্গভূমিকা* গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন- 'ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু' (সূত্রঃ আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ২৫)। বাঙালি জাতি গঠনে বাঙলা ভাষার ভূমিকাই প্রধান। সুতরাং যে সকল জনগোষ্ঠী বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে অথবা ঘরোয়া ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, যাদের চিত্ত ও মননে বাঙলার সংস্কৃতি ও ভাষার ঐক্য ধারণ করে তারাই বাঙালি।

বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও দর্শন। দর্শন হচ্ছে সাধারণত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক ও যৌক্তিক প্রশ্নাবলির জিজ্ঞাসা। দর্শনকে বিভিন্ন

যুগ, মহাদেশ, জাতি, দেশ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি, গোত্র, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্র-ব্যক্তিভেদে শ্রেণিকরণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জাতির ভিত্তিতে দর্শনকে গ্রিক দর্শন, ব্রিটিশ দর্শন, জার্মান দর্শন, ভারতীয় দর্শন, আমেরিকান দর্শন প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অন্যান্য জাতির মতো বাঙালিরও দর্শনচিন্তার ঐতিহ্য আছে। জীবন ও জগতের মৌলিক এবং বাস্তবিক সমস্যাবলির যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক উপায়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছে বাঙালি। বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্য প্রাচীন ও গৌরবময়, যাতে প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে সমকাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারার উপাদান যুক্ত হয়েছে (রশীদুল, ২০১৫)। সুতরাং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে যারা বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা-চেতনা ও মননে ধারণ করে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সমস্যাবলির স্বরূপ অনুসন্ধান করে এবং শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে মুক্তচিন্তা ও বৌদ্ধিকচর্চার মাধ্যমে যে সমন্বয়ধর্মী দর্শন গড়ে তুলেছে তাই বাঙালির দর্শন।

বাঙালির দর্শন বিকাশের ক্রমধারাকে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এবং সমকালীন যুগ এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগের বাঙালি বৌদ্ধ দার্শনিকরা হলেন শান্ত রক্ষিত, আচার্য শান্তি দেব, শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ। মধ্যযুগের দর্শন হলে বৈষ্ণব, বাউল দর্শন, সুফি দর্শন প্রভৃতি— এ যুগের দার্শনিকরা হলেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ। আধুনিক যুগের বাঙালি দার্শনিকরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। সমকালীন বাঙালি দার্শনিকরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অরবিন্দ, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, আরজ আলী মাতব্বর, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

যে অর্থে শেখ মুজিবুর রহমান একজন দার্শনিক

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন একজন দার্শনিক ও বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি। তিনি একাডেমিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে আলোচনা-সমালোচনা কিংবা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ কথা বলা সমীচীন হবে না। দর্শনের প্রধান যে শাখাগুলো রয়েছে- অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, নীতিবিদ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি। প্লেটো-এরিস্টটল, স্পিনোজা-ডেকার্ত-রাসেলের মতো গুরুগম্ভীর আলোচনা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বালোচনার বিষয় উপস্থাপন করেন নি। তাঁর দর্শন একত্রে একক কোনো গ্রন্থ বা আলোচনায় একসাথে পাওয়া যায় না। যদিও তাঁর গ্রন্থ, রচনা, বক্তব্য, ভাষণ, কর্মজীবন এ দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ও মতামতগুলো নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

প্রচলিত অর্থে দর্শন হলো জগৎ ও জীবনের মৌলিক ও বাস্তবিক সমস্যাবলরি সমাধানের লক্ষ্যে বৌদ্ধিক, মুক্তচিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়াস। দর্শনের দুটি দিক রয়েছে: একটি তাত্ত্বিক এবং অন্যটি প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক। সাধারণত দর্শনের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। মানবতাবাদ, প্রয়োগবাদ, নীতিবিদ্যা, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনসহ দর্শনের যে সব শাখা মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ও কল্যাণমুখী ব্যবহারিক দিক সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। দর্শন বিমূর্ত বিশুদ্ধ কোনো তত্ত্ব নয় বরং ব্যবহারিক অর্থেই

সক্রেটিস বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগুরু তথা একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা না করে সত্য সুন্দর মঙ্গলের জয়গান করে তিনি একজন দার্শনিক হিসেবে অমর হয়ে আছেন (আমিনুল, ২০১১)।

গতানুগতিক একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, দর্শনের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমান একজন দার্শনিক। ব্যাপক অর্থে শেখ মুজিবুর রহমান একজন চিন্তাশীল মানুষ, তাঁর সমগ্র চিন্তাকেই একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়। এই দার্শনিক ভিত্তিটি হলো— গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শন। তাঁর সমগ্র চিন্তা চেতনাতেই ছিল ন্যায়, সাম্য ও মানবতাবাদী দর্শনের আলোকে একটি কল্যাণধর্মী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দার্শনিক এই জন্য যে, হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির প্রতি শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলিত বাঙালিদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণমানুষের জন্য শোষণহীন বৈষম্যহীন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়েছেন। নিছক তাত্ত্বিক দর্শনের বলয় অতিক্রম করে শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সমসাময়িক দার্শনিকদের সাথে ছিল তাঁর সুসম্পর্ক, বিভিন্ন সময় তিনি বিজ্ঞ দার্শনিকদের মতামত ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। ছাত্রজীবনে কলকাতার বেকার হোস্টেলে থাকার সময় প্রখ্যাত দার্শনিক সাইদুর রহমান স্যারের সংস্পর্শে আসেন শেখ মুজিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক সাইদুর রহমান ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী, তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা ও মানবতাবাদে। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও আস্থাভাজন ছাত্র (প্রদীপ, ১৯৯৪)। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শে যে কয়জন শিক্ষকের প্রভাব পড়ে সাইদুর রহমান ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* তে ১৮, ৩৭ এবং ৭১ নং পৃষ্ঠায় প্রফেসর সাইদুর রহমান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তিনি বলেন: "বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন প্রফেসর সাইদুর রহমান সাহেব (বহু পরে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল হন) আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।..... শিক্ষকরা আমাকে সকলেই স্নেহ করতেন (মুজিবুর, ২০১২ : ১৮)। তিনি আরও বলেন:

> আমি অন্যায় আবদার করতাম না। তাই শিক্ষকরা আমার কথা শুনতেন। ছাত্ররাও আমাকে ভালবাসত। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, আমার অনেক অতিথি আসত।..... তিনি বললেন, "ঠিক আছে, দখল করে নাও। কোনো ছাত্র যেন নালিশ না করে।" বললাম, "কেউই কিছু বলবে না। দু'একজন আমার বিরুদ্ধে থাকলেও সাহস পাবে না (মুজিবুর, ২০১২ : ৩৭)।

বাঙালির রয়েছে দার্শনিক ঐতিহ্য আর সেই দার্শনিক ঐতিহ্যকে আরো বিকশিত ও গৌরবময় করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ দর্শন সমিতি' আয়োজনে ঢাকায় প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির তৎকালীন সভাপতি সাইদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল মিয়া বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং সম্মেলনকে সফল করার জন্য মানসিক ও আর্থিকভাবে অবদান রাখেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে

প্রকাশিত স্মরণিকার শুভেচ্ছা বাণীতে বঙ্গবন্ধুর তাঁর রাষ্ট্র ও জীবনদর্শন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ফুটিয়ে তোলেন এবং দেশ , জাতি ও জনগণের জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভ কামনার কথা প্রকাশ করেন (জলিল, ২০১৯)।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দর্শন, চিন্তা, চেতনা ও কর্ম দ্বারা অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, বাঙালি জাতিসত্তার লোকায়ত সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাকে বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে চালিত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁর জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শন তত্ত্বে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগ করে বিশ্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তাই শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রায়োগিক বাঙালি দার্শনিক।

ইতিহাস দর্শনের আলোকে বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ

বাঙালি জাতি একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন জাতি যার রয়েছে দার্শনিক ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র জীবনদর্শন। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বাঙালির জীবনদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে সহজ-সরল জীবন যাপন, বাঙালি সংস্কৃতি, জীবন সংগ্রাম ও মানবিকতা। বাংলার ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, বিস্তীর্ণ সমভূমি, নদীমাতৃক দেশ, বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সমন্বয় বাঙালি সংস্কৃতিকে করেছে অনন্য। বাঙালির দর্শন প্রায়োগিক দর্শন। এ দর্শন হচ্ছে সহজ-সরল সুন্দরভাবে আত্মসম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার দর্শন। তাই বাঙালির দর্শনচিন্তা ও ধর্মচিন্তায় একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, বস্তুবাদ ও প্রকৃতিবাদ (আমিনুল, ২০১১)।

ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা জাতিসত্তা নির্ণীত হয়। বাঙালির দর্শন বাঙালি সংস্কৃতির দর্শন। রক্ত সংকর বাঙালির মনন স্বতন্ত্র, ঐতিহ্য ভিন্ন ও সংস্কৃতি অনন্য। বাঙালির মননচর্চা ও জীবনদর্শনে প্রাচীনকালের সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুভূতিতে, মধ্যযুগের প্রগতিশীল ধর্মীয় আন্দোলনে, পুথিসাহিত্য ও প্রত্যাহিক জীবনচর্চায় এবং আধুনিক কালের উদারবাদী চিন্তা-চেতনা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো মানবতাবাদী ও সমন্বয় লক্ষ করা যায় (রমেন্দ্রনাথ , ১৯৯২)। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে বাঙালির নিজস্ব জীবনধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয় হয়ে মানবতাবাদী ও সমন্বয়ধর্মী ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

বাঙালি জীবনদর্শনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঙালি বিজাতি, বিভাষী ও বিদেশি শাসন কর্তৃক শাসিত হলেও নিজস্ব মনন সাধনার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বাংলার মানুষ নিজের মনের মতো না হলে কোনো কিছু গ্রহণ করে না। ভাবপ্রবণ বাঙালির মননশীল সাধনায় ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িকতা, উদারনৈতিকতা এবং সামাজিক জীবনযাত্রায় মানবিক মূল্যবোধে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সুদীর্ঘকাল ধরে যে ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা গড়ে তুলেছে তাকেই বাঙালি জীবন বলে অভিহিত করা হয় (সামসুজ্জামান, ২০১৯)। জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যাবলি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাঙালি পাশ্চাত্যের সাহায্য নিয়ে তার সঙ্গে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে উন্নততর কিছু করার চেষ্টা করেছে।

বাঙালির দর্শন চিন্তার ঐতিহ্যকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এবং সমকাল এভাবে কালপর্বে বিভক্ত করা যায়। ছ'শ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে পাঁচশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ধরে গ্রিস ও রোম এবং চীন ভারতবর্ষ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছিল। যাদের দর্শন চিন্তার ভিত্তি ছিল মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী দর্শন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের

পর প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে যায়, শুরু হয় মধ্যযুগ। মধ্যযুগের চিন্তা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক যাতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শনচর্চা, জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের (আমিনুল,২০০০)। রেনেসাঁ এক বিকাশমান প্রত্যয়। এর প্রভাবেই আধুনিকতার সূত্রপাত হয় এবং মানবতাবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, উপযোগবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদসহ নানা তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে। Bertrand Russell তাঁর *History of Western Philosophy* গ্রন্থে বলেন:

> The Renaissance was not a period of great achievement in philosophy, but it did certain things which were essential preliminaries to the greatness of the seventeenth century. In the first place, it broke down the rigid scholastic system, which had become an intellectual strait jacket. It revived the study of Plato, and thereby demanded at least so much independent thought as was required for choosing between him and Aristotle. (Russell. 1965 : 487)

অর্থাৎ রেনেসাঁর প্রভাবে ধ্রুপদী কালের সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলসহ কিছু কালজয়ী দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের চিন্তাধারার ভিত্তি ছিল মুক্তবুদ্ধি ও বুদ্ধিবাদী দর্শন। ফলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের পথ উন্মোচিত হয়েছিল।

রেনেসাঁর প্রথম সূত্রপাত ঘটেছে ইতালির বিভিন্ন নগরীতে এবং ফ্লোরেন্স নগরী ছিল রেনেসাঁর কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীকালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ সমগ্র ইউরোপ এবং ধাপে ধাপে রেনেসাঁ সকল মহাদেশ, জাতি, বিভিন্ন ভাষায় বিকশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন বাংলায় প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালির মননে ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে যুক্তি ও বুদ্ধিচর্চা, মানবীয় কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটেছিল সেটাই 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' বা বাংলার নবজাগরণ নামে পরিচিত (অনুপম, ২০১১)। বাংলার রেনেসাঁর মূল প্রেরণা ছিল স্বাধীন-চেতনা এবং যুক্তির আলোকে সমাজ পরিবর্তন। এই নবজাগরণের মধ্য দিয়েই বাংলায় আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব ঘটেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার আত্মিক জগতে, মননের জগতে যে রেনেসাঁরে সূত্রপাত হয় বাংলার সেই প্রাণপুরুষদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের ধারা পরিলক্ষিত হয় (সালাহউদ্দিন, ২০১৬)। বাংলার রেনেসাঁয় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে। এ সকল মনীষীরা তাঁদের চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করেছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে লৌকিক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির যে রেনেসাঁ-র সূচনা হয়েছিল তা থেকেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

বাঙালির প্রকৃত জাতীয়তাবাদ বা জাতিসত্তাবোধের সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তা হয়েছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের প্রত্যয়ে। বাঙালিকে যখন রাষ্ট্রীয় ভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হলো, তখনই বাঙালি দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আত্মত্যাগ করে, এটা বাঙালি সংস্কৃতির অমিয় শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ লুকায়িত ছিল এবং এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শনে দীক্ষিত হয়ে, দ্বিজাতিতত্ত্বের মায়াজাল ছিন্ন করে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিকাশের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে, বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। অসীম সাহসিকতা, সততা, বাঙালি জাতীয়তাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিকতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন মুক্তিকামী বাঙালির দিশারী, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। ৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার পর্যায়ে উন্নীত হন। উনসত্তর থেকে একাত্তরের মধ্যে তিনি স্বাধীনতাকামী বাঙালির নেতা ও বঙ্গবন্ধু হন (আনোয়ার, ২০০০)।

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঙালিত্ব। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন:

> একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্ন টুকুর চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে।..... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।.....জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করেতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৬/১২/১৯৬৯)।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশেনে বঙ্গবন্ধু বলেন:

> আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাবো। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি, আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরবো, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ তোমাদের মনে রাখতে হবে (সূত্র: আনু, ২০১৭: ২৭৭)।

বাঙালি, বাংলাভাষা, বাংলার মাটি ও গণমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেন:

> আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান।.... ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও (সূত্র: আনু, ২০১৭ : ১৭১)।

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে বাঙালি জাতির উন্মেষ ঘটানো এবং বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠা করা (সালাহ্উদ্দিন, ২০১৬)। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ধাপে ধাপে আমাদেরকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮-৫২ সময়পর্বে ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়, ১৯৭১ এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র গঠন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণ করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় এবং বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালির জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জন বাঙালি জাতিসত্তাকে জাতীয়তাবাদে পরিণত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। আর এ অর্জনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাই তিনি জাতির জনক এবং হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি (আনোয়ার, ২০০০)।

মুক্তিযুদ্ধের দর্শনের প্রেক্ষাপট ছিল বাঙালির জীবনদর্শন, হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান আন্দোলন ১৯৪০, ১৯৪৬-৪৭ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৪৮-১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস বঙ্গবন্ধুর নামে বাঙালি যুদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দর্শন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্থপতি (হাবিবুর, ১৯৯৬)।

মূলত 'বাঙালি' 'বঙ্গবন্ধু' 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং 'বাংলাদেশ'— এ চারটি দার্শনিক প্রত্যয় এক ও অভিন্ন সত্তার সংমিশ্রণ। একটিকে বিশ্লেষণ করলে আরেকটি পাওয়া যায়। বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি ছিলো বঙ্গবন্ধুর চেতনা জুড়ে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অবিচ্ছিন্ন সত্তার নাম। বাংলাদেশের ইতিহাস, বাঙালিত্ব এবং বঙ্গবন্ধু এক পরমসত্তা। সুতরাং ইতিহাসের দর্শন বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন।

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শন— গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদ

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শনের মূলে ছিল বাংলার গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শন। মানুষই ছিল তাঁর সমগ্র দর্শন চিন্তার মূলে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, শিক্ষাদর্শন, উন্নয়ন দর্শন, অর্থনৈতিক দর্শন, নৈতিক ভাবনা, নান্দনিক ভাবনাসহ সমগ্র চিন্তা-চেতনার মূলে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*' র শুরুতেই বঙ্গবন্ধু বলেন:

> As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, which gives meaning to my politics and to my very being. (Sheikh Mujibur Rahman. 30.05.1973)
>
> একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস

> ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিকে অর্থবহ করে তোলে (মুজিবুর, ২০১২ : v)।

শেখ মুজিবুর রহমানের এই উক্তির মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, বাঙালিত্ব, গণমানুষের প্রতি ভালোবাসার দর্শন ও মানবতাবাদী দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে।

মানবতাবাদ একটি দার্শনিক মতবাদ, যার অধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ মতবাদটির লক্ষ্য হচ্ছে জগতে মানুষের মুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা। মানবতাবাদী চিন্তা শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগেরাস বলেন– "Man is the measure of all things." অর্থাৎ 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি'। সে নিরিখে মানুষই হচ্ছে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। মানবতাবাদের মূল বক্তব্যই হচ্ছে— মানুষের প্রতি ভালোবাসা বা মানুষের মঙ্গল করা। এ দার্শনিক মতবাদ মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে বুঝায়, যে দর্শন মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও মানবকল্যাণের মাধ্যমে মানবিক বিশ্ব গঠনের কথা বলে। Corliss Lamont এর মতে-"it is a philosophy of joyous service for the greater good of all humanity in this natural world and advocating the methods of reason, science, and democracy (Lamont, 1997 : 13)." এ দর্শন এমন এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা মানবিক নীতি ও বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে। কোন অতি প্রাকৃত সত্তা নয় বরং যুক্তি, বিজ্ঞান, গণতন্ত্র অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিক বিষয় সম্পর্কিত।

ভারতীয় দর্শন ও বাঙালির দর্শনে মানবতাবাদের চর্চা বহুকাল আগে থেকেই। মানবতাবাদের দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়: একটি হলো নিরীশ্বরবাদী এবং অপরটি হলো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবতাবাদ কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক কিংবা বস্তুবাদী ছিল না। তাঁর মানবতাবাদের মূলে ছিল গণমানুষের মুক্তি ও মানবকল্যাণ। শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনে মানুষের প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে স্বদেশপ্রেম, মানবতাবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল। একই গ্রামের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সামাজিক জীবনযাপন তাঁকে মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দীক্ষা যুগিয়েছে। '*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'-তে তিনি বলেন: "আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ" (মুজিবুর, ২০১২ : ১৯১)। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উঁচু-নিচু সবাইকে তিনি মানুষ ভাবতেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- চণ্ডীদাসের এই উক্তিই বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙালি জাতির আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে জন্ম নেয়া শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ছিলেন আপোসহীন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কোন প্রকার বৈষয়িক লোভ, লালসা, প্রলোভন তাকে গণমানুষের অধিকার আদায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বাঙালির মুক্তির জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরের মধ্যে ১২ বছরের বেশি সময় কেটেছে তাঁর জেলে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের এতগুলো বছর তিনি বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কারাগারে প্রতিটি দিন উৎসর্গ করেছেন একটি স্বপ্ন ও দর্শনকে ধারণ করে সেটি হলো বাংলার গণমানুষের মুক্তি। জেল, জুলুম, হুলিয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তির মন্ত্র ছড়িয়েছেন। '*কারাগারের*

রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন বৈষম্যহীনতার চর্চার কথা। তিনি বলেন: "শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম হয়েই থাকে এবং হবেও। শোষকদের কোন জাত নাই, ধর্ম নাই (মুজিবুর, ২০১৭ : ১৮৭)"। ব্রিটিশদের দীর্ঘ দুই শত বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ বাঙালিকে একটি শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবিক ও আদর্শ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙালির মুক্তি আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্তর্গত, সে আন্দোলনের অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা। ১৯৭১ এর ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিতর্কের সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ইয়াকফ মালিক বলেছিলেন, বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আরেকটি প্রকাশ, এর আর কোনো পরিচয় নেই। এ গণমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব (ফেরদৌস, ২০২০)।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণ করেন, যার অভিজ্ঞতা ১৯৫৪ সালে কারাবন্দি থাকাকালে 'আমার দেখা নয়াচীন' স্মৃতিনির্ভর ভ্রমণকাহিনি রচনা করেন। এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গভীর পরিচয় মেলে। বিপ্লবের পর সামাজিক ক্ষেত্রে যে একটা পরিবর্তন আসে তা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে দেশ কিভাবে পরিচালিত করা যায় তা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাকে সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে তিনি তৈরি করবেন দক্ষ মানবসম্পদ আর যারা হবে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান সুশিক্ষিত নাগরিক। *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে তিনি বলেন: "আইন করে কোনো অন্যায় কাজই বন্ধ করা যায় না, অন্যায় বন্ধ করতে হলে চাই সুষ্ঠু সামাজিক কর্মপন্থা, অর্থনৈতিক সংস্কার ও নৈতিক পরিবর্তন" (মুজিবুর, ২০২০: ৯৯)।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় দশ লক্ষ জনতার সামনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মহাকাব্যিক ভাষণে বলেন: "এবারের আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"। এ ভাষণে তিনি বাঙালির জন্য কেবল স্বাধীনতা চাননি, মুক্তিও চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা'- প্রত্যয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থবহন করে। বঙ্গবন্ধু পুরো ভাষণে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একবার, অন্যদিকে 'মুক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন চারবার (মীজানুর, ২০১৬)। ৭ মার্চের এ ঐতিহাসিক ভাষণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল গণমুক্তির চেতনায়। গণমানুষের মুক্তি বলতে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করে; সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদসহ সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়সহ বিশ্ব মানবতার মুক্তির বিষয়কে বুঝায়।

শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬-র ৬ দফা, ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির ভাষণ এবং গণপরিষদে ৪ নভেম্বরের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির গণমুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান গ্রহণ উপলক্ষ্যে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালির গণমুক্তির অধ্যায়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতি— জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: "এই যে চারটা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হল, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি"(হাসিনা, ২০১৫:

৪৩)। গণমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১)-এ বলা হয়েছে-'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে'।

শেখ মুজিবুর রহমানের গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শনের মৌলিক আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক শোষণ-বৈষম্যহীন মানবিক জাতিরাষ্ট্র গঠন করা।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আদি বঙ্গদেশে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ভিত্তিতেই বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাঙালির রয়েছে দর্শনচিন্তার ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস। বাঙালির দর্শনচিন্তা ও মননসাধনায় মানবপ্রেম এবং মানবতাবাদ প্রাধান্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। বাংলা ভাষা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা জুড়ে। দর্শনের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক অর্থে তিনি একজন বাঙালি দার্শনিক। শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক ভাবনা, শিক্ষাচিন্তা, জগত ও জীবন ভাবনার সমষ্টিই তাঁর দর্শন। তাঁর সকল দর্শনচিন্তার মূলে ছিল মানবপ্রেম ও মানবকল্যাণ। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের মূলে ছিল বাংলার গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদ। যা বাংলার শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের ন্যায্য অধিকার, সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার দর্শন। বঙ্গবন্ধুর গণমানুষের মুক্তির মানবতাবাদী দর্শন, অসীম সাহসিকতা, প্রবল দেশপ্রেম, আপোসহীনতা ও গণমানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে পুরো বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। যে অনন্য বৈশিষ্ট্য শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিবিদ থেকে পৃথক করেছিল তা হলো পাকিস্তানি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি। তাছাড়া স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সকল প্রকার শোষণ ও বৈষম্যের বিপরীতে বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের দর্শন প্রবর্তন করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির জনক, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা এবং বাঙালি দার্শনিক।

উল্লেখপঞ্জি

অতুল সুর (২০১৮)। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*। কলকাতা: সাহিত্য লোক

অনুপম সেন (২০১১)। *বাংলাদেশ ও বাঙালি রেনেসাঁস স্বাধীনচিন্তা ও অনুসন্ধান*। ঢাকা: অবসর

ড. আনিসুজ্জামান (২০১২)। *বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী

আমিনুল ইসলাম (২০১১)। *বাঙালির দর্শন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

— (২০০০)। *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

আনু মাহমুদ [সম্পাদিত] (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*। ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিকেশন

আবদুল জলিল মিয়া (২০১৯)। *বঙ্গবন্ধু: রাজনীতি ও দর্শন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

আহমদ শরীফ (২০১৬)। *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*। ঢাকা: মহাকাল প্রকাশনী

এম. মতিউর রহমান (২০১৫)। *বাঙালির দর্শন: প্রাচীন যুগ*। ঢাকা: অবসর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (এপ্রিল, ২০১৬)। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

নীহার রঞ্জন রায় (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। কলকাতা: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*

প্রদীপ রায় (১৯৯৪)। সাইদুর রহমান: জীবন ও দর্শন। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, শরীফ হারুন [সম্পাদিত], ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মীজানুর রহমান (২০১৬)। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: বাঙালি জাতির মুখবন্ধ। *জয়তু বঙ্গবন্ধু*, মোহাম্মদ সেলিম [সম্পাদিত], ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নীলদল

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯৯৬)। ইতিহাস দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একটি বিশ্লেষণ। এম.এ. কাসেম [সম্পাদিত], *দর্শন ও প্রগতি*, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, জুন- ডিসেম্বর ১৯৯৬, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রমেশচন্দ্র মজুমদার (২০০৫)। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯৯২)। *বাঙালীর দার্শনিক আদর্শ: সামাজিক মানবতাবাদ*। দেব স্মারক বক্তৃতামালা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রশীদুল আলম (২০১৫)। বাংলাদেশ দর্শনের চরিত্র। *বাঙালির দর্শন: প্রাচীন যুগ*, ড. এম মতিউর রহমান [সম্পাদিত], ঢাকা: অবসর

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

— (২০১৭)। কারাগারের রোজনামচা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

— (২০২০)। *আমার দেখা নয়াচীন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ [সম্পাদিত] (২০১৫)। *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

শরীফ হারুন [সম্পাদিত] (১৯৯৪)। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সামসুজ্জামান খান (২০১৯)। *শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা*। ঢাকা: কথা প্রকাশ

সালাহ্উদ্দিন আহ্মদ (২০১৬)। *ইতিহাসের সন্ধানে*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০০০)। *বঙ্গবন্ধু নেতা ও নেতৃত্ব*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

হাসান ফেরদৌস (০৭.০২.২০২০)। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন হোক জাতীয় সেবা দিবস, *দৈনিক প্রথম আলো*

Bertrand Russell (1965). *History of Western Philosophy*. George Allen and Unwin, London.

Corliss Lamont (1997). *The Philosophy of Humanism*. Humanist Press, New York.

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের অন্যতম সু-শাসন নীতি ‘সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম’: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

শামীমা নাছরিন*

Abstract : The 'Satta Aparihānīiya Dharma' is one of the most important teachings of the Buddha. Briji janapada (town) is one of the sixteen mahājanapadas of ancient India. And the residents living in Briji janapada (town) are the Briji nation. Those who thoroughly analysed the precepts of the 'Satta Aparihānīiya Dharma' given by the Buddha unitedly followed the rules. It was said that as long as the Brijis obeyed these rules, no one could defeat them and that nation would never be defeated except by beauty enhancement. Without resorting to diplomatic alliances, the Brijis would remain invincible. Holding and nurturing them will be very beneficial and beneficial in terms of stability, development and unity of individual, family, society and world. Those who strive to practice the seven rules are assured of growth. It goes without saying that these good governance policies have an important role in shaping the present society, nation and country. They just need understanding and practice. There is no doubt that auspiciousness is assured.

ভূমিকা

‘সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম’ বুদ্ধের নির্দেশিত অন্যতম শিক্ষনীয় উপদেশ। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে ব্যক্তি ও সমাজের একতা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং স্বধর্মের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সংরক্ষণের এক বিশেষ রূপরেখা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া মানুষকে সৎ, জ্ঞানী, উন্নত ও আলোকিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে সুন্দর ও সুগম করে। বিধিবদ্ধ নীতি অনুসারেই তারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করে। এটি বিশ্ব মানবের প্রতি বুদ্ধের অমূল্য ও অনুকরনীয় উপদেশ। মানুষ তথা মানবজাতির এগিয়ে চলার অন্যতম শক্তি হচ্ছে ‘সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম’। বিধিবদ্ধ নীতিগুলো যদি মানুষ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে তাহলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আর সফলতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানব সমাজ এক মহা স্বাচ্ছন্দ্যময়, সমৃদ্ধশালী এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে যা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নিচে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের অন্যতম সু-শাসন নীতি ‘সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম’-এর একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো :

১. সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের উৎস

বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম সমৃদ্ধশালী নগরী বৈশালীতে এক সময় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও অমানুষ্যের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। তখন বৈশালীর লিচ্ছবিরাজ স্বীয় মন্ত্রণালয়ে সকল

* সহকারী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজাদের সম্মিলিত করে কী উপায়ে এই ত্রিবিধ ভয় উপশম করা যায় তা আলোচনা করতে লাগলেন। অতঃপর বুদ্ধের কথা তাদের মনে পড়ল। তাদের কাতর অনুরোধে বুদ্ধ বৈশালী নগরে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে নগরীর পঁচা শবাদি সমস্ত ময়লা গঙ্গার প্রবল স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অতঃপর বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বৈশালীর চর্তুদিকে 'রতন সূত্র' পাঠ করতে আদেশ করিলেন। আনন্দ স্থবিরের রতন সূত্র পাঠ সমাপ্ত হলে সত্যবাক্য ও সত্যক্রিয়ায়[১]। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিসহ সকল প্রকার উপদ্রব দূরীভূত হয়েছিল। বৈশালীবাসিগণ এই স্মৃতি ধরে রাখার জন্য উদেন, গৌতম, সত্তম্বক, বহুপুত্রক, সারন্দদ, চাপাল এবং মহাবন প্রভৃতি স্থানে চৈত্য[২] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায়ে মহাপরিনির্বাণ সূত্র মতে, একদা তথাকার 'সারন্দদ চৈত্য' বুদ্ধ বৃজিদের[৩] সম্মিলিত করে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। বৃজিগণ বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করে প্রাচীন ভারতে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছেন। এছাড়াও সামাজিক সংহতি, ঐক্য, অপরিবর্তনীয়, নিখুঁত রাখার জন্য গৌতম বুদ্ধ কোসাম্বী সূত্রে ছয়টি বিষয়ে সকলকে সবসময় মনোযোগী থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ছয়টি বিষয় হলো: ১. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে মৈত্রীসূচক আচরণ করা, ২. প্রকাশ্যে ও গোপনে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীসূলভ বাক্যালাপ করা, ৩. প্রকাশ্যে ও গোপনে সকলের (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) প্রতি সমভাবে আন্তরিকতা পোষণ করা, ৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে সমবণ্টন নীতি অনুসরণ করা, ৫. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎবুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করা, ৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে একে অন্যকে নির্দোষ ও গৌরবকর জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ করা (শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া ও বিনয়েন্দ্রনাথ, ২০১৮ : ৪১৬)। মজঝিম নিকায়, সূত্রপিটক এছাড়াও প্রথম প্রিয়ভাষিতা সূত্রে বলা হয়েছে, এ সপ্তধর্ম ভিক্ষুকে অপরিহানির পথে উপনীত করে বুদ্ধের প্রতি গৌরব, ধর্মের প্রতি গৌরব, সংঘের প্রতি গৌরব, শিক্ষার প্রতি গৌরব, সমাধির প্রতি গৌরব, সুবাধ্যতা ও কল্যাণমিত্রতা সাধিত হবে (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ১১৪)।

২. সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম

'সপ্ত' অর্থ সাত ও 'পরিহানীয়' শব্দের অর্থ ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ, অবনতির কারণ ও হানিকর। 'পরিহানীয় ধর্ম' অর্থ ধ্বংসের অবস্থা বা পরিহানীয় নীতিসমূহ (শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, ২০০৮ : ১০৪৭)। যেমন সপ্ত বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানি ঘটায় কর্মারামতা (পার্থিব বিষয়ে আনন্দ গ্রহণ), ভস্সারামতা (আলাপ প্রিয়তা), নিদ্ররামতা (নিদ্রাপ্রিয়তা), জনসঙ্গারামতা (সঙ্গপ্রিয়তা), ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার (ইন্দ্রিয়দ্বারে অসংযম), ভোজনে মাত্রাহীনতা ও সংঘের সংঘকরণীয় যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো ভিক্ষুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় না (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ১১০)। পরিহানীয় শব্দের সাথে 'অ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে অপরিহানীয় শব্দটি গঠিত। অপরিহানীয় শব্দের অর্থ ক্ষতিকারক বা ধ্বংসাত্মক নয় এমন, লাভজনক, অবনতি হয় না এমন বা উন্নতিশীল (শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, ২০০৮ : ১৪৭)। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম হচ্ছে সাতটি অপরিহানীকর উপদেশ বা নিয়ম। আর সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম হচ্ছে বৃজিদের সংহতি শক্তির উৎস। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

২.১. একতার শক্তি

সভা-সমিতির মাধ্যমে যারা সবসময় একত্র হয় তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৪)। অর্থাৎ সভা-সমিতিতে সবাই একত্র হয়ে সুনির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মত প্রদান করলেই

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ চরম উৎকর্ষ লাভ হয়। ফলে তাদের সমস্ত কার্যক্রম গতিশীল থাকে। একই সাথে ব্যক্তি ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়। কথিত আছে, একতার শক্তি অপরিসীম (Unity is strength)। অনৈক্য বা একতাহীনতা সকল বিড়ম্বনার মূল উৎস। একজন একাকী মানুষ অতি সামান্য ব্যক্তি মাত্র। তার শক্তি-সামর্থ্য খুবই নগণ্য। মানুষের মধ্যে একতা থাকলে একে অন্যের বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে বলা যায়, কোনো দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একতার বা ঐক্যের অভাব থাকলে যে কোনো সময় সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধিকল্পে প্রত্যেক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করা উচিত। একতাবদ্ধ শক্তির কাছে অন্যায় ও অসত্য অনায়াসে দূরীভূত হয়। যেমন- ক্ষুদ্র কীট মৌমাছি, উঁইপোকা, পিপঁড়া প্রভৃতিও দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মতের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *শিক্ষা* গ্রন্থে বলেছেন, মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্য দলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়ে তারা কোন কালে লোপ পেয়েছে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৫ : ১৮৩)।

তাই বলা যায়, সমাজ জীবনে কল্যাণের জন্য একতা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের সকল সাফল্য, অগ্রযাত্রা ও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে রয়েছে একতা। সবাই মিলে কাজ করলে অত্যন্ত কঠিন কাজও সহজ হয়ে পড়ে। বর্তমান অবস্থায় ঐক্য ও মৈত্রী পরস্পরের মধ্যে বজায় থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হবে। আর বিভেদ জাতিকে পঙ্গু করে, উন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করে। তাই সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দলমত নির্বিশেষে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় একতাবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২.২. সভা সমিতিতে একতাবদ্ধভাবে গমনাগমন

যারা একতাবদ্ধভাবে সভা-সমিতিতে আগমন করে এবং সভা শেষ হলে এক সঙ্গে চলে যায় ও একইসাথে কোনো রকম নতুন কিছু করার কারণ ঘটলে সবাই মিলিতভাবে করে তাদের সব সময় উন্নতি হয়। একইসাথে অবনতির পথ বন্ধ হয়ে যায় (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৫)। মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সকলের মঙ্গল কামনায় বলীয়ান হলে অপশক্তির ক্রমশ বিলুপ্তি ঘটে। যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের লক্ষ্য অর্জন স্পষ্টভাবে অবধারিত ও সুষমামণ্ডিত হয়। একটি রাজ্য সুসংগঠিত করতে হলে প্রয়োজন : ১. একতাবদ্ধভাবে সহবস্থান করা, ২. সংঘবদ্ধ হওয়া, ৩. মতামত পোষণ করা, ৪. পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা, ৫. একে অপরের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, ৬. পরস্পরকে সদুপদেশ প্রদান করা, ৭. উপদেশ দানের মধ্যে কল্যাণ কামনা করা ও ৮. সহানুভূতি ও ভালবাসার মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। ফলে অনেক কিছু সৃষ্টি করা যায়। এছাড়াও দেখা যায় বৃজি রাজ্য সময়ে সময়ে মতভেদ হলে সভাগৃহে বেশ তর্কাতর্কি হতো এবং শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। তাই আপন শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সততা ও সংযমশীলতার চর্চা বৃজিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ধর্মপদে বুদ্ধের উপদেশ বাণীতে

আছে, সর্বদা সচেতন, সতর্ক ও জাগ্রত থাকা অপরিহানি বা অমৃতের পথ আর অসতর্কতা, অচেতনতা ও উদাসীনতা পরিহানি বা ধ্বংসের পথ (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ২৫)। ঐক্য বিনষ্টকারী যেমন হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক আচরণ এসব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে সকলের সাথে সম্প্রীতিমূলক আচরণ করা উচিত। তাহলে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের মাধ্যমেই চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছানো সম্ভব। একা কোন ব্যক্তির পক্ষে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পতন অনিবার্য।

২.৩. প্রাচীন সুনীতি রক্ষা

যারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো রকম দুর্নীতি চালু করে না, আগের সুনীতি বাদ দেয় না বরং প্রাচীন নীতিগুলো সঠিকভাবে পালন করে সবসময় তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অবনতির পথ বন্ধ হয়ে যায় (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৫)। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতিনীতি দ্বারা মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। আর সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণকে বলে দুর্নীতি। দুর্নীতি উন্নতির প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি মূর্তিমান অভিশাপ হিসেবে বিরাজ করে উন্নতির ক্ষেত্রে মারাত্মক অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। সুনীতি অর্থ উৎকৃষ্ট নীতি বা সৎনীতি। আর সুনীতি হচ্ছে পরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় উত্তরণ। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতির বিন্দুমাত্রও অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলে সুশাসন অক্ষুণ্ন থাকে। ন্যায়নীতি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন পরিচালিত হলে জনজীবনে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটে না। এতে রাজ্যে প্রশান্তি বিরাজ করে ও মানুষ এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করে। যেহেতু সুনীতি সুশাসনের পূর্বশর্ত। আর রাষ্ট্রনিয়ম যেহেতু ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয় বৃজিগণ যখন থেকে জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। সেজন্যই বৃজি গণতন্ত্র অনেক দিন ধরে অক্ষুন্ন ছিল। আর সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হলে জাতির উন্নতি সহজ হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে তার পিছনে কাজ করেছে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যদিকে জাতীয় জীবনে যদি দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে তবে সে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যায় ও দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। *ধম্মপদে* উক্ত হয়েছে,

> অকতং দুক্কতং সেয্যো, পচ্ছা তপতি দুক্কতং
> কতঞ্চ সুকতং সেয্যো যং কত্বা নানুতপ্পতি।
> (শ্রী শান্তরক্ষিত স্থবির, ১৯৫৪: ১১২)

অর্থাৎ, দুষ্কর্ম না করাই শ্রেয়; কারণ দুষ্কর্ম পশ্চাতে অনুতাপ দেয়; তেমনি সৎকর্ম করাই শ্রেয়; যা করে পরে অনুতাপ করতে হয় না।

ধনঞ্জানি সূত্রে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন, নিরপেক্ষ, নিরপরাধ ও পূণ্য পথে থেকে করণীয় জগতে বহু কর্মই আছে যা সম্পাদন করা উচিত। পাপপথ বর্জন করে এই পূণ্যপথকে অনুসরণ করতে হবে (শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া ও বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, ২০১৮ : ৭৮১-৭৮৭)। প্রাচীনকালের বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থার ধরন জাতক সাহিত্য মধ্যে পাওয়া যায়। বুদ্ধ বৃজিদের শাসন

ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। কারণ তারা একতাবদ্ধ হয়ে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন। এতে রাজা প্রজা সকলে শান্তিতে অবস্থান করেন। সেনাপতি, পুরোহিত এবং উপরাজার মতো ব্যক্তিদেরও বিচার করতে দেখা যায় ধম্মধ্বজ জাতক (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৪১৯ : ১১৭-১২৩) ও খণ্ডহাল জাতকে (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৪২২ : ৭৪-৯০)। রাজাই একমাত্র প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারতেন। আইন বিধি অনুসারে অন্য কেউ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডাদেশ দিতে পারতেন না। মহাশীলবজ্ জাতকে (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৪১৯ : ৯৬-১০০) দেখা যায় প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে কখনও জীবিতাবস্থায় গর্তে প্রোথিত করে; কখনও শূল নিক্ষেপ করে (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৪১৯ : ২৩১-২৩২) দণ্ড কার্যকর করত। বুদ্ধ বিচার ও দণ্ডদানে নিরপেক্ষতার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। *ধম্মপদ* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

সুখ কামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,
অত্তনো সুখ মেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।
সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি,
অত্তনো সুখমে সানো পেচ্চ সো লভতে সুখং।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৫৬)

অর্থাৎ, নিজের সুখের জন্য যে সুখাকাঙ্ক্ষী অন্য জীবকে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে, পরকালে সে কখনও সুখ পায় না।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় তার কর্মে। আর ন্যায়-অন্যায় নিয়েই মানুষের কর্মজীবন। ন্যায়-নিষ্ঠা সর্বদাই প্রশংসা পেয়ে থাকে। অপরদিকে অন্যায়কারী হয় দণ্ডিত। কিন্তু বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হয় অপরাধ নিন্দনীয়। সত্যিকার ধার্মিক বিচারক সমদর্শী, ন্যায় ও সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হন না। বিচরাসনে বসে স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষাবলম্বন করে কিংবা আসক্তিগ্রস্ত হয়ে ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলে রায় প্রদান করেন না। তিনি সত্য মিথ্যা এবং ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করে মোহের ঊর্ধ্বে থেকে অপরাধীকে শাস্তি এবং নিরপরাধকে স্বস্তি প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষতার সাথে সহানুভূতির মাত্রা যোগ হলেই বিচার মানবিকতার রূপ পায়, এর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। বুদ্ধের উপদেশ বাণীতে বলা হয়েছে, যিনি বিচারে (রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়'বশত) পক্ষপাতিত্ব করেন তিনি প্রকৃত ধার্মিক ন্যায় বিচারক হতে পারেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক নিশ্চিত হয়ে বিচার করেন। যিনি ন্যায়, ধর্ম ও সাম্যের সমদর্শী হয়ে অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ন্যায়-ধর্মের রক্ষক, বুদ্ধিমান ও সুবিচারক বলে উক্ত হন (শ্রী শান্তরক্ষিত স্থবির, ১৯৫৪: ৯৩)।

তাই চারিত্রিক নীতি-আদর্শ প্রত্যেক মানুষের জীবনে অনুসৃত হলে এর মহিমা অবশ্যই সমাজ ও রাষ্ট্রে পড়বে। যা সুনীতিসম্পন্ন অপরাধশূন্য স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে।

২.৪. বয়োবৃদ্ধদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা

মহাপরিনিব্বান সুত্তে পরিহানি থেকে রক্ষা পেতে বয়োবৃদ্ধদের সাথে যা যা করতে বলা হয়েছে: ১. মৃতব্যক্তিদের সৎকার করা, ২. তাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা, ৩. সম্মান ও পূজা করা এবং ৪. তাদের আদেশ পালন করা। যারা এ কাজটি করবে তাদের পারিবারিক জীবনে সবসময় উন্নতি

হবে কিন্তু পরিহানি ঘটবে না (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৬)। বড়দের সর্বদা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করা একটি নৈতিক গুণ। যে ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে এবং তাঁদের কাজে নিজেকে সবসময় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে জীবনের সার্থকতা সেখানেই। কারণ বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধরা স্বভাবতই নীতিজ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাঁদের সদুপদেশ মেনে চলা ছোটদের অবশ্যই কর্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ ও প্রতিপালনে শ্রদ্ধাশীল হওয়া। সুসংবদ্ধ ব্যক্তি সমাজের মহত্তম সমৃদ্ধির নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন। প্রত্যেকের উচিত তাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। তাদেরকে কখনো অবহেলা করা যাবে না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়াই সত্যের বাণী। পরোপকার সহিষ্ণুতা অহিংসা প্রভৃতি নৈতিক গুণ গুলো যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। আর বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তিকর পরিবেশ বজায় রাখে। এছাড়াও সিংগালোবাদ সূত্রে বলা হয়েছে, ১. ভক্তি সহকারে তাঁদের সেবা করা, ২. তাঁদের উপকারের জন্য বলা, ৩. অন্তরে তাঁদের হিতকামনা করা, ৪. তাঁদের জন্য অবারিত দ্বার রাখা ও ৫. অন্ন-বস্ত্রাদি প্রদান করা (ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও বীরেন্দ্র মৎসুদ্দি, ১৯৩৬ : ১৫২)।

২.৫. অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারীর সম্মান

অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারীদের সম্মান প্রদান প্রসঙ্গে মহাপরিনিব্বান সুত্তে উল্লেখ করা হয়েছে, ১. পরের কুলবধূ ও কুলকুমারী মেয়েদের জোর করে ধরে এনে নিজের ঘরে বেঁধে না রাখা ও ২. তাদের প্রতি কখনও সেরকম কোনো অন্যায় আচরণ না করা। যারা এ কাজটি করবে তাদের জীবনে শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে ও অবনতির পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৬)। যারা ঘরের বউ ও কুমারী মেয়েদের সাথে কাঙ্ক্ষিত ব্যবহারের পরিবর্তে অভদ্রোচিত ব্যবহার করে তাদেরকে কখনই মানুষ সুনজরে দেখবে না। সমাজে সে হবে নিন্দিত। জীবন চলার পথে সকল মানুষের সাথে মার্জিত ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করতে হয়। তাহলে জীবন অনেক সুন্দর হয়। আর নারীদের মর্যাদা রক্ষা করা এক অপরিহার্য দায়িত্ব। সিগালকোবাদ সূত্রে বলা হয়েছে, নারীদের সম্মান করা, কখনো তাঁদের প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার না করা, বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব দেওয়া এবং সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালংকার প্রদান করা (ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও বীরেন্দ্র মৎসুদ্দি, ১৯৩৬ : ১৫১-১৫২)। আটটি গুণের দ্বারা মেয়েরা গুণবতী হয় যা স্বর্গ লাভের অন্যতম সোপান হিসেবে কাজ করে। যেমন- ১. পরিবারের কাজকর্ম সুসংহতভাবে সম্পাদন করে, ২. কর্মচারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, ৩. স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, ৪. স্বামীর সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষা করে, ৫. ধর্মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ৬. শীলসম্পন্ন হওয়া, ৭. দয়ালু হওয়া এবং ৮. প্রজ্ঞাবান হওয়া (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ৩১৯-৩২১)। গৌতম বুদ্ধ নারীদের যথাযথ অধিকার দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। সংযুক্ত নিকায়ের কোসল সংযুক্তে উল্লেখ আছে, তখনকার সমাজে মেয়ে শিশু জন্মের চেয়ে ছেলে শিশুর জন্মে অধিকতর আনন্দদায়ক বিবেচিত হতো। একে বুদ্ধ হীনমন্যতা হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, সামাজিক সৌহার্দ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে মেয়েরা অগ্রগণ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পরিবারে মেয়েরা অধিক ভালোবাসা পায় এবং মেয়েদের দ্বারা পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তিনি আরও বলেন, লিঙ্গ কোনো বিষয় নয়, চরিত্রই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এমনকি মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি অবদান রাখে। একজন মেয়ে অনেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। তিনি মেধাবি, শীলবতী, শ্বশুর-শাশুড়ি সেবা, পতিব্রতা হয়ে নিজেকে গড়ে তুলে, সুন্দরভাবে নিজের সন্তানকেও গড়ে তুলে এবং এরকম ভাগ্যবতীর পুত্র সুন্দরভাবে রাজ্য অনুশাসন করে (ড. সুকোমল বড়ুয়া, ১৯৯৮ : ১৪-২১)। সুতরাং নারীকে কখনো নারী হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে গণ্য করে যথোপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। তাহলেই সমাজ সুন্দর ও সুশোভিত রূপে বিরাজিত থাকে।

২.৬. পূজনীয় স্থানকে সম্মান করা

যারা গ্রামের বাহিরে বা ভিতরে পূর্বপুরুষদের নির্মিত চৈত্য যথাযথভাবে সংস্কার সাধন করে রীতিমত পূজা করে এবং সে সমস্ত চৈত্যের জন্য পূর্বপুরুষরা যে ধন-সম্পদ রেখে গেছেন তা তার জন্য ব্যয় করে থাকে গার্হস্থ্য জীবনে তাদের সর্বদা উন্নতি হয়ে থাকে কখনও অবনতি হয় না (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৭)। পূর্বপুরুষদের দানকৃত সম্পত্তিকে সঠিকভাবে সুষম ব্যবহার করলে তাদের অবনতি হয় না। পুণ্য ও আনন্দিত কাজ ব্যক্তি ও সমাজকে মহিমান্বিত করে। প্রথম সপ্তক সূত্রে বলা হয়েছে, যে সকল স্থবির বহুকালের প্রাচীন, বহুদিনের প্রব্রজিত, সংঘপিতা, সংঘনেতা তাঁদের মৃত্যুর পর সৎকার করবে, সম্মান ও পূজা করবে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলা উচিত মনে করবে ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কখনো পরিহানি হবে না (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ১০৬)।

অতি প্রাচীনকাল হতে মহাপুরুষদের চিতার উপর স্তূপ বা চৈত্য নির্মিত হয়ে আসছে। সেই সকল স্তূপ বা চৈত্য দর্শনে লোকের মনে তাঁদের গুণসমূহ জাগ্রত হবে এবং গুণ স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্য করে সেই সকল স্তূপ বা চৈত্য বন্দনা করে বহু পুণ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। যেহেতু মৃত ব্যক্তির দেহভস্ম এবং মৃতের ব্যবহৃত সামগ্রীর উপর ঢিবির মতো চৈত্য নির্মিত হতো। পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য নির্মিত চৈত্য ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। আর মানুষের প্রয়োজনেই পূজনীয় স্থানগুলো গড়ে উঠেছে। পূজনীয় স্থানের সংস্কার সাধন ও সম্মান প্রদর্শন করা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের জন্য খুবই হিতকর ও সুখদায়ক। পূবপুরুষদের দানকৃত সম্পত্তিতে যারা গরিব বা অসহায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করে তাদের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উভয় প্রকার পুণ্য কাজ ব্যক্তি ও সমাজকে মহিমান্বিত করে।

২.৭. জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান করা

যারা অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের উপযুক্ত দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করবে সব রকম সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা করবে তাদের শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। যে সব অর্হৎ আসেননি তাদের কীভাবে এনে সেবা করা যায় তার ব্যবস্থা করবে তাদেরও শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। আবার নিজেদের গ্রামে অবস্থিত অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুরা নিরাপদ আছেন কিনা সে ব্যাপারে সবসময় যারা খোঁজ-খবর নিবেন তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উন্নতি হয়ে থাকে, অবনতির পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় (রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৪১ : ৭-৮)। শীলবানদের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্তে দান দেওয়া, তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং গুণীদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিতকরণে ব্যক্তি ও সমাজের অশেষ পূণ্যকর্ম সম্পাদিত হয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দান করা উচিত। সেই শ্রদ্ধা প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বত্র সম্মানিত। সকলেই তাঁদের সম্মান করে। মানুষের

জীবনে যা কিছু সুখের উপকরণ তা এসেছে জ্ঞানের ব্যবহারের ফলে। যেসব জাতি আজ উন্নতির শিখরে উঠেছে তারা জ্ঞান থেকেই শক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশই মানুষকে অগ্রগতির পথে শ্রেষ্ঠত্বের পথে চালিত করে। জ্ঞানীর সংস্পর্শে এলে জ্ঞানের আলোয় মন আলোকিত হয় এবং মানুষের জীবনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়। ছয়গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু নিজের জন্য যথেষ্ট তেমনি পরের জন্য ও যথেষ্ট। নিজের ও পরের মিলিয়ে মোট বারটি গুণ হলো যথাক্রমে: ১. দ্রুত কুশলধর্ম উপলব্ধি করা, ২. শ্রুত ধর্মের ধারক হওয়া, ৩. ধৃত ধর্মের অর্থ চিন্তা করা, ৪. অর্থ জ্ঞাত হওয়া, ৫. ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হওয়া, ৬. তার সুখকর কণ্ঠস্বর হওয়া, ৭. উত্তম উচ্চারণসম্পন্ন হওয়া, ৮. সুন্দর উক্তির অধিকারী হওয়া, ৯. স্পষ্ট, কর্কশতা বিবর্জিত ও তথ্যবহ; তিনি সব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, ১০. উৎসাহিত করেন, ১১. প্রোৎসাহিত করেন ও ১২. আনন্দ বর্ধন করেন (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ৩৬৬)।

এছাড়াও সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধির আলোয় আলোকিত হয়। অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের সহচার্যে এলে যেমন ব্যক্তি জীবন থেকে দূর করে সংকীর্ণতা ও কলুষতার অন্ধকার, তেমনি তা সমাজকেও করে প্রগতির আলোয় আলোকিত। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মনকে পরিশুদ্ধ, নির্মল, বিক্ষোভশূন্য ও প্রশান্ত করার মাধ্যমে একজন মানুষ সব কিছুকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। ভুল-ভ্রান্তি ও জীবনের যথার্থতা নির্ণয় করতে পারেন। তৃতীয় সপ্তক সূত্রে বলা হয়েছে, যতদিন ভিক্ষুবৃন্দ প্রজ্ঞাবান হবে ততদিন তাদের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হবে না (সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ১০৮)।

৩. বুদ্ধের সু-শাসন ও বর্তমান সমাজ

সমাজ একটি প্রচলিত ও চলমান ধারণার নাম। যেখানে মানুষ বসবাসের মাধ্যমে একটি রীতি-নীতি ও কাঠামোগত সাংস্কৃতিক রূপরেখা তৈরি করে। যার মূল্যায়নের মাধ্যমেই জানা যায় বা অবগত হওয়া যায় যে সেখানে আসলে সু-শাসন নীতির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা। সেজন্য একটি কাঠামোগত মূল্যায়ন সত্যই প্রয়োজন। নিম্নে বর্তমান সমাজে বুদ্ধের 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' বা সু-শাসন নীতির মূল্যায়ণ বা গুরুত্ব তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হলো:

৩.১. প্রকৃতি ও সু-শাসনের মধ্যে সমন্বয়

সু-শাসন একটি সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি সু-শাসন না থাকে তাহলে একটি সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের গতিধারা যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি ব্যাহত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়। একই ধারায় একটি সুন্দর সভ্যতা তৈরি হতে বাঁধা সৃষ্টি করে। সে কারণে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সু-শাসন নীতির ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন। সু-শাসন নীতি প্রকৃতির সর্বত্রই লক্ষণীয়। এ বিষয়ে *ধম্মপদে* উল্লেখ রয়েছে,

> দিবা তপতি আদিচ্চো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
> সন্নদ্ধো খত্তিযো তপতি ঝাযী তপতি ব্রাহ্মণো,
> অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা।
>
> (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ১২৭)

অর্থাৎ, সূর্য দিনের বেলায় তাপ বিকিরণ করে, চন্দ্র রাতের বেলায় আলো দান করে। ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা) অস্ত্র সজ্জায় এবং ব্রাহ্মণ ধ্যানী হয়ে শোভিত হন। কিন্তু বুদ্ধ দিবারাত্রি সর্বক্ষণ স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হন।

সুতরাং বলতে হয় আসলে সব কিছুই সু-নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির ক্রমানুসারে সকালে সূর্যোদয় ঘটে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায়। রাতের আকাশে চাঁদ এবং তাঁরা উঁকি দেয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই দিন-রাত চক্রাকারে প্রকৃতির চারদিক ঘোরে। মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব প্রকৃতির গতি-বিধি দ্বারা আবদ্ধ। প্রকৃতির মতই সু-শাসনের দায়বদ্ধতা মানব জীবনে অনিবার্যভাবেই আসে। যে কথাটি বুদ্ধ স্বয়ং বারংবার বলে গিয়েছেন। বৃজি জাতিদের শিক্ষা দেবার মধ্য দিয়ে 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' নীতির কথা মানব জাতির জন্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন যেনো সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ শিক্ষাটি আমরা বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের সু-শাসন নীতি বা 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে অবগত হতে পারি।

৩.২. ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রভাব

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সু–শাসনের প্রভাব বিদ্যমান। এখানে প্রথমেই ব্যক্তিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। যেন ব্যক্তি নিজেকে বদলাতে পারেন অর্থাৎ সু-শাসনের নীতির অনুসরণে আগ্রহী হতে পারেন। এ কারণে বুদ্ধ বলেছেন,

> অত্তানং চে তথা কযিরা যথ'ঞ্ঞমনুসাসতি,
> সুদন্তো বত দমেথ অত্তাহি কির দুদ্দমো।
> (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৬৪-৬৫)

অর্থাৎ, অপরকে শিক্ষা দেবে এবং নিজে তা অনুশীলন করবে; নিজে সংযত হয়ে অপরকে সংযত করা যায়। মূলত আত্ম দমন করা খুবই কঠিন।

তবুও ব্যক্তি জীবনে এর অনুশীলন খুবই জরুরি। সু-শাসন ও শৃঙ্খলা মানব জীবনের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় একান্ত প্রয়োজন। মানব জীবন বিভিন্ন বিধি-বিধান দ্বারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ। সু-শাসন ও শৃঙ্খলা মানব জীবনের ছন্দ হিসেবে গতি প্রদান করে থাকে। তাই বলা যায় জীবনকে শান্ত, স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ করার একটি নাম হলা ছন্দ। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে অগ্রগতি নিশ্চিত করার চালিকা শক্তি হিসেবে এটি কাজ করে থাকে। বিভিন্ন বিধি-বিধান বা সু-শাসন নীতি তৈরি করা হয়েছে সমাজের মানুষের অগ্রগতি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। সেই নিয়ম এবং বিধি-বিধান গুলোর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানবতা এবং প্রতিভা বিকাশিত হয়ে থাকে। মানুষ যতই সম্ভবনা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, সু-শৃঙ্খলা বা সু-শাসনের অভাবে তা অচিরেই বিনষ্ট হওয়ার অনেক বেশি সম্ভবনা রয়ে যায়। যে শিক্ষা বুদ্ধ বৃজি জাতির মাঝে নির্দেশনাস্বরূপ প্রদান করেছেন 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম'। যা আধুনিক যুগে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের যেকোনো জাতির জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

৩. ৩. নৈতিক শিক্ষা ও সু-শাসন

যেকোনো মানুষের জন্য সু-শাসন একান্তভাবে প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরও বেশি এর অনুশীলন হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নৈতিক শিক্ষা ও সু-শাসনের মাধ্যমে মানুষের যে সকল বিষয়ের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তা হলো:

১. মানুষের চেতনা ও গুণাবলির বিকাশ ঘটে থাকে,
২. মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে,
৩. দেশপ্রেম জাগ্রত হতে পারে এবং বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করতে পারে ও
৪. নানা রকম সমস্যাসহ জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জনসাধারণকে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সহনশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠাসহ নানারকম গুনাবলিতে গুণান্বিত হতে হবে এবং সু-শাসনের জন্য একই সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বুদ্ধ বলেছেন,

> সীলদস্সনসম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং,
> অত্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিযং।
> (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৮১)

অর্থাৎ, যিনি শীলবান, দার্শনিক, ধার্মিক, সত্যবাদী এবং স্বীয় কর্তব্যে নিয়োজিত, তিনি সকলেরই প্রিয় হয়ে থাকেন।

অতএব এক্ষেত্রে সু-শাসনের শিক্ষাও একান্তভাবে প্রয়োজন। সু-শাসন জনগণকে মুল্যবোধ সম্পূর্ণ ও সহনশীল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সু-শাসনের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাহলে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করাও সম্ভব। বুদ্ধ বৃজিদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য যেমন 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' বা সু-শাসন নীতির কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি বর্তমান সমাজ ও দেশে সু-শাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা, আইনের শাসন, সরকারী তথ্যের অবাদ প্রবাহ, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণ, সম্পদের সুষম বণ্টন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় জড়িত রয়েছে। শাসক-শাসিতের সুসম্পর্ক ও ভালো ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। সুব্যবহার সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন,

> পিযবাচমেব ভাসেয্য, যা বাচা পটিন্দিতা,
> যং অনাদায পাপানি, পরেসং ভাসতে পিযং।
> (সাধনানন্দ মহাস্থবির, ১৯৮৭ : ১১৬)

অর্থাৎ, যে বাক্য সাদরে গ্রহনযোগ্য হয়, পাপসংস্পর্শ শূন্য হয়ে যা অন্যজনের আনন্দজনক হয়, সেইরূপ প্রিয়বাক্য ভাষণ করবে।

এরপর রয়েছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সকল শ্রেণি পেশার মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ জীবন সু-নিয়ন্ত্রিত করা। কারণ মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৩. ৪. সু-শাসন ও উন্নয়ন

সু-শাসন ও উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। যে কোনো দেশে যদি সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সু-শাসনের দু'টো দিকের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। এর এক দিকে রয়েছে দেশের মানুষ আর অপরদিকে রয়েছে সে দেশের প্রকৃত মালিক। সেকারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন যেন দেশের মানুষের জীবনাচারের কোনো বিঘ্ন না ঘটে। সু-শাসন বিষয়টি শুনতে বায়বীয় হলেও মূলত তা একটি নির্ভরশীল ধারণা। সু-শাসনের কথা বলতে গেলে কতগুলো দিক নজর দেওয়া প্রয়োজন। পণ্ডিতদের সূত্র অনুসরণ করে অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলাম সু-শাসনের মোট ছয়টি সুচক চিহ্নিত করেছেন। তা হলো : ১. দায়বদ্ধতা, ২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, ৩. সরকারের কার্যকারিতা, ৪. নিয়মবিধির প্রায়োগিকতা, ৫. আইনের শাসন ও ৬. দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ (নজরুল ইসলাম, ২০১৬ : ১৪২)। যে কথাটি আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ পৃথিবীর মানুষের জন্য উদাহরণস্বরূপ বৃজি জাতির কাছে প্রকাশ করেছিলেন সাতটি শর্ত বা সু-শাসন নীতি। যাকে বলা হয় 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম'। এ নীতিগুলোর চর্চার মাধ্যমে কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে তার নির্দেশনা রয়েছে। যেগুলো থেকে আমাদের বাস্তবতায় ও সময়ের সাথে মিলিয়ে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সু-শাসন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমেই প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যেখানে প্রয়োজন আইনের শাসন ও দক্ষ বিচাররক ও বিচার ব্যবস্থা। এ কারণে বুদ্ধ বলেছেন,

> ন তেন হোতি ধম্মট্ঠো যেনত্থং সহসা নয়ে,
> যো চ অত্থং অনত্থঞ্চ উভো নিচ্ছেয্য পণ্ডিতো।
> (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৯২)

অর্থাৎ, যিনি হঠকারিতার সাথে বিচার করেন তিনি বিচারক নামের যোগ্য নন। পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক নিশ্চিত হয়ে বিচার করেন। বুদ্ধ আরো বলেছেন,

> অসাহসেন ধম্মেন সমেন নযতী পরে,
> ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্ঠো'তি পবুচ্চতি।
> (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৯২)

অর্থাৎ, যিনি ন্যায়, ধর্ম ও সাম্যের সাথে সকলকে পরিচালিত করেন তিনিই ধর্মের অভিভাবক, পণ্ডিত এবং সুবিচারক বলে কথিত হন।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বুদ্ধের 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' বা সু-শাসন নীতি হলো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্য। মানব জীবনের আরাম ও সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিতে পারে অভদ্র আচরণ, অন্যায্য জবরদস্তি ও অবৈধ পেশী শক্তির ব্যবহার। এগুলি জাতীয় অগ্রগতির পথে অস্বাভাবিক বাধা হিসেবে কাজ করে। আর ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষ যখন একই প্রকার জীবন ধারায়, একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট হয়

তখন একটি দেশ বা রাজ্য সুন্দরভাবে চালিত হয়। সু-শাসন নীতির বাস্তবায়নই হলো জাতির অগ্রগতির ভিত্তি। যদি কোন জাতি বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তাহলে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মে এমনকি প্রতিটি ব্যক্তি আচরণে বুদ্ধের কল্যাণকর 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' বা সু-শাসন নীতির অনুসরণ ও অনুকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে লক্ষ করা যায় যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ নীতির চর্চা বা অনুসরণ যে বা যারা করেছে; এমন ব্যক্তি অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের দেওয়া যে শিক্ষা তার অনুশীলন বা চর্চার গুরুত্ব এখনও রয়েছে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ গঠনে এমনকি পৃথিবীকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। বরং বহাল তবিয়তে তা বর্তমান সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে এমনকি সুন্দর-সুখকর মানব বসবাস উপযোগী পৃথিবী বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অতএব বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধের সু-শাসন নীতি বা সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের শিক্ষা অত্যাধিক মূল্যায়ন ও গুরুত্বের দাবি রাখে।

টীকা

১. সত্যক্রিয়া বুদ্ধের শিক্ষাপদেশের বিশেষ এক স্থান দখল করে আছে। মূলত বুদ্ধের শিক্ষায় প্রার্থনার চেয়ে নিজের দ্বারা সম্পাদিত কুশল কর্মের উপর ভিত্তি করে সত্যক্রিয়ার দ্বারা কোনো ঈপ্সিত বা আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভের প্রচেষ্টার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এই সত্যক্রিয়া উচ্চারণ করে যথাযথ ফল লাভের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই শীলানুসারী কর্তব্য করতে হবে। বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কূটনীতিক শ্রীলঙ্কায় জন্মগ্রহণ করা গুণাপলা পিয়সেনা মালালাশেখর সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব বুদ্ধিজম' এর দ্বিতীয় খণ্ড ৫৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে সত্যক্রিয়া (সচ্চকিরিযা) হলো শীলগুণের নিশ্চিত ফল প্রদানের ক্ষমতা এবং সত্যভাষণের ফলপ্রসূতা।

২. চৈত্য হলো যে স্থানে বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ব্যবহার্য বস্তু ও শরীরাবশিষ্ট অস্থি ইত্যাদি ধাতু প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। মহামানব বুদ্ধ ও পূজনীয়দের উদ্দেশিক, পারিভৌগিক ও শারীরিক এই তিন ধরনের চৈত্যের যথাযথ পরিচর্যা ও সংস্কার সাধন করলে উন্নতি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য বুদ্ধ মূর্তিকে উদ্দেশিক চৈত্য, বোধিবৃক্ষকে পারিভৌগিক চৈত্য ও বুদ্ধের দেহাবশেষকে শারীরিক চৈত্য বলে।

৩. বৌদ্ধ ধমীর্য় গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ ষোলটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। জৈন গ্রন্থ ভগবতীসূত্রেও ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে। মহামানব গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী সময়ে মহাপরিনির্বাণের আগ পর্যন্ত তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাজনপদে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই মহাজনপদের অন্যতম ছিল বজ্জী বা বৃজি জনপদ। এটি ভারতের মোজাফফরপুর জেলায় অবস্থিত। রাজ্য কাঠামের দিক থেকে এটি ছিল প্রজাতন্ত্র বা গণরাজ্য। আটটি (শাক্য, লিচ্ছবি, কোলিয়, বুলি, মৌর্য, কালাম, বিদেহ ও ভগ্গ) উপজাতি সম্প্রদায় যৌথভাবে এই গণরাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। কথিত আছে যে, বৃজিরা গণতন্ত্র চর্চা, ঐক্যবিধানে সর্বত্রই তাদের খ্যাতি ছিল।

উল্লেখপঞ্জি

ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪১৯)। *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী

ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪২২)। *জাতক ষষ্ঠ খণ্ড*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী

নজরুল ইসলাম (২০১৬)। *গভর্নেন্স ফর ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নের জন্য সু-শাসন*, নিউইয়র্ক : পলগ্রেভ ম্যাকমিলান

ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও বীরেন্দ্র মৎসুদ্দি (১৯৩৬)। *সদ্ধর্ম্ম-রত্নাকর*, তাইওয়ান : দি করপোরেট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৫)। *শিক্ষা*, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির [সংকলিত ও অনূদিত] (১৯৪১)। *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*, চট্টগ্রাম : অন্নপূর্ণা

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া ও ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চম খণ্ড) সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)* বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

শ্রীশান্তরক্ষিত স্থবির (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*, কলিকাতা : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (২০০৮)। *পালি-বাংলা অভিধান*, *প্রথম খণ্ড*, ঢাকা : বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (২০০৮)। পালি-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সাধনানন্দ মহাস্থবির (১৯৮৭)। *সুত্ত নিপাত*, ঢাকা: স্বর্ণেন্দু বিকাশ চাক্‌মা, মিসেসে সুলেখা চাক্‌মা, শৈলজ চাক্‌মা ও মিসেস শান্তা চাক্‌মা

সুকোমল বড়ুয়া (১৯৯৮)। *কোশল ও মার সংযুক্ত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (১৯৯৭)। *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)* বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)*, বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু [অনূদিত] (২০১৮)। পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড), বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং রাজনৈতিক জনমত গঠনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা

এ. এস. এম. মোহসীন*

Abstract : In the history of Bengali nationalism, the general election of 1970 in Pakistan was an important milestone. The nationalistic force at that time appeared strongly under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The Awami League won a landslide victory in the East Pakistan Provincial Assembly and also in the Pakistan National Assembly as they sought public mandate in favour of autonomy and Six-point Programme for removing disparity between the two wings of Pakistan and to bring an end to the internal colonial rule. Dhaka's daily newspapers such as the *Azad*, the *Ittefaq*, the *Sangbad*, the *Pakistan Observer* and others played an important role in that election. They supported different political parties according to their own ideology. Apart from the ideological differences most of these newspapers were united in the question of Bengali nationalism when the Pakistan civil and military ruling class refused to transfer power to the majority leader Bangabandhu and his party. Especially the *Azad*, the *Ittefaq*, the *Sangbad* played an important role in this context. On the other hand the role of the *Morning News*, the *Pakistan Observer* and the *Purbadesh* were not positive. This article, hence, is an attempt to analyze the role of Dhaka's daily newspapers in the election of 1970 in Pakistan.

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল বাঙালি জনগণের স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী ধারা এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের [এরপর থেকে শুধু বঙ্গবন্ধু] নেতৃত্বে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের পর একমাত্র অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছিল এটিই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে এসেছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সেটির বিজয় ঘটে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে 'পশ্চিম পাকিস্তান' কর্তৃক 'পূর্ব পাকিস্তান' শাসন ভিত্তিহীন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। ১৯৫২ সালে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উদ্ভব ও বিকাশ সেটি এই নির্বাচনে পূর্ণতা অর্জন করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজ নিজ

* সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), ডিপার্টমেন্ট অব বেসিক সায়েন্সেস এন্ড হিউম্যানিটিজ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই ছিল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ও মতবাদের সমর্থক যা তাদের প্রকাশিত সংবাদে প্রতিফলিত হয়।

পঞ্চাশের দশকে একদল মেধাবী যুবক সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী। কিন্তু পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। প্রতিশ্রুতিশীল এসব বিপ্লবী সাংবাদিকদের মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সার, সত্যেন সেন, রণেশ দাশ গুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, ফয়েজ আহমদ, সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন অন্যতম। এছাড়া কিছু সংখ্যক যুবক ছিলেন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে সোচ্চার। এদের কেউ কেউ মওলানা ভাসানী কিংবা বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের অন্যতম ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুস সালাম, এবিএম মুসা, শামসুর রাহমান, কাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস, ইরফান বারী, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, এম. আর. আখতার মুকুল, শিবসাধন চক্রবর্তী প্রমুখ। পাশাপাশি সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন একদল দেশ প্রেমিক সাংবাদিক যারা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ করেননি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬০ এর দশকে আইয়ুবীয় স্বৈরাচারের চরিত্র উন্মোচন করা এবং স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এদের মধ্যে প্রথমেই আসে সংবাদের আহমেদুল কবীর, ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) [এরপর থেকে শুধু মানিক মিয়া], গণশক্তির বদরুদ্দীন উমর, স্বরাজের ফয়েজ আহমদ, হলিডের এনায়েত উল্লাহ খানের নাম। দৈনিক পত্রিকাগুলো এসকল বিপ্লবী ও নির্ভীক সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশে অনেকটাই স্বাধীনতা দিয়েছিল— সংবাদপত্রের মালিকপক্ষ যে মতাদর্শেরই হোক না কেন। এদের সম্পৃক্ততায় মতাদর্শতগত ভিন্নতার পরও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য সৃষ্টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের প্রতিবাদে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের মতো বিষয়গুলোর পক্ষে জনমত গঠনে দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ সে সময় ঢাকাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্র। ১৯৭০ সালের নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়ন, পত্রিকাসমূহে জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনে এদের ভূমিকা নির্ধারণ, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের নিজ নিজ অভিমত, যুক্তিতর্ক নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ সাধনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গণমাধ্যমের অন্যতম অংশ হিসেবে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের অবস্থান স্পষ্ট করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য। বিশেষত ১৯৬০ এর দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিকাঠামো ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যে পূর্ণতা পায়, সেটিকে উপজীব্য করে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহ কী ভূমিকা পালন করেছে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিক গবেষণার উৎস হিসেবে সংবাদপত্র ব্যবহৃত হলেও সরাসরি সংবাদপত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করে গবেষণা সম্পন্ন করার হার তুলনামূলকভাবে কম। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার তৎকালীন মুদ্রিত গণমাধ্যম বিশেষত ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যেখানে আলোচ্য দৈনিক পত্রিকাসমূহ

এবং অন্যান্য সরকারি দলিল-দস্তাবেজ প্রাথমিক এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশে ১৯৭০ সালের নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কিত ঘটনাবলি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ঢাকার তৎকালীন দৈনিক পত্রিকাসমূহের রাজনৈতিক আদর্শ এবং তৃতীয় অংশে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক জনমত গঠনে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিক এবং সময়ানুক্রমিকভাবে করা হয়েছে।

ক. ঘটনাপ্রবাহ

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাতে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি এবং সংবিধান বাতিল করে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করার পর যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ একই বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক শাসন কায়েমের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া সেনাবাহিনী এবং তার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই (*দৈনিক পাকিস্তান* এবং *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৭ মার্চ ১৯৬৯)। এ সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তেমন কোনো রূপরেখা ছিল না। যে প্রক্রিয়ায় আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেটি ছিল অগণতান্ত্রিক কারণ ১৯৬২ সালের সংবিধানে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোনো বিধান ছিল না। ৩১ মার্চ সামরিক আইনের এক ঘোষণায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (*আজাদ*, ১ এপ্রিল, ১৯৬৯)। প্রবল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের সহায়ক শক্তিগুলো ধ্বংস করার মতো কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তবে সামরিক আইন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন বেশ তৎপর ছিল। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল, পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশে অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক নির্বাচন, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, ফেডারেল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, পরিষদের প্রথম বৈঠক থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন (রহমান, ১৯৮২: ৪৮৩-৮৭)। ঐতিহাসিকদের মতে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিয়েছিলেন এই আশায় যে 'পূর্ব পাকিস্তানে' একাধিক রাজনৈতিক দল থাকায় কোনো দলের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। ফলে রাজনৈতিক দলের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তিনি দেশের ওপর এমন একটি সংবিধান চাপিয়ে দেবেন যা পুরাতন শাসকচক্রের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ন রাখবে। ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করা সম্ভব না— এই বিশ্বাস থেকে তিনি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন (সেন, ২০০৯: ১৯৪-১৯৫)। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ অপর এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের 'আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Frame Work Order)' জারির কথা ঘোষণা করেন যা ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয় (রহমান, ১৯৮২: ৫০৫-২৩)। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (উভয় গ্রুপ)-সহ অন্যান্য গণতন্ত্রমনা দলসমূহ আইন কাঠামো আদেশ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা ও তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিতে ব্যর্থ হলে সংবিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেওয়ার দাবি জানায়। অপরদিকে ধর্মভিত্তিক ও ডানপন্থি দলগুলো সামরিক শাসনকে তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করে আইন কাঠামো আদেশের প্রতি সমর্থন জানায়। তবে আইন কাঠামো

আদেশের সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয় (*ইত্তেফাক*, ৫-৭ এপ্রিল ১৯৭০)। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হচ্ছে— আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল, কনভেনশন, কাইয়ুম— এই তিনটি গ্রুপ), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামি প্রভৃতি। ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে প্রথম থেকেই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেয়নি (Choudhury, 2011: 106-31)।

আওয়ামী লীগ ৬-দফাকে নির্বাচনি ইশতাহার হিসেবে ঘোষণা করে এবং নির্বাচনকে ৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে একটি গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। দলটি নির্বাচনি প্রচারণায় পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে এবং 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামে একটি পোস্টারের মাধ্যমে এই বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে (রহমান, ১৯৮২: ৫৫৮-৬১)। ন্যাপ (মোজাফ্ফর) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নির্বাচনি ইশতাহারে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে তাদের দাবি আওয়ামী লীগের ৬-দফা থেকে কিছুটা নমনীয় ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে ইসলামি দলগুলোর বিপক্ষে আওয়ামী লীগের সাথে জোট গঠনে তারা আগ্রহী ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিল। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দলটির নেতা নুরুল আমীন আওয়ামী লীগের ৬-দফার বিরোধিতা করে দলটির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। ধর্মভিত্তিক দল জামায়াত-ই-ইসলামি ছিল ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী। দলটি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে বলে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি। মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপ তথা কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগ যথাক্রমে আওয়ামী লীগের ৬-দফা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারত বিরোধী নীতি গ্রহণ করে (মাহবুবর রহমান, ১৯৯৯: ২১৬-২১)। সুতরাং, সার্বিকভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনটিভাগে বিভক্ত করা যায়— প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ইসলামি ভাবধারার শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী দল। আদর্শগত দিক দিয়ে ন্যাপ (ভাসানী ও ওয়ালী গ্রুপ), জাতীয় গণমুক্তি দল, সিন্ধু সংযুক্ত দল (সিন্দু কেন্দ্রিক) ছিল বামপন্থি; আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান জাতীয় লীগ, পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস ছিল মধ্যপন্থি; নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামি, মারকাযে জমিয়াতে উলামা, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম ছিল ডানপন্থি রাজনৈতিক দল (Choudhury, 2011: 115)।

নির্বাচনের ফলে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। দলটি জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরদিকে জাতীয় পরিষদে অবশিষ্ট দুটো আসন লাভ করেন পিডিপি নেতা নুরুল আমীন ও স্বতন্ত্র সদস্য। প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য সদস্যরা ১২টি আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কোনো আসন পায়নি। সেখানে জাতীয় পরিষদে ৮৩টি আসন পেয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো'র পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয় (রহমান, ১৯৮২: ৫৯২)।

নির্বাচনের এই ফল ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ডানপন্থি দলগুলোর এই দাবিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বাঙালি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। পাশাপাশি এটিও প্রমাণ হয়ে যায় যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো বিশেষ মিল ছিল না এবং ইসলাম এই দুই অংশের মধ্যে কোনো বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেনি।

খ. উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকাসমূহের রাজনৈতিক আদর্শ

১৯৬০-এর দশকে ঢাকার উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা ছিল— *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *মর্নিংনিউজ* প্রভৃতি। যদিও রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যম জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে কিন্তু সেই সময়ে বর্তমানকালের মতো বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও ছিল না। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা রেডিও টেলিভিশনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানপন্থি। বিপরীতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ছিল বেসরকারি মালিকানাধীন যাদের প্রকাশিত সংবাদ মালিক পক্ষের রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে।

১. *আজাদ*

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর মওলানা আকরম খাঁর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *আজাদ* আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা রাখা। পত্রিকাটি 'আজাদের আত্মনিবেদন' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয়তেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, '... তিন কোটি মুসলমানের সত্যিকার সেবা ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম।' (*আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬)। *আজাদ* ছাপা হতো ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে এবং মুদ্রিত হতো মোহাম্মদী প্রেস থেকে। কলকাতা থেকে *আজাদ*-এর সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। এতে উল্লেখ করা হয়, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিমলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় *আজাদ*-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয়তে এর একটি প্রভাব পাওয়া যায়। *আজাদ*-এর অনেক বক্তব্যই ছিল সাম্প্রদায়িক এবং দ্বৈত নীতির প্রকাশক। পত্রিকাটি রবীন্দ্রসংগীত, মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের বিরোধিতা যেমন করেছে তেমনি বিপরীতে ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। ষাটের দশকে আজাদের রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এক সময় ৬-দফার বিরোধিতা করলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং আগরতলা মামলায় পত্রিকাটি ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। *আজাদ* ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল রাজনৈতিক ভাবে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক যা আইয়ুব বিরোধী। মওলানা আকরম খাঁর ছেলে কামরুল আনাম খাঁ আজাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার পর এই চরিত্রগত পরিবর্তন হয় (হায়দার, ২০১০: ১০২-১০৫, ১৭২)।

২. *ইত্তেফাক*

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে ভূমিকা পালনকারী *ইত্তেফাক* সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*-এর ওপরে তার পরিচয় লেখা থাকতো-

'প্রতিষ্ঠাতা: আবদুল হামিদ খান ভাসানী'। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাটির মালিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মানিক মিয়া। সোহরাওয়ার্দীর অনুসারি মানিক মিয়া *ইত্তেফাক*-কে সোহরাওয়ার্দীপন্থি করে তোলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই *ইত্তেফাক* অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফলে *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করা হয় এবং মানিক মিয়াও বহুবার কারাবরণ করেন। সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা, সাম্প্রদায়িকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির উদ্দেশ্যে *ইত্তেফাক*-এর 'রাজনৈতিক হালচাল' ও পরবর্তী সময়ে 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'মোসাফির' ছদ্ম নামে নিয়মিত লিখতে থাকেন মানিক মিয়া। 'রাজনৈতিক মঞ্চ' বা 'মিঠেকড়া' উপ-সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে রাজনীতির কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হতো। *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন - ১১ জুলাই এবং ২৭ জুলাই - ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকায় এ সময়সীমার মধ্যে পত্রিকাটির ভূমিকা পাওয়া যায় না (জাহান, ২০০৮: ১৭৯)।

৩. *সংবাদ*

১৯৫১ সালের ১৭ মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *সংবাদ*। তখন এর সম্পাদক ছিলেন খায়রুল কবীর। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন কুমিল্লার ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দীন আহমদ। তিনি *জিন্দেগী* পত্রিকার স্বত্ব কিনে নতুন আঙ্গিকে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। *সংবাদ* ইস্ট পাকিস্তান প্রেস ২৬৩ বংশাল রোড থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ঢাকার প্রায় সব প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক প্রাথমিক পর্যায়ে *সংবাদ*-এ যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, কে. জি. মোস্তাফা, জহুর হোসেন চৌধুরী এবং আরও অনেকে। আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে সম্পাদক খায়রুল কবীরের মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পত্রিকাটি কিনে নেয়। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে মুসলিম লীগের সমর্থক এবং ভাষা আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা পালন করে যা অব্যাহত থাকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। নির্বাচনের পর পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আসেন আহমেদুল কবীর। সম্পাদক হয়ে আসেন জহুর হোসেন চৌধুরী। নির্বাচন পরবর্তী মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকর্মী যাদের ঢাকায় আশ্রয় ছিল না, তারা *সংবাদ* এর কক্ষে বা ছাদে দীর্ঘদিন বাস করেছেন। কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন সেন, রনেশ দাশ গুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত ক্রমে *সংবাদ* এর সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় কোম্পানি- 'দি সংবাদ লিমিটেড'। নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন আহমেদুল কবীর ও নাসির উদ্দীন আহমদ। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের সমর্থক। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য। এ সময় *সংবাদ* পুনরায় তার নীতি পরিবর্তন করে। ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হওয়ার পর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপে যোগদান করেন। অবিভক্ত ন্যাপে *সংবাদ* ধীরে ধীরে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও মহীউদ্দিন আহমদ উপদলের সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির পর অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থি অংশের মুখপত্রে পরিণত হয় *সংবাদ*। (ধর, ১৯৮৫: ৩৭-৪২; হাসান, ২০১৪: ১১২)। এ সময় অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এবং সৈয়দ আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থি ন্যাপকেই পত্রিকাটি ন্যাপের প্রধান ধারা হিসেবে উল্লেখ করে।

৪. *পাকিস্তান অবজারভার*

১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ *পাকিস্তান অবজারভার* প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বিভাগে প্রথম দিকে কাজ করতেন জহুর হোসেন চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুল হাই। ১৯৫০ সালের ৩ জুন পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন আবদুস সালাম। সমগ্র পাকিস্তান আমলে তিনিই *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে *পাকিস্তান অবজারভার* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পত্রিকাটি সরকারের বিরাগভাজন হয়। এ সময় পূর্ব বাংলার প্রধান পত্রিকাগুলো মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়ায় *পাকিস্তান অবজারভার* মুসলিম লীগ বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে এবং এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি *পাকিস্তান অবজারভার* প্রথমবারের মত নিষিদ্ধ হয়। আবদুস সালাম এবং হামিদুল হক চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের হয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন। ফলে ১৯৫৪ সালের ৯ মে থেকে *পাকিস্তান অবজারভার*-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এ পর্যায়ে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থক। আইয়ুব খান প্রণীত রাজনৈতিক দল আইনের আওতায় তিনি রাজনীতি করার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। ফলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একটি আন্দোলন হিসেবে ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) - এ হামিদুল হক যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে পত্রিকাটি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বৈষম্যের কথা জোরালো ভাষায় তুলে ধরলেও ৬-দফা বিরোধী অবস্থান নেয়। এমনকি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানেও পত্রিকাটি ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদানের বিরোধী ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পত্রিকাটি আপোশমূলক নীতি নেয়। হামিদুল হক চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং *পাকিস্তান অবজারভার* অফিস হয়ে ওঠে রাজাকার-আলবদরদের অন্যতম ঘাঁটি (হায়দার, ২০১০: ১১৯)।

৫. *মর্নিং নিউজ*

ঢাকার নওয়াব পরিবারের খাজা নূরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *মর্নিং নিউজ*। তিনি ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীনের আত্মীয়। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। মর্নিং নিউজ মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। *মর্নিং নিউজ* একমাত্র পত্রিকা যেটি পাকিস্তান আমল জুড়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা, বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান নিয়ে সবকিছুকেই হিন্দুয়ানি আখ্যায়িত করে বিষোদ্‌গার অব্যাহত রাখে। আইয়ুব খান তার সমর্থক পত্রিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে গঠন করেন 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট'। আজন্ম বাঙালি বিরোধী পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে ট্রাস্ট। এসময় যুগপৎ ঢাকা ও করাচি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার সমর্থক হওয়ায় আইয়ুব বিরোধী সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জোট, বক্তৃতা ও বিবৃতিকে পত্রিকাটি নেতিবাচক এবং বিদ্রুপাত্মকভাবে উপস্থাপন করতে থাকে। ৬-দফা ও উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের পক্ষে পত্রিকাটি যেমন কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি তেমনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষেও পত্রিকাটির কোনো ভূমিকা পাওয়া যায় না।

৬. *দৈনিক পাকিস্তান*

আইয়ুব খাঁন তার পক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে গঠন করেন ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট। ট্রাস্ট গঠনে যেসব শিল্পপতি সহায়তা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দাউদ, ফেন্সী, আদমজী ও সুমার। ট্রাস্ট গঠনকারী শিল্পপতিরা বিভিন্ন পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর প্রকাশ করা হয় বাংলা পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান*। পাক আর্টস মুদ্রণালয়, ৫০ টিপু সুলতান রোড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দু কবি আহসান আহমদ আশককে ট্রাস্টের সদস্য করে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর মহাব্যবস্থাপক করা হয়। *আজাদ*-এর পূর্বতন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ট্রাস্ট মালিকানাধীন হলেও প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত অনেকেই *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় যোগদেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক সময়ের বামপন্থি নেতা মোজাম্মেল হক, কবি শামসুর রাহমান, সানাউল্লাহ নুরী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই চলিত ভাষা ব্যবহার করে যেখানে ঢাকার অন্যসব দৈনিক পত্রিকা সাধুভাষা ব্যবহার করত। প্রগতিশীল সাংবাদিকরা পত্রিকাটির সাথে জড়িত হওয়ার কারণে সরকারের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটিতে বাঙালি জনমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। তবে সঙ্গত কারণেই সম্পাদকীয় নীতি ছিল সরকারের মতাদর্শে পরিচালিত (ধর, ১৯৮৫:৪০)।

৭. *পূর্বদেশ*

১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় *দৈনিক পূর্বদেশ* প্রকাশিত হয়। মাহবুবুল হক ফেনী থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালের দিকে হামিদুল হক চৌধুরী পত্রিকাটিকে তার অবজারভার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৬২ সালের ১৪ আগস্ট *পল্লীবার্তা* নাম পরিবর্তন করে *পূর্বদেশ* রাখা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে মাহবুবুল হক এবং *পূর্বদেশ* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত থাকেননি। এতে হামিদুল হক চৌধুরীর প্রভাব ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে *পূর্বদেশ*-এর 'তৃতীয়মত' কলামে বিভিন্ন ভাবে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর *পূর্বদেশ* সম্পাদক মাহবুবুল হক দালাল আইনে গ্রেফতার হন (হায়দার, ২০১০: ১৩৬)।

৮. *দৈনিক সংগ্রাম*

১৯৭০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩১ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ওয়ারি ঢাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের মুখপত্র হিসেবে ছাপা হয় *দৈনিক সংগ্রাম*। প্রতিষ্ঠালগ্নে পত্রিকাটির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ব্যারিস্টার কোরবান আলী ও ফাইয়াজ আহমদ, সম্পাদনায় ছিলেন ঢাকা কায়েদে আযম কলেজের অধ্যাপক এবং উগ্র ধর্মীয় মতবাদের সমর্থক আখতার ফারুক। মতিউর রহমান সাহিত্যের পাতা এবং খাদিজা আখতার রেজায়ী মহিলা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন (হায়দার, ২০১০: ১৮১)।

আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিতপত্রিকাসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

গ. রাজনৈতিক জনমত গঠনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করার পর ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে জারি হতে থাকে সামরিক আইন বিধি। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ৬, ১৭ ও ১৯ নং ধারা।

এসব ধারায় সামরিক আইনের সমালোচনা, শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি, জনমনে আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের সাজা নির্ধারণ করা হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড (ধর, ১৯৮৫: ৯২)। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন ও সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় এবং ঐ বছরের মাঝামাঝি থেকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন পূর্ণ মাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পান এবং পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হতে থাকে। আগরতলা মামলা এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে *মর্নিং নিউজ* বাদে ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সম্মিলিতভাবে সমর্থন দিলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পত্রিকাগুলো তাদের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থানে ফিরে যায়। *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগকে এবং *সংবাদ* ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-র মোজাফ্ফর গ্রুপকে সমর্থন করে। তবে ভাসানীপন্থি ন্যাপের খবরও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে। *আজাদ* কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও নির্বাচনমুখী মনোভাবের কারণে পত্রিকাটির অবস্থান ছিল অনেক ক্ষেত্রেই *ইত্তেফাক* ও আওয়ামী লীগের সাথে একই সমান্তরাল। এ সময় প্রচার সংখ্যা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে *আজাদ*, *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* ছিল শীর্ষস্থানীয় (জাহান, ২০০৮: ১৯১)।

ইত্তেফাক

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমত সংগঠন ও নির্বাচনি প্রচারাভিযানে *ইত্তেফাক* কাজ করে। দলটি ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করার বিরোধিতা করে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বাতিল ছাড়া কোনো সংবিধানই গ্রহণযোগ্য হবে না (*আজাদ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)। তিনি বলেন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণ-পরিষদ গঠন করে এর ওপর সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করাই গণতান্ত্রিক রীতি (*আজাদ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৬৯)। *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনমুখী নীতিকে সমর্থন করে এবং নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সামরিক শাসন জারির পরপর ১৯৬৯ সালের ২৮ মার্চ পত্রিকাটি সামরিক শাসন ও নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। মানিক মিয়া সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন:

> ... ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই। ...আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ... আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অন্য কোনো ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে না (*ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ ১৯৬৯)।

মানিক মিয়া সব সময় সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি সামরিক শাসনকে রাজনৈতিক কোন্দল নিরসনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৫৮ সালে

সামরিক শাসন জারির পরও তিনি একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় *ইত্তেফাক* শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামে নির্বাচনের দাবিতে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> সাধারণ মানুষ রাজনীতির সাত পাঁচ আজ আর বুঝিতে চায় না। তারা চায় নির্বাচন - সে নির্বাচন যত সত্বর আসে, ততই তাহাদের জন্য মঙ্গল বলিয়াই তাহারা মনে করে। তারা চায় শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান হোক ... এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের হইলেও রাজনীতিকদের দায়িত্বও এক্ষেত্রে আদৌ কম নয় (*ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)।

পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে চলমান শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিয়ে লেখনী প্রকাশ করে। পাশাপাশি পত্রিকাটি সাধারণ পাঠকদের বিভিন্ন বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। যেমন— শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর আবুল হাসনাতের 'রাজনৈতিক সংকট ও তার সমাধান' শিরোনামে মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। একইভাবে ১৯৬৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সামরিক শাসনের মধ্যে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশংকা জানিয়ে একজন পাঠক আনোয়ার হোসেন 'গোল টেবিল বৈঠক বনাম রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের ঐক্যমতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেন:

> শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদির উপর রাজনীতিবিদের একমতে পৌছাতে না পারিলে প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সরাসরি জনগণের দরবারে যাইবেন বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করিয়াছেন।... বিগত বাইশ বছরে সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি যথা স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদির ব্যাপারে কোনো প্রকার ঐক্যমতে না পৌছায় এবং সম্পূর্ণ শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তীকালে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে উহা ভাবিয়া অনেকে আবার মনে করেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রে বসিয়া আলাপ আলোচনার মারফত বিতর্কমূলক বিষয়াদির উপর ঐক্যমত্য পৌছান (*ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)।

এভাবে *ইত্তেফাক* পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিয়ে একাধিক লেখনী প্রকাশ করে। পত্রিকাটিতে ১৯৬৯ সালের ১, ২, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *ইত্তেফাক* 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণ করার বিষয়েও প্রচারণা চালায়। ১৯৬৯ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমিতে গ্রামোফোন কোম্পানির এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান' নামের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে *ইত্তেফাক* ১৭ ডিসেম্বর মন্তব্য করে, '... আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোনো হামলা হইতে দেওয়া হইবে না এবং এখন হইতে পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।' (*ইত্তেফাক*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯)। পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশ নামের প্রতি সমর্থন জানালেও পিডিপি ও জামায়াত-ই-ইসলামি বাংলাদেশ নামের বিরোধিতা করে। ১৯৭০ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মঞ্চের পেছনে 'জয় বাংলা' স্লোগান লেখা হয়। তবে স্লোগানটি সাধারণের মধ্যে প্রচারণা পায় ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর প্রথম অনুষ্ঠিত জনসভায় (হাবিবুর রহমান, ১৯৯৯: ২৬)। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান আইন কাঠামো আদেশ ঘোষণা করলে পরদিন *ইত্তেফাক* পরোক্ষভাবে এটিকে স্বাগত জানায়।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় সাংবিধানিক পরিকল্পনা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবি এবং বিগত ২২ বছরে বাঙালিদের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন। এ সময় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। *ইত্তেফাক* মূলত ৬-দফা দাবিকে গুরুত্ব দেয়। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে বন্যার কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই নির্বাচন স্থগিত করার পক্ষে অবস্থান নেয়। ভাসানী ভোটের আগে ভাতের দাবি তুলে নির্বাচন পেছানোর পক্ষে মত দেন (*ইত্তেফাক*, ৩ অক্টোবর ১৯৭০)। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতি জোরালো দাবি জানায় আওয়ামী লীগ। *ইত্তেফাক* নির্বাচন অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে একাধিক সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং অনেকটা কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগ ও এর কর্মীদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে পত্রিকাটি ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাস জুড়েই একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। কোনো চক্রান্তের কারণে যাতে নির্বাচন বাতিল না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ১ নভেম্বর 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

ইত্তেফাক ভাসানীর 'ভোটের আগে ভাত চাই'— এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে ১৯৭০ সালের ১ নভেম্বর *ইত্তেফাক* উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে:

> ... তাহারা বলিতেছে ভোটের আগে ভাত চাই, বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হইলে ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দিব ইত্যাদি। ... নিয়ন্ত্রণের কাজ এক পাও আগাইবে না; কিন্তু নির্বাচনের তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একশ বছর পিছাইয়া যাইবে। ... নির্বাচন ও গণ আন্দোলন পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ... যেখানে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়, অথবা নির্বাচনের ফল জনগণ ভোগ করিতে পারে না, সেখানেই আন্দোলন প্রয়োজন হয়। সে আন্দোলনের চরম উদ্দেশ্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান। ... এই যুক্তিটাই আসন্ন নির্বাচনে প্রয়োগ করা যাক (*ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭০)।

ইত্তেফাক নির্বাচন বর্জন প্রশ্নে ভাসানীর সমালোচনা অব্যাহত রাখে। ভাসানীর বিপ্লব তত্ত্বের সমালোচনা করে ১২ নভেম্বর পত্রিকাটি উপ-সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে: 'স্রেফ লাল টুপি পরিধান করিয়া এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মনের গরমি প্রকাশ করার নাম যদি বিপ্লব হয় ... এই লাল টুপি পরিধানের বিপ্লব কেন প্রদর্শিত হয়, কি এর আসল মতলব এবং কোথায় এর শেষ দৌড়, সে সব দেশের মানুষের ভালই জানা।' (*ইত্তেফাক*, ১২ নভেম্বর ১৯৭০)। প্রকৃতপক্ষে ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ গঠন করার পর থেকেই *ইত্তেফাক*-ভাসানী নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হয় ।

নির্বাচনী প্রচারণার এক পর্যায়ে ন্যাপ (মোজাফফর) সমর্থিত *সংবাদ* এবং সরকার সমর্থিত *মর্নিং নিউজ* আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রচারণা চালালে *ইত্তেফাক* এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৭০ সালের ১৯ অক্টোবর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয়, 'মতিঝিলের মতি'র গ্রুপ অব পাবলিকেশনের ইংরেজী দৈনিকটি এখন উপকথার সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির মত নিজেকে একমাত্র বুদ্ধিমান ভাবিয়া আর সকলকে গবেট ও বোকা ঠাওরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।' (*ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭০)। পাশপাশি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে *সংবাদ* পত্রিকায়

'আপোষবাদী ও সংগ্রাম বিমুখতা' শিরোনামে প্রচারণা চালানোর প্রতিবাদ করে *ইত্তেফাক* মন্তব্য করে, 'ইংরেজী সহযোগীর সহোদর ভ্রাতা আবিষ্কার করিতেছেন আপোষবাদী সংগ্রাম বিমুখতা। ইহার পশ্চাতে যে মূল দর্শনটি নিহিত তাহা হইল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুই ফ্রন্টে প্রচারণা চালানো।'(*ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭০)

ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে *ইত্তেফাক* বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি তথা ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর গুরুত্ব দেয়। ১৯৭০ সালের ২১ অক্টোবর এ পরিপ্রেক্ষিতে আশাবাদ ব্যক্ত করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, 'বস্তুত এবারের নির্বাচন স্বায়ত্তশাসন অর্জনের নির্বাচন... দেশকে মুক্ত করিবে ধর্ম ব্যবসায়ী ও কুচক্রীদের হাত থেকে।'(*ইত্তেফাক*, ২১ অক্টোবর ১৯৭০)

পত্রিকাটির অনেক সাংবাদিক ব্যক্তিগতভাবে সমাবেশে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারে ভূমিকা রাখেন। যেমন- *ইত্তেফাক*-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ছাত্রলীগের ১১-দফা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন (*পূর্বদেশ*, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭০)। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি জনসভা *ইত্তেফাক*-এ প্রচারণা পায়। যেমন - ১৯৭০ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকার জয়দেবপুরে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী জনসভায় দেওয়া ভাষণ *ইত্তেফাক* পরদিন ১ নভেম্বর প্রধান শিরোনাম হিসেবে প্রকাশ করে (*ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭০)। জনসভার সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি *ইত্তেফাক* ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ১৯৭০ সালের ৫ নভেম্বর *ইত্তেফাক* ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে বলা হয়:

> সারাদেশ ও দেশের মানুষের তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মত মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাইতে পারে ... ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছে থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ছয় দফা ও এগারো দফা বাস্তবায়িত করা যাইবে (*ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০)।

নির্বাচনি খবরাখবর প্রচার ও প্রকাশে যখন ঢাকার সংবাদপত্রগুলো ব্যস্ত সে সময় ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে এবং এতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় (*দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০)। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে দুইদিন পর থেকে পত্রিকায় ক্ষয়ক্ষতির খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় পত্রিকায় নির্বাচনি প্রচারণার খবর হ্রাস পায়। আগে থেকেই যে সব নেতা নির্বাচন পেছানোর পক্ষপাতী ছিলেন তারা বন্যার কারণে একবাক্যে নির্বাচন পেছানোর দাবি জানায়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, আতাউর রহমান, ওয়ালী খান প্রমুখ নেতারা নির্বাচন পেছানোর দাবি জানান। ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর ভাসানীপন্থি ন্যাপ তাদের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় (*সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭০)। তবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বাতিলের বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ ঘূর্ণি দুর্গত এলাকায় কয়েক সপ্তাহ পর এবং অন্যসব জায়গায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেয়। ইতোমধ্যে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে সরকারি অব্যবস্থাপনার চিত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ঢাকার পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নেতা (ন্যাপ

নেতা আবদুল ওয়ালী খান ব্যতীত) দুর্যোগপীড়িত পূর্ব বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এই দুর্যোগ আবারও প্রমাণ করে যে 'পূর্ব পাকিস্তান' ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ মাত্র। এই উদাসীনতা বাঙালি জনগণের ক্ষোভ বৃদ্ধি করে। আওয়ামী লীগ এই ক্ষোভ নির্বাচনি প্রচারণায় যথার্থভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং *ইত্তেফাক* এসব সমালোচনা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। অবহেলা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটের মাধ্যমেই জবাব দেওয়া সম্ভব এটাই ছিল *ইত্তেফাক* ও আওয়ামী লীগের যুক্তি। নির্বাচন পেছানোর সমালোচনা করে পত্রিকাটি মন্তব্য করে: 'নির্বাচনকে যাহারা বানচাল করিতে চায় এবং তারিখ পিছাইয়া দিবার শ্লোগান তোলে, তাহারা গণতন্ত্রকেই টুটি টিপিয়া হত্যা করিতে চায়।' (*ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০)

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ধর্মভিত্তিক দলগুলো পুনরায় ধর্মকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালালে *ইত্তেফাক* বিষয়টির সমালোচনা করে ১৬ নভেম্বর 'নির্বাচনের ডামাডোল ও সত্য দর্শন' শীর্ষক নিয়মিত কলামে মন্তব্য করে:

> ... আমাদের তথাকথিত 'ইসলাম পছন্দ' শিবিরও শেষ পর্যন্ত অন্যূন পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। ... মুখে সকলের ইসলামের বাণী ও বুলি অথচ কেহ 'দাঁড়িপাল্লা' কেহ 'বই' কেহ 'খেজুর গাছ' কেহ 'গাভী' আবার কেহবা 'গরুর গাড়ী' প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ... রাজনীতির সহিত ধর্মকে জড়িত করা চলে না, করিলে ন্যায় ও সত্যের শান্তি ও সুন্দরের ধর্ম ইসলাম বিতর্কের বস্তুতেই পরিণত হয়। ... শতকরা ৯৫ জনই যে দেশে মুসলমান সে দেশে অহরহ যদি ইসলাম রক্ষার প্রশ্ন ওঠে তাহা হইলে যে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘু সে দেশের মুসলমানরা কি ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে বা যাইবে? (*ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭০)

দাঁড়িপাল্লা— জামায়াত-ই-ইসলামি, বই— জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামের, খেজুর গাছ— জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, গাভী— শর্ষিনা পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দলের, গরুর গাড়ি— পাকিস্তান দরদি সংঘের নির্বাচনি প্রতীক ছিল। *ইত্তেফাক*-এর এই বক্তব্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি সমর্থন। নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে বিষয়ে সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ২৭ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার নির্বাচন একমাস পিছিয়ে জানুয়ারিতে নিয়ে আসা হয়। বিষয়টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে *ইত্তেফাক* পরদিন ২৮ নভেম্বর 'সঠিক সিদ্ধান্ত' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে (*ইত্তেফাক*, ২৮ নভেম্বর ১৯৭০)।

নির্বাচনের দিন ৭ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* শত বাধাবিপত্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠানে সন্তি প্রকাশ করে এবং বাঙালি জনগণের প্রতি আহ্বান জনিয়ে মন্তব্য করে, 'মহা পরীক্ষার এই দিনটিতে প্রতিটি দেশপ্রাণ নাগরিক বঞ্চিত-বিশীর্ণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের শাশ্বতদাবী সম্মুখে রাখিয়া এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের সেই ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিবেন।' (*ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)। পরদিন ৮ ডিসেম্বর *ইত্তেফাক* ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে 'ভোট কেন্দ্রে কি দেখিলাম' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন থেকে নির্বাচনে বাঙালি জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার দিকটি ফুটে ওঠে (*ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০)।

আজাদ

১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় *আজাদ* এর আগে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা এবং সাংবিধানিক সংকট নিয়ে বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ প্রকাশ করে। সামরিক শাসনের প্রথম দিকেই পত্রিকাটির সুবিধাবাদী চরিত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সময়ে আইয়ুব খানের প্রশংসা করলেও এ পর্যায়ে পত্রিকাটি আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশককে বিতর্কিত বলে মন্তব্য করে। পাশাপাশি শাসক শ্রেণির স্তুতিজ্ঞাপন করার ধারা বজায় রেখে *আজাদ* বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যসূচি থেকে আইয়ুব খানের *প্রভু নয় বন্ধু* বইটি বাতিল করার প্রশংসা করে (*আজাদ*, ৯ আগস্ট ১৯৬৯)।

ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে *আজাদ* আলোচনার সূত্রপাত করে ১৯৬৯ সালের ১৫ জুন। এ পর্যায়ে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অনেক বেশি গঠনমূলক। ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুপারিশ এবং আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণের সমালোচনা করে সামরিক শাসনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অদূরদর্শিতাকেই দায়ী করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবিধান সংক্রান্ত খসড়া যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরি করে জনমতের ভিত্তিতে সাংবিধানিক খসড়া পেশ করার জন্য *আজাদ* একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাব করে (*আজাদ*, ১৫ জুন ১৯৬৯)। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট আবুল মনসুর আহমদ *আজাদ*-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান (*আজাদ*, ১৪ আগস্ট ১৯৬৯)। একই বিষয়ের ওপর পত্রিকাটি ২৩ আগস্ট 'শাসনতান্ত্রিক জিজ্ঞাসা' শিরোনামে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এখানেও ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যে আসতে না পারার সমালোচনা করা হয় (*আজাদ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৯)।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর বিধি-নিষেধ উঠে যাওয়ায় *আজাদ* ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও সংবিধান নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। পত্রিকাটি আইন কাঠামো আদেশের মাধ্যমে নির্বাচনের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় সন্তোষ প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত *আজাদ*-এর সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে দুইটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—

১. *আজাদ* নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় এবং কোনোভাবেই নির্বাচন পেছানো বা বাতিল না করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

২. *আজাদ* বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার কোন্দল এবং একটি দলের নির্বাচনি সমাবেশে অন্য দলের হামলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে। অতীতে এই অনৈক্য ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণেই সামরিক শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে *আজাদ* একাধিক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে।

আজাদ-এর এই নীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের ২০ জানুয়ারি 'নির্বাচনী পরিবেশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে *আজাদ* মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নির্বাচন বয়কট করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (*আজাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৭০)। পত্রিকাটি রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং সংঘাতমূলক রাজনীতির বিরোধিতা করে

১৯৭০ সালের ৫ মার্চ 'জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে নিজস্ব তৎপরতা অক্ষুণ্ন রেখে সাধারণ সমঝোতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ওপর জোর দেয় (*আজাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭০)। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরদিনও প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে নির্বাচন সম্পর্কে *আজাদ*-এর ইতিবাচক মনোভাব পাওয়া যায়। পত্রিকাটি 'আসন্ন নির্বাচন ও যথার্থ পরিস্থিতি' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কিছু সংখ্যক লোকের বিরোধিতার পরও সরকার ও জনগণের যৌথ শক্তির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলার বিষয়টিকে সাধুবাদ জানায়। এসব সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশের বাইরে পত্রিকাটি নির্বাচন সংক্রান্ত ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনসভার খবরও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ও ভাসানী এসব সংবাদ এ গুরুত্ব পেয়েছেন। যেমন— ১৯৭০ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগ রেসকোর্স ময়দান থেকে তাদের নির্বাচনি প্রচার শুরু করলে *আজাদ* এটিকে 'স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা' হিসেবে উল্লেখ করে (*আজাদ*, ৮ জুন ১৯৭০)। আওয়ামী লীগ বিরোধী আদর্শের একটি পত্রিকার কাছে এই স্বীকৃতি নির্বাচন পূর্ব সময়ে দলটির জনপ্রিয়তা এবং ৬-দফা ও ১১-দফার প্রতি জনসমর্থনের বিষয়টিই প্রমাণ করে।

সংবাদ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে *সংবাদ* অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের ন্যাপকে সমর্থন করে। পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদুল কবীর ন্যাপ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন (জাহান, ২০০৮: ১৯১)। ফলে পত্রিকাটির নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। সামরিক শাসন জারির পর থেকে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ন্যাপের উভয় অংশের বক্তৃতা বিবৃতি এবং ন্যাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেও সংবাদ প্রকাশের ধরন থেকেই মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি ছিল স্পষ্ট। ন্যাপের এই অংশটিকে পত্রিকাটি সবসময় মূলধারার ন্যাপ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। এর আগে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ভাসানী সমর্থিত ন্যাপ যোগদান না করায় *সংবাদ* দলটির সমালোচনা করে।

সংবাদ এ সময় ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যও নিয়মিত প্রকাশ করে। যেমন- পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত-ই-ইসলামি'র সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজম ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন করার পক্ষে এবং সংবিধান প্রশ্নে কনভেনশন আহ্বান করার ভাসানীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিলে *সংবাদ* সেটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে (*সংবাদ*, ১৩ জুন ১৯৬৯)। ভাসানী ন্যাপ প্রথম থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। দলটির ভেতরে যারা নির্বাচন বিরোধী ছিলেন তারা নির্বাচন বয়কট করার দাবিতে সভা-সমাবেশ করতে থাকে। ন্যাপের অন্য অংশটি (মোজাফ্ফর) প্রথম থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে তার এই দাবি আরও জোরালো হয়। এ সময় *সংবাদ* প্রায় প্রতিদিনই মোজাফ্ফর আহমেদের 'গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার আহ্বানকে উদ্ধৃত করে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যেমন- ১৯৭০ সালের ৫ জানুয়ারি সংখ্যায় পত্রিকাটি পল্টন ময়দানে ন্যাপের জনসভাকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে *সংবাদ* প্রকাশ করে। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের ১১-দফার ভিত্তিতে ঐক্যজোট গড়ে তোলার আহ্বানকে

শিরোনাম করা হয় (*সংবাদ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৭০)। ন্যাপের এই অংশটির লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ ভাবে নির্বাচন করা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জোট গঠনের বিরোধী ছিলেন। বিষয়টিকে ন্যাপ দলটির 'সংকীর্ণ রাজনীতি' বলে সমালোচনা করে যা সংবাদ-এ উঠে আসে (*সংবাদ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭০)।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর ন্যাপের উভয় অংশ নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার দাবি জানালে *সংবাদ* বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের ২৯ নভেম্বর 'নির্বাচনের তারিখ' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে *সংবাদ* মন্তব্য করে:

> ... দুর্গত এলাকায় নির্বাচন স্থগিত রাখার ফলে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার তেইশ বছর পর অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এই অস্বাভাবিক পরিবেশে এবং খণ্ড খণ্ডভাবে অনুষ্ঠিত হউক ইহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। ... প্রেসিডেন্ট নিজেই বলিয়াছেন যে দুর্গত এলাকাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন বসিবে না। ... কিন্তু প্রশ্ন হইল পরিষদের অধিবেশনই যদি না বসে তবে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এত তাড়াহুড়ো কেন? (*সংবাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭০)

সংবাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের আগ্রহের সমালোচনা করে বলে যে, দলটির আগ্রহের কারণেই শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন পেছাতে চাননি। তবে পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচনের আগের দিন ৬ ডিসেম্বর পত্রিকাটি ভেতরের পাতায় ন্যাপ প্রার্থীদের ছবি দিয়ে তাদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানায় (*সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭০)। পাশাপাশি পত্রিকাটি নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর 'একদিন সাফল্যের দিন: নবতর পরীক্ষার দিন' শিরোনামে একটি আবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়: 'দেশের শাসনযন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশবাসী সার্বজনীন ভোটাধিকার পাইয়াছে। এই সাফল্য অর্জন কোনো একটি দল বা বিশেষ কোনো মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠানের একক অবদানের ফসল নহে।' (*সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০) । *সংবাদ* একই সাথে ভোটারদের 'সস্তা ভাবাবেগ' পরিহার করে প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম করার পেছনে যাদের ত্যাগ ও অবদান আছে তাদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানায়।

দৈনিক পাকিস্তান

দৈনিক পাকিস্তান ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা হলেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটির পরিবর্তিত চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। পত্রিকাটির এই বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়েও অব্যাহত থাকে তবে সরকারি হওয়ায় সরাসরি সরকার বিরোধী কোনো সম্পাদকীয় বা সংবাদ প্রকাশ করা পত্রিকাটির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে পত্রিকাটি কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নেয়। পত্রিকাটির সংবাদ প্রকাশের ধরন বাঙালি জনমতকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। পাশাপাশি পত্রিকাটি এমন অনেক সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে যেগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অর্থবহ কিন্তু অন্যান্য পত্রিকা হয়ত তা গুরুত্ব দেয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের অবসান হলে 'পশ্চিম পাঞ্জাব'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পাঞ্জাব' কিন্তু 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' বা 'পূর্ব বাংলা' করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের

আলোচনায় পূর্বাঞ্চলকে 'বাংলা' নামে পরিচিত করার ঘোষণা দেন। *দৈনিক পাকিস্তান* তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে পরদিন প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে সেটি প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন:

> এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... আমি ঘোষণা করিতেছি - আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ। (*দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯)

পত্রিকাটি বাঙালি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্র রচনাবলি প্রকাশ করার দাবি জানালে *দৈনিক পাকিস্তান* ১৯৬৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর ১ম পৃষ্ঠার ২য় কলামে শিরোনাম করে: 'রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে যারা বাধা দিয়েছিল আজ তারা অপসারিত, যারা বাধা দেবে তারাও অপসারিত হবে ... মুজিব' (*দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯)। এভাবে কৌশলে পত্রিকাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করে। *দৈনিক পাকিস্তান* আওয়ামী লীগের জনসভার যেসব সংবাদ প্রকাশ করে সেগুলোর আগে 'বিশাল জনসভা' বা এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করে। যেমন- ১৯৭০ সালের ১২ জানুয়ারি পত্রিকাটি 'পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ঘোষণা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নেবে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। (*দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭০)

দৈনিক পাকিস্তান বিভিন্ন সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে প্রকারান্তরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচারণায় সহায়তা করে। বিশেষ করে বামপন্থি বিভিন্ন দল ধর্মভিত্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিপক্ষে জোরালো অবস্থান রাখতে না পারায় বঙ্গবন্ধু একাধিক বক্তৃতায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু জামায়াত-ই-ইসলামি-র ধর্মের নামে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই, ১৫ আগস্ট, ৯, ১০, ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭০ সালের ২ ও ৩০ জানুয়ারি পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদ প্রকাশ করে। এসব খবর বাঙালি জনমতকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ব্যর্থতা থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর লেখক ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশের খবর সরকারি পত্রিকা হয়েও *দৈনিক পাকিস্তান* নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৭০ সালের ১৫ জানুয়ারি পত্রিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশের খবর প্রকাশ করে (*দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৭০)। একইভাবে পত্রিকাটি পরদিন শিরোনাম করে: 'শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ সভা মিছিল প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবী।' (*দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০)। পত্রিকাটি এই নীতি বজায় রাখে এবং রেডিও-টেলিভিশনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রচারের উদ্যোগকে 'সংগ্রামী জনতার বিজয়' বলে উল্লেখ করে (*দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭০)।

নির্বাচনের আগেই ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* স্বাধীনতার ধারণাও প্রকাশ করে। ৪ কলামব্যাপী প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'(*দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭০)। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সবচেয়ে

সাহসী ভূমিকা লক্ষ করা যায় ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বরের পর। পত্রিকাটি সরকারি মালিকানাধীন হওয়ার পরও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতার সমালোচনা করে প্রাণহানির জন্য সরাসরি সরকারকে দায়ী করে। ১৯৭০ সালের ১৯ নভেম্বর সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> ... এদের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতিকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যেতে পারে না। ... এদের মৃত্যুও মেন-মেড। ... রিলিফ কমিশনার স্বীকার না করলেও ইতিমধ্যেও যে তাদের গাফেলতির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে— একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না। (*দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭০)

নির্বাচনের পরদিন ৮ ডিসেম্বর পত্রিকাটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাঙালি জনগণকে সাধুবাদ জানায়। এভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে *দৈনিক পাকিস্তান*-এর অবস্থান লক্ষ করা যায়।

পাকিস্তান অবজারভার

পাকিস্তান অবজারভার প্রথম থেকেই নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং আইন কাঠামো আদেশের প্রশংসা করে। পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ বিরোধী। তিনি ছিলেন ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সমর্থক যেটি পরবর্তী সময়ে তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান থেকে বের হয়ে আসে (বেগ, ২০০৭: সিডি সংস্করণ)। পত্রিকাটি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের আন্দোলনেরও বিরোধী ছিল। ফলে ৬-দফা ও ১১-দফাকে পত্রিকাটি সরাসরি সমর্থন বা বর্জন কোনোটি করেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ৬-দফা বাস্তবায়ন করতে না পারার জন্য ১৯৬৯ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় যেসব অসহযোগীর নাম ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হামিদুল হক (রায়, ২০০৯: ৫২)।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পত্রিকাটিতে উঠে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ন্যাপ (ভাসানী)-এর প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে দুটো সংবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। ভাসানী বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পেছানোর এবং ভোটের আগে ভাতের দাবি করে বক্তব্য দিলেও তার বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। 'Bhasani Not Against Polls' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভাসানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়: 'We shall participate in the elections as a part of our struggle to realise peoples demands and not to go to power' (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)। পাশাপাশি পত্রিকাটি ঐ সময় দেওয়া বিভিন্ন স্লোগানও প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়: 'Bhoter age bhater neta – Maulana Bhashani (Leader that demands food before polls – Maulana Bhasani), Kick the ballot box.' (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)।

নির্বাচনের ঠিক আগেই ৫ ডিসেম্বর পত্রিকাটি পল্টন ময়দানে ন্যাপের (ভাসানী) সমাবেশের খবর প্রকাশ করে। ঐ সমাবেশে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম (Autonomous and Sovereign) পূর্ব পাকিস্তান দাবি করা হয় বলে *পাকিস্তান অবজারভার* উল্লেখ করে

(*পাকিস্তান অবজারভার*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭০)। তবে পত্রিকাটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সবসময়ই ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যাজনিত কারণে অক্টোবর মাসের অনুষ্ঠিত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হলে বিষয়টিকে *পাকিস্তান অবজারভার* স্বাগত জানায়। কোনোভাবেই যেন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে নির্বাচনের দিন 'A Date with Destiny' শিরোনামে পত্রিকাটি একটি নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করা হয়: '…the country is clam and in an expected mood. Let us hope and pray that this clam will continue today and through the days to come …We cannot, we must not, let anything happen that can make the elections infructous.' (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০)

মর্নিং নিউজ

সরকারি মালিকানাধীন ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* এর ভূমিকা ছিল বিশেষত্বহীন। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হয়েও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে পরোক্ষভাবে যে কৌশলী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় *মর্নিং নিউজ* তা পারেনি বা সে চেষ্টাও পত্রিকাটি করেনি। পত্রিকাটির সংবাদ বিশ্লেষণ করে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের প্রতি সমর্থন কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয়। ন্যাপের অপর অংশ (মোজাফ্ফর) সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পত্রিকাটি প্রকাশ করেনি। তাছাড়া ভাসানীকেই সমগ্র ন্যাপের সভাপতি এবং তার নেতৃত্বাধীন দলটিকেই মূলধারার ন্যাপ হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। যেমন— ১৯৬৯ সালের ১১ আগস্ট ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে ভাসানীর জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করার বিষয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে: 'Addressing a press conference the NAP chief, however announced the postponement of the all-party convention he had called to discuss the constitutional issues and other problems facing the people.' (*মর্নিং নিউজ*, ১১ আগস্ট ১৯৬৯)

ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যের সাথে মিল আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এমন সব দাবি *মর্নিং নিউজ* প্রকাশ করলেও অবশিষ্ট অনেক কিছুই তারা এড়িয়ে গেছে। যেমন— বঙ্গবন্ধু প্রাপ্তবয়স্ক ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানালে পত্রিকাটি সেটি প্রকাশ করে কিন্তু ৬-দফা ও ১১-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এর ১১-দফা কিংবা প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করার দাবিতে সাংবাদিক ও লেখকদের প্রতিবাদ সমাবেশের খবর পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে গেছে। নির্বাচনের পরদিন পত্রিকাটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

দৈনিক পূর্বদেশ

হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন বাংলা পত্রিকা ছিল *পূর্বদেশ*। ফলে পত্রিকাটির নীতির সাথে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকার নীতিগত মিল পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে পত্রিকাটি সব রাজনৈতিক দলের প্রচারণার খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। তবে পত্রিকাটির ডানপন্থি অবস্থানের বিষয়টি কিছু কিছু সংবাদ ও সম্পাদকীয় থেকে উপলব্ধি করা যায়। ভাসানী ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কৌশল হিসেবে গ্রামে গ্রামে চোর ডাকাত ধরার মতো বিভিন্ন অরাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেন। বিষয়টিকে অভিনন্দিত করে *পূর্বদেশ*

মন্তব্য করে: 'যে-কোনো কারণেই হোক, মাওলানা সাহেবের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের যে লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা স্থায়ী হলে আমরা তাকে অবশ্যই দেশের জন্য আশাব্যাঞ্জক মনে করি।' (*পূর্বদেশ*, ২৩ মে ১৯৭০) কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামুয়ালাইকুম' জানিয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দেন পরবর্তী সময়ে তিনি এই নীতি থেকে বের হয়ে আসেন। নির্বাচনে অংশ না নিলেও ১৯৭০ সালের ৫ নভেম্বরে টেলিভিশন ভাষণে ভাসানী মন্তব্য করেন: 'Even if there are thousands of difference among us; all should love Pakistan. The name of this country is Pakistan, there is no such country anywhere in the world.' (রহমান, ১৯৮২: ৫৬২) । ভাসানীর কোনো কোনো বক্তব্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায়। তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রচলন করার কথা বলেন আবার পূর্ব বাংলার বামপন্থি নেতাদের 'হিন্দু' বলেও অভিহিত করেন। ভাসানীর এই পরিবর্তিত অবস্থাকে *পূর্বদেশ*-এর পাশাপাশি জামায়াত-ই-ইসলামির মুখপত্র পত্রিকা *সংগ্রাম* ১৯৭০ সালের ২৮ মে সংখ্যায় অভিনন্দিত করে।

পূর্বদেশ পত্রিকার বঙ্গবন্ধুকে বিরোধিতার বিষয়টি সামনে চলে আসে ১৯৭০ সালের ২ জুন 'এটা সত্য নয়' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে। এতে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনে মন্তব্য করা হয়: 'প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা বলতে শুরু করেছেন, আইয়ুব সরকারের পতনের জন্য একমাত্র তারাই আন্দোলন করেছেন। রাজনৈতিক সুবিধা লোটার দিক থেকে এটা যতই লাভজনক প্রচারণা হোক না কেন, আদপেই কিন্তু কথাটা সত্য নয় বরং ঐতিহাসিক সত্যের মস্ত বড় অপলাপ।' (*পূর্বদেশ*, ২ জুন ১৯৭০)। পত্রিকাটির 'তৃতীয় মত' কলামে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে স্থূলভাবে বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক সমালোচনা করা হয়। তবে ১২ নভেম্বরের (১৯৭০) ঘূর্ণিঝড়ের পর *পূর্বদেশ* মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে প্রকারান্তরে পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করে। পত্রিকাটি পাকিস্তানি নেতাদের ছবি দিয়ে শিরোনাম করে: 'ওরা কেউ আসেনি' (হাননান, ১৯৯৯: ৫৪৪)। ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত খবর বাঙালিদের মধ্যে কঠোর আলোড়ন সৃষ্টি করে যার প্রভাব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাওয়া যায়। নির্বাচনের পর পরাজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগের জবাবে পত্রিকাটি দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াকেই গুরুত্ব দেয়।

দৈনিক সংগ্রাম

জামায়াত-ই-ইসলামির মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান নিলেও পত্রিকাটিতে আওয়ামী লীগের সমালোচনামূলক বিভিন্ন সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। যেমন— নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের ১০ নভেম্বর পত্রিকাটি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে মন্তব্য করে: 'আওয়ামী লীগ হিংস্র কর্মপন্থার অনুসরণ করে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।' (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ নভেম্বর ১৯৭০)। পরবর্তী সময়ে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলোর ভরাডুবির পরিপ্রেক্ষিতে *দৈনিক সংগ্রাম* নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে নির্বাচনি ফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০)

মূল্যায়ন

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ৬-দফার প্রশ্নে গণভোট হিসেবে বিবেচিত এই নির্বাচন বাঙালি জনমনে যে ঐক্য ও বিশ্বাস তৈরি করে তার সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনি ইশতাহারে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির বিভিন্ন মৌলিক দাবি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বামপন্থিদের প্রভাবাধীন বিশাল সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। স্বায়ত্তশাসনের জাতীয়তাবাদী দাবি এবং বাঙালির অন্যান্য মৌলিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ অন্য যে কোনো দলের চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয়তাবাদী দাবির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং নির্বাচনে সাফল্য পায়। এসব দাবি প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে *ইত্তেফাক*। পত্রিকাটি পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসতে নির্বাচন ও স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে *আজাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার* ও *পূর্বদেশ* ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারণা ও কর্মসূচির খবর প্রকাশ করতে থাকে। *আজাদ* ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান, রাজনীতি, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গঠনমূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। অপরদিকে *সংবাদ* ন্যাপ (মোজাফফর) সমর্থিত হওয়ায় ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্বাচন স্থগিত করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে পত্রিকাটি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকে। *দৈনিক পাকিস্তান* সরকারি পত্রিকা হলেও বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বিবৃতি প্রচারণায় জনমত তৈরিতে পত্রিকাটির ভূমিকাও কম নয়। বাঙালি জনমত ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে পত্রিকাটির অবস্থান ছিল স্পষ্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনকারী ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ৬-দফা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে *পূর্বদেশ* ইতিহাসের ইতিবাচক ধারার অংশ হতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে মুক্তি সংগ্রামের মোহনায় আনতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা অনন্য ভূমিকা পালন করেন। অনেক সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিলেও অধিকাংশই ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থক। এ সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রায় প্রতিটি ছিল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল ও মতবাদের সমর্থক এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে পত্রিকাগুলো নিজ নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে অবস্থান গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক জনমত গঠনে পত্রিকাগুলোর ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

অনুপম সেন (১৯৭১/ ২০০৯)। 'বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি'। *রক্তাক্ত বাংলা*। ঢাকা : মুক্তধারা, মুজিবনগর

আজম বেগ (২০০৭)। 'চৌধুরী হামিদুল হক'। *বাংলাপিডিয়া* । ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

'আজাদের আত্মনিবেদন'। *আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

আনোয়ার হোসেন (১৯৬৯)। 'গোল টেবিল বৈঠক বনাম রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি'। *ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

আবুল হাসনাত (১৯৬৯)। 'রাজনৈতিক সংকট ও তার সমাধান'। *ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

'আসন্ন নির্বাচন ও যথার্থ পরিস্থিতি' । *আজাদ*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭০

'একদিন সাফল্যের দিন: নবতর পরীক্ষার দিন'। *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০

'এটা সত্য নয়'। *পূর্বদেশ*, ২ জুন ১৯৭০

জয়ন্ত কুমার রায় (২০০৭)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*। ঢাকা : সুবর্ণ

জুলফিকার হায়দার (২০১০)। *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী

'জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতি'। *আজাদ*, ৫ মার্চ ১৯৭০

ড. মোহাম্মদ হাননান (২০০৭)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

'নির্বাচনের ডামাডোল ও সত্য দর্শন'। *ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭০

'নির্বাচনী পরিবেশ'। *আজাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৭০

'নির্বাচনের তারিখ'। *সংবাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭০

'পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ঘোষণা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নেবে'। *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭০

'ভোট কেন্দ্রে কি দেখিলাম'। *ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০

'মঞ্চে নেপথ্যে'। *ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

মাহবুবুর রহমান (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*। ঢাকা : সময়

মোঃ এমরান জাহান (২০০৮)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪)। *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯৯৯)। *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ*। ঢাকা : সময়

'রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে যারা বাধা দিয়েছিল আজ তারা অপসারিত, যারা বাধা দেবে তারাও অপসারিত হবে ... মুজিব'। *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯

'রাজনীতি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব'। *ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭০

'শাসনতান্ত্রিক জিজ্ঞাসা'। *আজাদ*, ২৩ আগস্ট ১৯৬৯

'শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ সভা মিছিল প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবী'। *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০

সুব্রত শংকর ধর (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি,

'সঠিক সিদ্ধান্ত'। *ইত্তেফাক*, ২৮ নভেম্বর ১৯৭০

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭০

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) (১৯৮২)। *বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)*। ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স

'A Date with Destiny'. *Pakistan Observer*, 7 December 1970.

'Bhasani Not Against Polls'. *Pakistan Observer*, 6 September 1970.

G. W. Choudhury (2011). *The Last Days of United Pakistan*, Dhaka: United Press Limited.